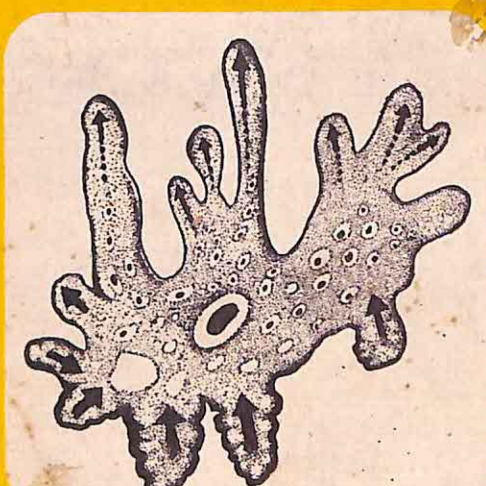
শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ
সলিল কুমার রাহা

আদ্যপ্রাণী



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

8a

Σ[illegible]

আদ্যপ্রাণী

শ্যামা প্রসাদ ঘোষ

বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন,
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, রহড়া,
২৪ পরগনা। হাবড়া গান্ধী শতবার্ষিকী
শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় (আংশিক)।

ও

ডঃ সলিল কুমার রাহা

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী
মহাবিদ্যালয়, রহড়া, ২৪ পরগনা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

ADYAPRANI
[PROTOZOA]
Syamaprasad Ghosh and Dr. Salil Kumar Raha.

প্রকাশকাল : নভেম্বর ১৯৮৪

প্রকাশক : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ৭০০০১৩

মুদ্রক : রূপ লেখা
২২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৯

চিত্রশিল্পী : শ্রীনির্মল কর্মকার
প্রচ্ছদ : শ্রীকমল শেঠ

মূল্য ঃ আঠারো টাকা

Published by Sri Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of Books and Literature in regional languages at the University level, launched by the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture).

উৎসর্গ

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পিতামাতার উদ্দেশ্যে

মুখবন্ধ

বিজ্ঞান শিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যবহারে বিভিন্ন জটিল ও কঠিন বিষয় বস্তুকে সহজ ও সরল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন আছে। এই চিন্তাধারার পথিকৃতের মধ্যে আচার্য বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু অন্যতম। ইহা শিক্ষার ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় তা জানিয়াও কোন বাস্তব রূপায়ণ করিবার চেষ্টা ছিল না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট উপলব্ধি করিয়া প্রাণিবিজ্ঞানের 'স্নাতক' এবং 'স্নাতক-সাম্মানিক' পাঠ্যক্রমকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করিয়া পুস্তক প্রণয়ণে আগ্রহী হইয়াছে।

এই 'আদ্যপ্রাণীর' পুস্তক স্নাতক-সাম্মানিকপর্যায়ের পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইয়াছে। আধুনিক মতবাদের উপর পর্যালোচনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রেণীবিন্যাসের আলোচনায় নূতন আলোকপাত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আদ্যপ্রাণীর যাবতীয় জৈবনিক কার্যের তুলনামূলক আলোচনা স্থান পাইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রাসঙ্গিক প্রশ্নসমূহ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী সংযোজিত হইয়াছে।

পুস্তক রচনায় উপযুক্ত পরিভাষা ব্যবহার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তবে কোথাও কোথাও লেখা ও বিষয়বস্তুর ত্রুটি থাকিতেই পারে। তার জন্য সকল স্তরের শিক্ষাব্রতীর নিকট আমরা ক্ষমপ্রার্থী। তাছাড়া মুদ্রণ কার্যে কিছু ত্রুটি থাকিতে পারে। যদিও আমরা 'ভ্রম-সংশোধনী'তে বেশীর ভাগেরই উল্লেখ করিয়াছি তবুও আগামী সংস্করণে পুস্তকটি ত্রুটিমুক্ত করিবার আশা রাখি।

যতদূর সম্ভব চিত্রসহযোগে বিষয়বস্তুকে সহজ-সরল করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি। এই পুস্তক বিশেষতঃ যে সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য লেখা তাহারা উপকৃত হইলে আমাদের শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব। এছাড়া পরবর্তী সংস্করণের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, পাঠক এবং পাঠিকাদের সাহায্য পাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

এই পুস্তক রচনায় আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) মহাশয়ের নির্দেশিকা আমরা প্রতি স্তরে অনুসরণ করিয়াছি। তাঁর কাছে আমরা বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া আমাদের

সহকর্মী অধ্যাপক গণপতি মুখার্জী, অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাস, অধ্যাপক দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় এবং নৈহাটি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ কমলেশ মিশ্র বিশেষভাবে সাহায্য ও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। বিভিন্ন পুস্তক সরবরাহ করিয়া প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন আমাদের মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থগারিক শ্রীবঙ্কিম চ্যাটার্জি। এঁদের সকলকেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই পুস্তক রচনায় বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশককে এই নিবেদনের মাধ্যমে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। 'রূপলেখা' প্রেসের কর্মীবৃন্দ, বিশেষতঃ অতীশ কুমার ঘোষ এবং চিত্রশিল্পীকে জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে অক্লান্ত সাহায্যের জন্য শ্রীমতী রঞ্জনা রাহাকে এবং পুনর্লিখনে আমাদেরই ছাত্র শ্রীমান শিবপ্রসাদকে আমাদের ধন্যবাদ জানাই।

সর্বোপরি পুস্তকটি প্রকাশনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদকে জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

নভেম্বর, ২৪শে ১৯৮৪।

শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ
সলিল কুমার রাহা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

আদ্যপ্রাণী

সূচনা ও ইতিহাস ঃ পৃথিবীর এই বিরাট প্রাণিজগতের বেশীর ভাগ প্রাণী এককোষী। এই এককোষী প্রাণীকে খালি চোখে দেখা যায় না ,ফলে বেশীর ভাগ মানুষই ইহাদের আকৃতি বা গঠন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। কিন্তু একটি কোষেই জীবনের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ও কোষটি যাবতীয় জৈবনিক কার্য সমাধান করে। এককোষী জীবকে কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্ভিদ বলিয়া গণ্য করা হয়, কারণ কোন কোন আদ্যপ্রাণীর প্রোটোপ্লাজমে সবুজ কণিকা ক্লোরোফিল থাকে। ক্লোরোফিলের সাহায্যে ইহারা উদ্ভিদের ন্যায় খাদ্য তৈয়ারী করিতে পারে। এই সকল আদ্যপ্রাণীতে কিছু প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ও কিছু উদ্ভিদের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায়, ইহাদের প্রোটিস্টা (**protista**) বলা হয়।

ওলন্দাজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী লিউএনহোক (**Lieuwenhock—1632-1723**) সর্বপ্রথম **1674** খৃষ্টাব্দে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আদ্যপ্রাণী দেখিতে পান। পরে **1841** খ্রীষ্টাব্দে ভন্ সিবোল্ড (**Von-Siebold**) ইহার বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট করিয়া আধুনিক ধারণার প্রবর্তন করেন। গোল্ডফাস (**Goldfuss-1822**) আদ্যপ্রাণীকে **প্রথম সৃষ্ট প্রাণী** (**Gk-Protos** ; প্রথম, **Zoon** ; প্রাণী) বলিয়া চিহ্নিত করেন এবং অদ্যাবধি আদ্যপ্রাণীকেই বিবর্তনের ইতিহাসে প্রথম সৃষ্ট জীব হিসাবে অভিহিত করা হয়। কলকিনস্ (**Calkins—1933**) প্রথম আদ্যপ্রাণী হইতে ক্রোমেটোফোর বিশিষ্ট ফ্লাচজলাযুক্ত আদ্যপ্রাণীকে পৃথক করেন এবং আদ্যপ্রাণীর পরিবর্তে উদ্ভিদ বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু পরবর্তী বৈজ্ঞানিকগণ এই যুক্তি মানিয়া লন নাই, তাঁহাদের মতে বিবর্তনের প্রথম যুগে এককোষী জীবে উভয় গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছে। প্রাণিবিদরা বিশ্বাস করেন এই ধরনের আদিম এককোষী জীব হইতে অভিব্যক্তির মাধ্যমে বহুকোষী জীবের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কালের বিবর্তনে উন্নত প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং ইহারাই প্রাণী হিসাবে পৃথিবীতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। সেইজন্য ইহাদের আদ্যপ্রাণী বলে।

সংজ্ঞা ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ আদ্যপ্রাণী আনুবীক্ষণিক আদিম এককোষী প্রাণী। ইহাদের দেহ একটি মাত্র কোষ লইয়া গঠিত। দেহকোষে সাধারণতঃ একটি নিউক্লিয়স থাকে, অনেক সময় একাধিক নিউক্লিয়াস থাকিতে পারে। একটি কোষ যাবতীয় সকল কার্য সম্পাদন করিয়া বাঁচিয়া থাকে ও বংশ বৃদ্ধি করে। বর্তমানে আদ্যপ্রাণীকে **সাতটি পর্বে** ভাগ করা হয় এবং আদ্যপ্রাণীকে অধঃরাজ্যও বলা হয়। 1980 সালে **Levine** এবং তাঁর সহকারী আদ্যপ্রাণীর বৈজ্ঞানিকগণ এই নতুন শ্রেণীবিন্যাস করেন। এই বিন্যাসে 65,000 আদ্যপ্রাণীর প্রজাতি চিহ্নিত করা হয়। তার মধ্যে 18,000 পরজীবী এবং বাকি স্বাধীনজীবি প্রাণী।

বাসস্থান ও খাদ্য ঃ পৃথিবীর সর্বত্র আদ্যপ্রাণী পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণতঃ আর্দ্র পরিবেশে বাস করে ; শুষ্কতা সহ্য করিতে পারে না। স্বাধীন-জীবি আদ্যপ্রাণী প্রধানতঃ মিঠাজলে, সমুদ্রের জলে ও ভিজা মাটিতে বাস করে। কোন কোন প্রজাতি জলের নীচে থাকে বা কেউ সাঁতার কাটে। ইহা ছাড়াও বহু মৃতভোজী, পরজীবী ও মিথোজীবী আদ্যপ্রাণী আছে। সাধারণতঃ এপিকমপ্লেক্সা পর্বের সকল আদ্যপ্রাণী পরজীবী। এই সকল পরজীবী অন্ত্রে, রক্তে, ও কোষরসে বাস করিতে পারে। স্বাধীনজীবী আদ্য-প্রাণী পরিবেশ হইতে সরাসরি খাদ্য সংগ্রহ করে, পরজীবী প্রাণী শোষক জীব হইতে খাদ্য শোষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। অনেক আদ্যপ্রাণী উদ্ভিদের ন্যায় খাদ্য তৈয়ারী করিতে পারে।

বেশীরভাগ আদ্যপ্রাণী পৃথকভাবে বাস করে, ও স্বাধীনভাবে একটি কোষই যাবতীয় কাজ করে। অনেক সময় অনেকগুলি এককোষী প্রাণী একসংগে থাকিয়া কলোনী গঠন করিয়া বাস করে ; যেমন—ভলভক্স। এইক্ষেত্রে কোষগুলি সাইটোপ্লাজমের পটি দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে। এই সকল আদ্যপ্রাণী উপনিবেশ গঠন করিয়া স্বাধীনভাবে বা পরজীবী হিসাবে বাস করে।

আকৃতি সংখ্যা ও গুরুত্ব ঃ ইহারা আনুবীক্ষণিক, গোলাকার, ডিম্বাকার, চ্যাপ্টা, লম্বা বা বিভিন্ন আকৃতির হইতে পারে। অনেক আদ্যপ্রাণীর নির্দিষ্ট আকার থাকে না। ইহাদের দেহের মাপ 1 মাইক্রন হইতে মিলিমিটার (1μm-50um) পর্যন্ত হইতে পারে। কিছু বৃহৎ আকৃতির আদ্যপ্রাণীর মধ্যে সিলিয়োফোরা (**ciliophora**) পর্বের অন্তর্গত পলিমেনো-

ফোরিয়া শ্রেণীর স্পাইরোস্টোমাম (Spirostomum) তিন মিলিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। অনেক খোলকযুক্ত আদ্যপ্রাণীর ব্যাস 63 মিলিমিটার হয়।

আদ্যপ্রাণীর সংখ্যা সঠিকভাবে হিসাবের অংকে দেওয়া সম্ভব নহে। আদ্যপ্রাণীর সংখ্যাতত্ত্ব কোনও ভাবেই নির্ভরযোগ্য নহে। আদ্যপ্রাণীর গুরুত্ব শেষ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

আদ্যপ্রাণীর মুখ্য বৈশিষ্ট্যাবলী ও শ্রেণীবিন্যাস ঃ

মুখ্যবৈশিষ্ট্যাবলী (Salient Features)

1. এককোষী অথবা অকোষী (unicellular) আণুবীক্ষণিক প্রাণী।
2. সাধারণতঃ কোষ নির্দিষ্ট আকারযুক্ত যেমন, (বর্তুলাকার, ডিম্বাকার বা লম্বাটে) কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট (পরিবর্তনশীল)।
3. সমগ্র জৈবনিক ক্রিয়াকলাপ এই একটি কোষ সম্পন্ন করে।
4. দেহ খোলকে আবৃত থাকিতে পারে এবং অনেক সময় অন্তঃকঙ্কাল থাকে।
5. প্রাণীর এককোষী দেহে সাধারণতঃ একটিমাত্র সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস উপস্থিত, কিছু ক্ষেত্রে একাধিক। অনেকক্ষেত্রে কোষের নানা অংশ পরিবর্তিত হইয়া কোষাঙ্গ (Cell-organ) উৎপন্ন করে। থলির আকৃতির নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রে একটি গোলাকার স্থূল এণ্ডোসোম (Endosome) থাকে।
6. প্রোটোপ্লাজম হইতে উৎপন্ন ক্ষণপদ (Pseudopodia), ফ্লাজেলা (Flagella), সিলিয়া (Cilia) প্রভৃতি অথবা কোষের সামগ্রিক সঙ্কোচন-প্রসারণের দ্বারা ইহাদের গমন বা চলন সংঘটিত হয়; আবার কেহ কেহ সম্পূর্ণরূপে স্থাণু।
7. বিভিন্ন প্রকারের পুষ্টি দেখা যায়—হোলোজোয়িক (প্রাণীর ন্যায়), হোলোফাইটিক (উদ্ভিদের ন্যায়), স্যাপ্রোজোয়িক (মৃতজীবীর ন্যায়), প্যারাসিটিক (পরজীবীর ন্যায়)। পরিপাক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্তঃকোষীয় এবং খাদ্যগহ্বরের মধ্যেই সংঘটিত হয়।
8. শ্বসন বায়বীয় অথবা অবায়বীয় ; দেহসীমা বরাবর ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শ্বসনকার্য সম্পন্ন হয়।
9. রেচন কার্য সমগ্র দেহ দ্বারা অথবা নির্দিষ্ট দেহছিদ্র সাইটোপাইজ বা কোষ পায়ু (Cytopyge) মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সঙ্কোচন-

শীল গহ্বরের সাহায্যে দ্রবীভূত রেচনপদার্থ নিষ্কাশিত হয়। সংকোচনশীল গহ্বর (Contractile Vacuole) দেহের জলের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণ করে।

10. **প্রজনন** অযৌন বা যৌন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে। সাধারণতঃ অযৌনজনন পদ্ধতিতে **বিভাজন (Fission)** বা **কোরকোদ্গম (budding)** এবং যৌন জনন পদ্ধতি **সংযুক্তি** বা **কন্‌জুগেশান (Conjugation)** অথবা **স্পোর** বা **জননকোষ** দ্বারা সংঘটিত হয়।

11 বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে জীবনচক্র সম্পন্ন হইতে পারে এবং প্রতিকূল পরিবেশে ইহারা **সিস্ট** গঠন করে।

12. ইহারা এককভাবে বা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে।

13. **স্বাধীনজীবী** (স্বাদু বা লোনা জলে, আবর্জনা ও আর্দ্র মৃত্তিকা প্রভৃতি স্থানে বাস), **পরজীবী** (উদ্ভিদ বা অন্য প্রাণীতে) এবং **মিথোজীবী**।

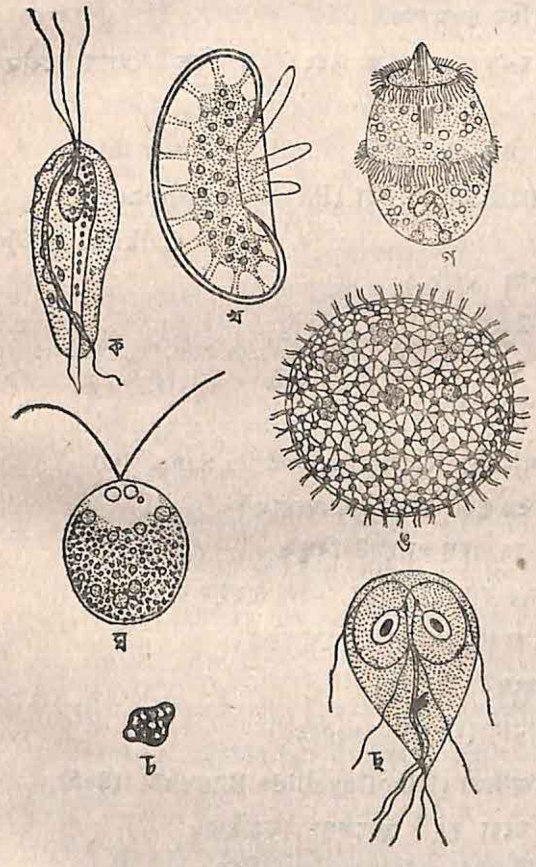
শ্রেণী বিন্যাস (Classification)

সকল এককোষী প্রাণী (A-cellular or Single celled animals) উপরাজ্য আদ্যপ্রাণী (Sub-kingdom—Protozoa) গঠন করে। অন্ততঃ 65,000 এর বেশী প্রজাতির প্রাণী এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা নূতন নূতন গবেষণার আলোকে যতই প্রকাশ পাইতেছে ততই ইহাদের সকলকে একই পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা প্রাণিবিদগণের সাধারণ বুদ্ধি ও যুক্তির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইতেছে।

1964 খৃষ্টাব্দে হনিগবার্গ (**Honigberg, et al, 1964** প্রবর্তিত শ্রেণী বিভাজন পদ্ধতি অনুযায়ী সকল আদ্যপ্রাণী একটি পর্বের **(Phylum)** অন্তর্ভুক্ত এবং পর্ব আদ্যপ্রাণী চারিটি উপপর্বে **(Sub-phylum)** বিভক্ত। এই শ্রেণী বিভাগের পূর্বে আদ্যপ্রাণী পর্ব বিভিন্ন মতবাদের বিভিন্ন উপপর্বভুক্ত ছিল। প্রাথমিকভাবে গমনাঙ্গের উপর নির্ভর করিয়াই এই ভাগ করা হইয়াছিল।

প্রচলিত শ্রেণীবিভাজন কখনই সম্পূর্ণ নিখুঁত নহে। তাই অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ **(Levine, et al, 1980. Society of Protozoologists through its Committee on Systematics and evolution)** অনুবীক্ষণিক যন্ত্রের সাহায্যে নূতন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে আদ্যপ্রাণী নূতন পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত শ্রেণীবিন্যাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই

শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী উপরাজ্য আদ্যপ্রাণী সাতটি পর্বে—সার্কোম্যাষ্টিগোফোরা (Sarcomastigophora), ল্যাবাইরিন্থোমরফা (Labyrinthomorpha), এপিকমপ্লেক্সা (Epicomplexa), মাইক্রোস্পোরা (Microspora), এসেটোস্পোরা (Ascetospora), মিক্সোস্পোরা (Myxospora) এবং সিলিয়োফোরা (Ciliophora) বিভক্ত। আনুমানিক 65,000 এর উপর আদ্যপ্রাণীর প্রজাতির নামকরণ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী জীবাশ্ম এবং 10,000 এর মত পরজীবীর সন্ধান মিলে। নিঃসন্দেহে আরও হাজার হাজার প্রজাতি আছে যাহাদের এখনও সনাক্ত করা যায় নাই।



চিত্র-1
কয়েকটি আদ্যপ্রাণী
ক) ট্রাইকোমোনাস
খ) আর্সেলা ভালগারিস
গ) ডিডিনিয়াম
ঘ) ক্ল্যামাইডোমোনাস
ঙ) ভলভক্স কলোনি
চ) নসেমা টারমাইটিস
ছ) জিয়ারডিয়া ইনটেসটিনালিস।

তবে এটা খুবই উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান শ্রেণীবিভাগের উন্নতিকল্পে 1964 সালের শ্রেণীবিন্যাস অপ্রচলিত হইলেও একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ছিল।

পর্ব 1. সার্কোম্যাষ্টিগোফেরা (Sarcomastigophora Honigberg & Balamuth, 1963)

(i) নিউক্লিয়াস একপ্রকার (Monomorphic)।
(ii) স্পোর গঠিত হয় না, জননকার্য সিনগ্যামী (Syngamy) পদ্ধতিতে হয়।
(iii) চলনঅঙ্গ ক্ষণপদ অথবা ফ্লাজেলা অথবা উভয়সম্পন্ন হয়।

উপপর্ব 1. ম্যাষ্টিগোফোরা (Mastigophora Diesing, 1866)

(i) দেহ পেলিকিল দ্বারা আবৃত।
(ii) এক বা একাধিক চলন অঙ্গ।
(iii) দীর্ঘ অক্ষে-দ্বি-বিভাজন হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যৌন জনন ঘটে।
(iv) স্বাধীনজীবি কিছু পরজীবী।

শ্রেণী 1. ফাইটোম্যাষ্টীগোফোরিয়া (Phytomastigophorea Calkins, 1909)

(i) ক্রোমাটোফোর থাকে।
(ii) ফ্লাজেলা 1—2 থাকে।
(iii) নিউক্লিয়াস থলি আকৃতি।
(iv) বেশীর ভাগ স্বাধীনজীবী।

বর্গ 1. ক্রিপ্টোমোনাডিডা (Cryptomonadida Senn, 1900)

(i) অসম আকৃতির দুইটি ফ্লাজেলা বিদ্যমান।
(ii) দেহের মধ্যভাগ পর্যন্ত গ্যালেট বিস্তৃত।
(iii) ক্রোমাটোফোর বাদামী, লাল, নীল ও হলুদ রঙের হয়।
(iv) পুষ্টি হোলোফাইটিক বা স্যাপ্রোজোয়িক।
(v) যৌন জনন সংঘটিত হয় না।

উদাহরণ—ক্রিপ্টোমোনাস (Cryptomonas)।

বর্গ 2. ডাইনোফ্লাজেলিডা (Dinoflagellida Bütschli, 1885)

(i) দেহখাঁজের মধ্যে দুইটি ফ্লাজেলা অবস্থিত।
(ii) গ্যালেট থাকিতেও পারে অথবা অনুপস্থিত।
(iii) ক্রোমাটোফোর বিভিন্ন রঙের।
(iv) কিছু কিছু প্রাণীতে থিকা (Theca) যৌন জনন উপস্থিত।

উদাহরণ : সেরাটিয়াম (Ceratium), গিমনোডিনিয়াম (Gymnodinium) প্রোরোসেণ্ট্রাম (Prorocentrum)

বর্গ 3. ইউগ্লিনিডা (Euglenida Bütschli, 1884)

(i) বড় আকৃতির ফ্লাজেলা একটি বা দুইটি দেহের সম্মুখে খাঁজে অবস্থিত।

(ii) দেহের সম্মুখভাগে গ্যালেট অথবা সাইটোফ্যারিঙ্কস আছে।

(iii) অসংখ্য সবুজ রঙের ক্রোমাটোফোর থাকে অথবা অনুপস্থিত।

(iv) স্টিগমা এবং সঙ্কোচনশীল গহ্বর সম্মুখভাগে অবস্থিত।

(v) পুষ্টি হোলোফাইটিক, স্যাপ্রোজোয়িক এবং হোলোজোয়িক হইতে পারে।

উদাহরণ : ইউগ্লিনা (Euglena), পেরানিমা (Peranima) , স্ফেনোমোনাস (Sphenomonas) ইত্যাদি।

বর্গ 4. ক্রাইসোমোনাডিডা (Chrysomonadida Engler, 1898)

(i) কোনও কোনও সময় অ্যামিবয়েড আকৃতির হয়।

(ii) একটি বা দুইটি ফ্লাজেলা থাকে।

(iii) গ্যালেট বা খাদ্যনালী অসম্পূর্ণ বা অনুপস্থিত।

(iv) যৌনজনন দেখা যায়।

(v) পুষ্টি সাধারণতঃ হোলোফাইটিক, কখনও স্যাপ্রোফাইটিক অথবা হোলোজোয়িক।

উদাহরণ : অক্রোমোনাস (Ochromonas), সাইনিউরা (Synura)।

বর্গ 5. হেটেরোক্লোরিডা (Heterochlorida Pascher, 1912)

(i) দুইটি অসম আকৃতির ফ্লাজেলা বিদ্যমান।

(ii) ক্রোমোটোফোর হলুদ-সবুজ বর্ণের হয়।

(iii) শৈবালের ন্যায় দেহ অনমনীয় সেলুলোজ দ্বারা আবৃত।

উদাহরণ : হেটেরোক্লোরিস (Heterochloris), ক্লোরামিবা (Chloramoeba)

বর্গ 6. ক্লোরোমোনাডিডা (Chloromonadida Klebs, 1892)

(i) সাধারণতঃ দুইটি হেটেরোকণ্ট ফ্লাজেলা থাকে।

(ii) সবুজবর্ণের ক্রোমাটোফোর।

(iii) সম্মুখভাগে গল্গিবডির উপস্থিতি দেখা যায়।

(iv) যৌন জনন সংঘটিত হয়।

উদাহরণ : ভ্যাকুওলারিয়া (Vacuolaria)

বর্গ 7. প্রিমনেসিডা (Prymnesida Hibberd, 1976)

(i) দুইটি সম অথবা অসম আকৃতির ফ্লাজেলার মাঝে হ্যাপটোনেমা (তৃতীয়-উপাঙ্গ) বিদ্যমান।

(ii) ক্রোমাটোফোর বাদামী বর্ণের।

উদাহরণ ঃ ক্রাইসোক্রোমিউলিনা (Chrysochromulina), প্রিমনেসিয়াম (prymnesium)।

বর্গ 8. ভলভোসিডা (Volvocida Francé, 1894)

(i) শৈবালের ন্যায় দেহ অনমনীয় সেলুলোজ দ্বারা আবৃত।

(ii) গ্যালেট অনুপস্থিত।

(iii) সাধারণতঃ দুইটি কখনও চারিটি সমআকৃতির ফ্লাজেলা থাকে।

(iv) ক্রোমাটোফোর ঘাস বর্ণের হয়।

(v) পুষ্টি হোলোফাইটিক অথবা স্যাপ্রোফাইটিক।

(vi) যৌনজনন সংঘটিত হয়।

উদাহরণ : ক্লামিডোমোনাস (Chlamydomonas), ভলভক্স (Volvox)।

বর্গ 9. প্রাসিনোমোনাডিডা (Prasinomonadida Christensen,-1962)

(i) একটি, দুইটি, চারিটি অথবা আটটি ফ্লাজেলা সারিবদ্ধভাবে থাকে।

(ii) কোষের চারিধারে এক বা দুই স্তরের গল্গি হইতে উৎপন্ন স্কেল বিদ্যমান।

(iii) যৌনজনন পরিলক্ষিত হয়।

উদাহরণ: মেসোস্টিগ্‌মা (Mesostigma), প্রাসিনোমোনাস (Prasinomonas).

বর্গ 10. সিলিকোফ্লাজেলিডা (Silicoflagellida Borgert. 1891)

(i) একটিই ফ্লাজেলাম থাকে। ক্রোমাটোফোর সবুজ-বাদামী বর্ণের হয়। যৌন জনন অনুপস্থিত।

উদাহরণ: ডিক্‌টিওকা (**Dictyocha**)।

শ্রেণী **2.** জু-ম্যাষ্টিগোফোরিরা (**Zoomastigopohora Calkins, 1901**)

(i) ক্রোমাটোফোর থাকেনা,
(ii) ফ্লাজেলা একটি বা অনেক।
(iii) অ্যামিবয়েড আকৃতির, ফ্লাজেলা থাকিতেও পারে অথবা অনুপস্থিত।
(iv) আনডুলেডিটিং পর্দা থাকে।
(v) যৌনজনন কিছুকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়।
(vi) পরজীবী ও মুক্তজীবী।

বর্গ 1. কোয়ানোফ্লাজেলিডা (**Choanoflagellida u. c. ent, 1880**)

(i) একটিই ফ্লাজেলাম সম্মুখ ভাগে থাকে।
(ii) আনডুলেটিং পর্দা অথবা বাস্কেটের মত লোরিকা (**Lorica**) বিদ্যমান।
(iii) মুক্তজীবী।

উদাহরণ: মোনোসিগা (**Monosiga**)।

বর্গ 2. কাইনেটোপ্লাসটিডা (**Kinetoplastida Honigberg, 1963. emend. Vickerman, 1976**)

(i) একটি অথবা দুইটি ফ্লাজেলার দেহ খাঁজ হইতে উৎপত্তি।
(ii) কাইনেটোপ্লাস্ট ফ্লাজেলাম কাইনেটোসোমের কাছেই বিদ্যমান।
(iii) পরজীবী (বেশীর ভাগই পরিচিত) ও মুক্তজীবী। মুক্তজীবীদের হোলোজোয়িক পুষ্টি এবং পরজীবীদের স্যাপ্রোফাইটিক পুষ্টি।

উদাহরণ: ট্রাইপানোসোমা (**Trypanosoma**), লিস্‌মানিয়া (**Leishmania**)।

বর্গ 3. প্রোটেরোমোনাডিডা (**Proteromonadida Grassé, 1952 emend. Vickerman, 1976**)

(i) একটি অথবা চারিটি ফ্লাজেলাতে প্যারাক্সিয়াল রডস্‌ (**Paraxial rods**) থাকে না।

(ii) মাইটোকনড্রিয়ন কাইনেটোসোম থেকে দূরে অবস্থিত।
(iii) সিস্ট বিদ্যমান।
(iv) ইহারা পরজীবী।

উদাহরণ: প্রোটেরোমোনাস (Proteromonas)

বর্গ 4. রেটোরটামোনাডিডা (Retortamonadida Grasse, 1952)

(i) দুইটি থেকে চারিটি ফ্লাজেলা থাকে।
(ii) মাইটোকনড্রিয়া ও গল্গিবস্তু অনুপস্থিত।
(iii) সিস্ট থাকে।
(iv) পরজীবী।

উদাহরণ: চিলোম্যাস্টিক্স (Chilomastix)।

বর্গ 5. ডিপ্লোমোনাডিডা (Diplomonadida Wenyon, 1926 emend. Brugerolle, 1975)

(i) সাধারণত: সাইটোস্টোম আছে।
(ii) ফ্লাজেলার সংখ্যা তিন হইতে আট, কখনও বেশী ;
(iii) সিস্ট বিদ্যমান।
(iv) মুক্তজীবী অথবা পরজীবী (বেশীর ভাগই অন্তঃপরজীবী)।

উদাহরণ: জিয়ার্ডিয়া (Giardia), এনটেরোমোনাস (Enteromonas)।

বর্গ 6. অক্সিমোনাডিডা (Oxymonadida Grasse, 1952)

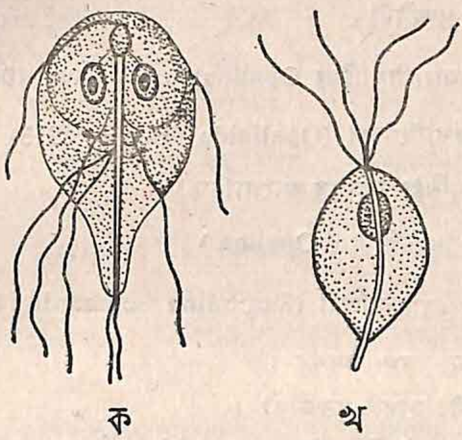
(i) প্রত্যেকটিতে চারিটি ফ্লাজেলা থাকে।
(ii) মাইটোকনড্রিয়া এবং গল্গিবস্তু অনুপস্থিত।
(iii) কিছুকিছু ক্ষেত্রে সিস্ট বিদ্যমান। পরজীবী।

উদাহরণ: অক্সিমোনাস্ (Oxymonas).

সুপার বর্গ—প্যারাবাসালিডিয়া (Parabasalidea Honigberg, 1973)

(i) কমপক্ষে কিছু কাইনেটোসোম ফ্লাজেলা বহন করে অথবা অনুপস্থিত।
(ii) গল্গিবস্তু ফিলামেণ্টে পরিণত হয়।
(iii) মাইটোকনড্রিয়া অনুপস্থিত।

বর্গ 7. ট্রাইকোমোনাডিডা (Trichomonadida Kirby, 1947)



চিত্র-2 ক) পেণ্টাট্রাইকোমোনাস হোমিনিস্ খ) ট্রাইকোমোনাডিডা

emend. Honigberg, in camp, Mattern & Honigberg, 1974)

(i) সাধারণতঃ চার অথবা ছয়টি ফ্লাজেলা যুক্ত ক্যারিয়োম্যাস্টিগণ্টস।

(ii) সিস্ট দেখা যায় না।

(iii) সবই পরজীবী।

উদাহরণ : ট্রাইকোমোনাস (Trichomonas), হিস্টোমোনাস (Histomonas)

বর্গ 8. হাইপারম্যাস্টিগিডা (Hypermastigida Grasse & Foa, 1911)

(i) পরজীবী এবং মিথোজীবী।

(ii) সাইটোস্টোম অনুপস্থিত।

(iii) ফ্লাজেলার সংখ্যা বহু।

(iv) একটিই নিউক্লিয়াস থাকে।

উদাহরণ : ট্রাইকোনিম্ফা (Trichonympha), লোফোমোনাস (Lophomonas)

উপপর্ব II. ওপালিনাটা (Opalinata Corliss & Balamuth, 1963)

(i) অসংখ্য সিলিয়া তেরছাভাবে দেহের চতুর্দিকে ঘিরিয়া থাকে।

(ii) সাইটোষ্টোম অনুপস্থিত।

(iii) দ্বি-বিভাজন পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়।
(iv) সব পরজীবী।

শ্রেণী 1. ওপালিনাটিয়া Opalinatea Wenyon, 1962)

বর্গ 1. ওপালিনাডা (Opalinida Poche, 1913)

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উপপর্বে আলোচিত।

উদাহরণঃ ওপালিনা (**Opalina**)

উপপর্ব III সার্কোডিনা (Sarcodina Schmarda, 1871)

(i) চলন অঙ্গ ক্ষণপদ।
(ii) বেশীর ভাগই মুক্তজীবী।
(iii) ফ্যাগোট্রোফিক (**Phagotrophic**) পুষ্টি দেখা যায়।

সুপার শ্রেণী—রাইজোপোডা (Rhizopoda Von Siebold 1845)

ক্ষণপদ লোবোপড অথবা ফিলোপড অথবা রেটিকিউলোপড।

শ্রেণী—1. লোবোসিয়া (Lobosea Carpenter, 1861)

(i) দেহ নগ্ন ও অনির্দিষ্ট আকৃতির।
(ii) ক্ষণপদ লোবোপড, স্থূল ও পরিবর্তনশীল।
(iii) বহিঃপ্লাজম ও এবং অন্তঃপ্লাজম সুস্পষ্ট।

উপশ্রেণী—গিম্নামোবিয়া (Gymnamoebia Haeckel, 1862)

বহিঃপ্লাজম এবং অন্তঃপ্লাজম সুস্পষ্ট।

বর্গ—1. অ্যামিবিডা (Amoebida Ehrenberg, 1830)

(i) আদর্শগত একটি নিউক্লিয়াস সমন্বিত।
(ii) মাইটোকনড্রিয়া বিদ্যমান।
(iii) ফ্লাজেলা দশা অনুপস্থিত।

উদাহরণঃ অ্যামিবা (**Amoeba**), **Entamoeba** (এণ্টামিবা)।

বর্গ 2. সাইজোপাইরেনিডা (Schizopyrenida Singh, 1952)

অস্থায়ীভাবে ফ্লাজেলা দশা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়।

উদাহরণঃ টেট্রামিটাস (**Tetramitus**)।

বর্গ 3. পেলোবিয়োনটিডা (Pelobiontida Page 1976).

(i) অসংখ্য নিউক্লিয়াস সমন্বিত হয়।

(ii) মাইটোকনড্রিয়া অনুপস্থিত।

উদাহরণ : পেলোমিক্সা (Pelomyxa)

উপশ্রেণী II. টেস্টোসিয়ালোবোসিয়া (Testacealobosia De Saedeleer, 1934).

দেহটি টেষ্ট (Test), টেক্টাম (Tectum) অথবা অন্যান্য জটিল পর্দা দ্বারা আবৃত।

বর্গ 1. আর্সেলিনিডা (Arcellinida Kent, 1880)—দেহে একটি ছিদ্র থাকে।

উদাহরণ : আরসেলা (Arcella,) ডিফ্লুজিয়া (Difflugia)।

বর্গ 2. ট্রাইকোসিডা (Trichosida Mobius, 1889)

(i) তন্তুময় আবরণী দ্বারা টেষ্ট নির্মিত।

(ii) বহুছিদ্রের মধ্যদিয়া শঙ্কু আকৃতির ক্ষণপদ বিস্তৃত হয়।

(iii) ইহারা সামুদ্রিক প্রাণী।

উদাহরণ : ট্রাইকোস্ফেরিয়াম (Trichosphaerium).

শ্রেণী 2. আকারপোমিক্সিয়া (Acarpomyxea Page, 1976)

(i) ক্ষুদ্র প্লাসমোডিয়া অথবা অধিক বিস্তৃত একটি নিউক্লিয়াস সমন্বিত।

(ii) ক্ষণপদ সূক্ষ্ম ও শাখাসমন্বিত।

বর্গ 1. লেপ্টোমিক্সিডা (Leptomyxida Pussard, 1973,)

সিস্ট তৈয়ারী করে।

উদাহরণ : লেপ্টোমিক্সা (Leptomyxa)

বর্গ 2. স্টিরিয়োমিক্সিডা (Stereomyxida Grell, 1966)

(i) সামুদ্রিক, আমিবয়েড আকৃতির।

(ii) শাখাসমন্বিত ক্ষণপদ।

উদাহরণ : কোরালোমিক্সা (Corallomyxa)।

শ্রেণী 3. আক্রাসিয়া (Acrasea Schroter, 1866)

ক্ষণপদ লোবোপড, অ্যামিবির জমায়েতের ফলে সুইডোপ্লাসমোডিয়াম গঠিত হয়।

বর্গ 1. আক্রাসিডা (Acrasida Schroter, 1866)
বৈশিষ্ট্য শ্রেণীতে আলোচিত।
উদাহরণ : আক্রাসিস (Acrasis).

শ্রেণী 4. ইউমাইসেটোজোয়া (Eumycetozoea Zopf, 1844)
(i) উপক্ষণপদযুক্ত।
(ii) ফ্লাজেলাতে ম্যাষ্টিগোনেমা অনুপস্থিত।

উপশ্রেণী 1. প্রোটোস্টেলিয়া (Protosteliia Olive & Stoianovitch, 1966)

(i) ফ্লাজেলেট কোষ থাকিতেও পারে অথবা অনুপস্থিত।
(ii) এক বা একাধিক স্পোর সৃষ্টি করে।

বর্গ 1. প্রোটোস্টেলিডা (Protostellida Olive & Stolanovitch, 1966)

বৈশিষ্ট্য উপশ্রেণীতে আলোচিত।
উদাহরণ : প্রোটোষ্টেলিয়াম (Protostelium)
উপশ্রেণী 2. ডিক্টিওস্টেলিয়া (Dictyostellia Lister, 1909)
ফ্লাজেলেট কোষ অনুপস্থিত।

বর্গ 1. ডিক্‌টিওস্টেলিডা (Dictyostellida Lister, 1909)
পূর্বে আলোচিত।
উদাহরণ : ডিক্টিওস্টেলিয়াম (Dictyostelium)

উপশ্রেণী 3. মিক্সোগাসট্রিয়া (Myxogastria Fries, 1829)
(i) অসংখ্য নিউক্লিয়াস সমন্বিত প্লাসমোডিয়াম।
(ii) ফ্লাজেলেট কোষ বিদ্যমান।
(iii) জনন পদ্ধতি সিনগামী দ্বারা সংঘটিত হয়।
বর্গ 1. একাইনোস্টেলিডা (Echinosteliida Martin, 1961)
ক্ষুদ্র প্লাসমোডিয়াম অ্যামিবা আকৃতির।
উদাহরণ : একাইনোস্টেলিয়াম (Echinostelium)

বর্গ 2. লিসিডা (Liceida Lister, 1909)

(i) হাল্কা রঙের স্পোর।

(ii) স্পোরোকার্পে চূন অনুপস্থিত।

উদাহরণ: লিসিয়া (Licea)

বর্গ 3. ট্রিকিডা (Trichiida Masse, 1892)

(i) ক্যাপিলিটিয়াম উপস্থিত।

উদাহরণ: ট্রিকিয়াম (Trichium)

বর্গ 4. স্টেমোনিটিডা (Stemonitida Masse, 1892)

গাঢ় রঙের স্পোর।

উদাহরণ: স্টেমোনিটিস (Stemonitis)

বর্গ 5. ফাইসারিডা (Physarida Masse, 1892)

পেরিডিয়াম ক্যালকেরিয়াস সমন্বিত।

উদাহরণ: ফাইসারাম (Physarum)

শ্রেণী—5. প্লাসমোডিয়োফোরিয়া (Plasmodiophorea Cook, 1928)

(i) অন্তঃকোষীয় পরজীবীর ক্ষুদ্র প্লাসমোডিয়া বিদ্যমান।

(ii) জু-স্পোর গঠিত হয়।

(iii) যৌন জনন কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়।

বর্গ 1. প্লাসমোডিয়োফোরিডা (Plasmodiophorida Cook, 1928)

পূর্বে আলোচিত।

উদাহরণ: প্লাসমোডিয়োফোরা (Plasmodiophora)।

শ্রেণী 6. ফাইলোসিয়া (Filosea Leidy, 1879)

শাখাযুক্ত ফিলোপড। বহিঃপ্লাজম অনুপস্থিত।

বর্গ 1. অ্যাকনচুলিনিডা (Aconchulinida De Saedeleer, 1934)

(i) দেহ আবৃত নহে।

(ii) ফিলোপড হায়ালিনলোব থেকে উৎপন্ন হয় না।

উদাহরণ: নিউক্লিরিয়া (Nuclearia)

বর্গ 2. গ্রোমিডা (Gromiida Claparede & Lachmann, 1859)
দেহ টেষ্ট দ্বারা আবৃত।
উদাহরণ : ইউগ্লাইফা (Euglypha), গ্রোমিয়া (Gromia)

শ্রেণী 7. গ্রান্নুলোরেটিকুলোসিয়া (Granuloreticulosea De Saedeleer, 1934)
দানাদার রেটিকুলোপড।

বর্গ 1. অ্যাথালামিডা (Athalamida Haekel, 1862)
দেহ অনাবৃত।

উদাহরণ : অ্যারাকনিউলা (Arachnula)

বর্গ 2. মনোথলামিডা (Monothalamida Haeckel, 1862)
(i) জনুক্রমঘটেনা।
(ii) দেহ টেষ্ট দ্বারা আবৃত।
উদাহরণ : লিবার্কুয়েনিহা (Lieberkuehnia)

বর্গ 3. ফোরামিনিফেরিডা (Foraminiferida D' Orbigny, 1826)
(i) বড় আকৃতির, অধিকাংশই সামুদ্রিক।
(ii) বহু কক্ষযুক্ত খোলক বিশিষ্ট।
(iii) ক্ষণপদ সূক্ষ্ম, শাখাসমন্বিত জালকাকার সৃষ্টি করে।
উদাহরণ: এল্‌ফিডিয়াম (Elphidium) * এলোগ্রোমিয়া (Allogromia)

শ্রেণী 8. জেনোফিয়োফোরিয়া (Xenophyophorea Schulze, 1904)
সামুদ্রিক, অসংখ্য নিউক্লিয়াস সমন্বিত প্লাসমোডিয়াম।
বর্গ 1. সাম্মিনিডা (Psamminida Poche, 1913)
শক্ত সমর্থ দেহটিতে ফিতাকৃতি লিনেলি (Linellae) অনুপস্থিত।
উদাহরণ : সাম্মিনা (Psammina)

বর্গ 2. স্টানোমিডা (Stannomida Tendal, 1972)
নমনীয় দেহটিতে ফিতাকৃতি লিনেলি থাকে।
উদাহরণ : স্টানোফাইলাম (Stannophyllum)

* এলফিডিয়ামের পূর্বনাম পলিস্টোমেলা (Polystomella)

সুপারশ্রেণী—অ্যাক্টিনোপোডা (Actinopoda Calkins, 1909)

(i) ক্ষণপদ অ্যাক্সোপড, মুক্ত অথবা সংলগ্ন।

(ii) জননকোষ ফ্লাজেলাযুক্ত।

শ্রেণী **1.** আকান্থারিয়া (Acantharea Haeckel, 1881)

(i) অছিদ্রল এবং স্পিকিউল থাকে।

(ii) সকলেই সামুদ্রিক ।

(iii) ট্রপিক কোষগুলি ফ্লাজেলাযুক্ত।

বর্গ **1.** হোলাকান্থিডা (Holacanthida Schewiakoff, 1926)
সাধারণতঃ **10**টি, কখনও **16**টি কণ্টক (Spine) কেন্দ্রে থাকে।
উদাহরণ: অ্যাকান্থোকোলা (Acanthocolla)।

বর্গ 2. সিম্ফিয়াকান্থিডা (Symphacanthida Schewiakoff, 1926)
22 টি কণ্টক কেন্দ্রে মিলিত হয়।
উদাহরণ: আকান্থোলিথিয়াম (Acantholithium)

বর্গ 3. চাউনাকান্থিডা (Chauna Canthida Schewiakoff, 1926)
স্পোরোজেনেসিসের পূর্বে এনসিস্টমেন্ট ঘটে।
উদাহরণ: কোনাকন (Conacon)।

বর্গ 4. আর্থ্রাকান্থিডা (Arthracanthida u.c. chewiakoff, 1926)
সিস্ট গঠিত হয় না।
উদাহরণ: লিথোপ্টেরা (Lithoptera)

বর্গ 5. অ্যাক্টিনেলিডা (Actinellida Haeckel, 1885)
পরিবর্তনশীল কণ্টক থাকে।
উদাহরণ: অ্যাক্টিনেলিয়াস (Actinelius)

শ্রেণী **2.** পলিসিস্টিনিয়া (Polycystinea Ehrenberg, 1838)
সামুদ্রিক, কণ্টক নির্মিত তিনটির বেশী ছিদ্রবিশিষ্ট পর্দা থাকে।

বর্গ **1.** স্পুমেলারিডা (Spumellarida Ehrenberg, 1875)
সমভাবে ছিদ্র বিস্তৃত।

২

উদাহরণ : ক্যালোস্ফিরা (Callosphaera)

বর্গ 2. নাসেলারিডা (Nassellarida Ehrenberg, 1875)
ছিদ্রগুলি একদিকে বিদ্যমান।
উদাহরণ : ইউকোরোনিস (Eucoronis)

শ্রেণী 3. ফিয়োডারিয়া (Phaeodarea Haeckel, 1879)

(i) সিলিকাদ্বারা খোলক নির্মিত, ফাঁপা কণ্টকযুক্ত।
(ii) এসট্রোপাইল (Astropyle) সাইটোফারিঙ্কস-এর ন্যায় কাজ করে।
(iii) বহিঃপ্লাজমে ফিয়োডিয়াম বিদ্যমান।
(iv) ইহারা সামুদ্রিক।

বর্গ 1. ফিয়োসিস্টিডা (Phaeocystida Haeckel, 1879)
স্পিকিউল দ্বারা খোলক নির্মিত অথবা কাঠামো অনুপস্থিত।
উদাহরণ : ফিয়োডিনা (Phaeodina)

বর্গ 2. ফিয়োস্ফেরিডা (Phaeospherida Haeckel, 1879)
দেহ সাধারণতঃ গোলাকার বৃহৎ খোলকে আবৃত।
উদাহরণ : এলোস্ফিরা (Aulosphaera)

বর্গ 3. ফিয়োকলপিডা (Phaeocalpida Haeckel, 1887)
দেহ ক্ষুদ্র খোলকে আবৃত, অসংখ্য ছিদ্র বিশিষ্ট, কখনও একটি বৃহৎ ছিদ্র থাকে।

উদাহরণ : কাস্টানেলা (Castanella)

বর্গ 4. ফিয়োগ্রোমিডা (Phaeogromida Haeckel, 1879)

(i) উদ্ভিদের পরজীবী।
(ii) বৃহৎ ছিদ্রযুক্ত খোলক কখনও কণ্টকময়।

উদাহরণ : মেডুসেট্টা (Medusetta)

বর্গ 5. ফিয়োকনচিডা (Phaeoconchida Haeckel, 1879)
কাঠামোতে দুইটি ভালভ্ বিদ্যমান।
উদাহরণ : কনচারিয়াম (Concharium)

বর্গ 6. ফিয়োডেনড্রিডা (Phaeodenrida Haeckel, 1908)
শাখাযুক্ত কণ্টক ভালভ্ হইতে উৎপন্ন হয়।

উদাহরণ : সিলোডেনড্রাম (Coelodendrum)

শ্রেণী 4. হেলিওজোয়া (Heliozoea Haeckel, 1866)

(i) স্বাদুজলবাসী, নিউক্লিয়াস এক বা একাধিক।

(ii) দেহের বাহিরের অংশে ভ্যাকুলেটেড কর্টেক্স এবং ভিতরের অংশে মেডুলা সুস্পষ্ট।

(iii) ক্ষণপদ সূক্ষ্ম ও বহুদিকে প্রসারমান।

বর্গ 1. ডেস্মোথোরাসিডা (Desmothoracida Hertwig & Lesser, 1874)

সেণ্ট্রোপ্লাস অনুপস্থিত।

উদাহরণ : ক্লাথরুলিনা (Clathrulina)

বর্গ 2. অ্যাক্টিনোফ্রিয়াডা (Actinophryida Hartmann, 1913)

(i) সেণ্ট্রোপ্লাষ্ট অথবা এক্সোপ্লাষ্ট অনুপস্থিত।

(ii) যৌন জনন কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

উদাহরণ : অ্যাকটিনোফ্রিজ (Actinophrys), অ্যাকটিনোস্ফোরিয়াম (Actinosphaerium)

বর্গ 3. টাক্সোপোডিডা (Taxopodida Fol, 1883)

(i) দ্বিপার্শ্বীয় ভাবে প্রতিসম।

(il) ইহারা সামুদ্রিক।

উদাহরণ : স্টিকোলন্চি (Sticholonche)

বর্গ 4. সেণ্ট্রোহেলিডা (Centrohelida Kühn, 1926)

(i) সেণ্ট্রোপ্লাষ্ট অথবা এক্সোপ্লাষ্ট উপস্থিত।

(ii) কিছু কিছু প্রজাতিতে ফ্লাজেলা বিদ্যমান।

উদাহরণ : অ্যাকান্থোসিস্টিস্ (Acanthocystis)।

<u>পর্ব II ল্যাবাইরিন্থোমরফা</u> (Labyrinthomorpha Page)

(i) শৈবালের পরজীবী।

(ii) সামুদ্রিক।

(iii) হেটেরোকণ্ট জু-স্পোর উৎপন্ন করে।

শ্রেণী I. ল্যাবাইরিন্থুলিয়া (Labyrinthulea Levine & Corliss,-1963)

বর্গ I. ল্যাবাইরিন্থুলিডা (Labyrinthulida Lankester 1877)

বৈশিষ্ট্য পূর্বে আলোচিত।

উদাহরণ: ল্যাবাইরিন্থুলা (Labyrinthula)

পর্ব III এপিকমপ্লেক্সা (Epicomplexa Levine, 1970)

(i) সকলেই পরজীবী।

(ii) জননকার্য সিনগ্যামী।

(iii) সিলিয়া অনুপস্থিত।

শ্রেণী—I পারকিনসিয়া (Perkinsea Levine, 1979)

(i) কনয়েড অসম্পূর্ণ কোন তৈয়ারী করে।

(ii) জু-স্পোর ফ্লাজেলা সমন্বিত।

(iii) যৌন জনন অনুপস্থিত

বর্গ 1 পারকিনসিডা (Perkinsida Levine, 1978)

বৈশিষ্ট্য পূর্বে আলোচিত।

উদাহরণ: পারকিনসাস (Perkinsus)

শ্রেণী—II স্পোরোজোয়া (Sporozoea Leuckart, 1879)

(i) জননকোষে সিলিয়া অথবা ফ্লাজেলা থাকিতে পারে।

(ii) নিউক্লিয়াস একপ্রকার।

(iii) চলনের জন্য কোন বিশেষ অঙ্গাংশ নাই।

(iv) খাদ্যগহ্বর অনুপস্থিত।

(v) অনেক স্পোর গঠিত হয়। স্পোরের মধ্যে স্পোরোজোয়েট তৈয়ারী হয়।

উপশ্রেণী I গ্রিগেরিনিয়া (Gregarinia Dufour, 1828)

(i) লম্বাটে আকারের ট্রফোজোয়েট।

(ii) বহিঃকোষীয় যৌনজনন।

(iii) জাইগোট উসিস্ট তৈয়ারী করে।

বর্গ 1 আর্কিগ্রিগেরিনিডা (Archigregarinida Grassé, 1953)

(i) জীবনচক্রে মেরোগনি গ্যামেটোগনি স্পোরোগনি পরিলক্ষিত হয়।

উদাহরণ : সেলেনিডিওডেস (Selenidioides)

বর্গ 2 ইউগ্রিগেরিনিডা (Eugregarinida Leger, 1900)

(i) মেরোগনি অনুপস্থিত।

(ii) কম্বোজ এবং সন্ধিপদ পোডা পর্বের প্রাণীর পরজীবী

উদাহরণ : মনোসিস্টিস (Monocystis), ইউরোস্পরা (Urospora)।

বর্গ 3 নিওগ্রিগেরিনিডা (Neogregarinida Grasse, 1953)

(i) মেরোগনি যৌনভাবে অর্জিত হয়।

(ii) পতঙ্গ ইত্যাদির দেহে, পরজীবী।

উদাহরণ : মাটেসিয়া (Mattesia)

উপশ্রেণী II ককসিডিয়া (Coccidia Leuckart, 1879)

(i) পরিণত ট্রফোজোয়েট অন্তঃকোষীয়।

(ii) গ্যামেটোসাইট দুইপ্রকার।

বর্গ 1 অ্যাগামোককসিডিডা (Agamococcidiida Levine, 1979)

মেরোগনি ও গ্যামেটোগনি অনুপস্থিত।

উদাহরণ : রাইটিডোসিস্টিস (Rhytidocystis)

বর্গ 2 প্রোটোকক্সিডিডা (Protococcidiida Kheisin, 1956)

মেরোগনি অনুপস্থিত।

উদাহরণ : গ্রিলিয়া (Grellia)

বর্গ 3 ইউককসিডিডা (Eucocidiida Leger & Duboscq, 1910)

(i) মেরোগনি উপস্থিত।

(ii) কনয়েড ট্রফোজয়েট অ্যামিবার ন্যায়।

(iii) মেরুদণ্ডী প্রাণীর লোহিত কণিকায় অবস্থান করে।

উদাহরণ : প্লাসমোডিয়াম (Plasmodium)

শ্রেণী III পাইরোপ্লাসমিয়া (Piroplasmia Levine, 1961)

(i) ইহারা বিভিন্ন আকৃতির হয়। কনয়েড অনুপস্থিত।
(ii) উসিস্ট তৈয়ারী হয় না।
(iii) ফ্লাজেলা অনুপস্থিত।
(iv) স্পোর গঠিত হয়।

বর্গ I পাইরোপ্লাসমিডা (Piroplasmida wenyon, 1926)

বৈশিষ্ট পূর্বে আলোচিত।

উদাহরণ : বেবেসিয়া (**Babesia**)

পর্ব IV মাইক্রোস্পোরা (Microspora Sprague, 1977)

(i) এককোষী স্পোর এর প্রত্যেকটিতে একটি বা দুইটি নিউক্লিয়াস সমন্বিত স্পোরোপ্লাজম থাকে।
(ii) অন্তঃকোষীয় পরজীবী।

শ্রেণী I. রুডিমাইক্রোস্পোরিয়া (Rudimicrosporea Sprague, 1977)

(i) প্রোটোপ্লাস্টের এর পশ্চাতে গহ্বর থাকে না।
(ii) গোলাকার স্পোর।

বর্গ 1. মেট্চলিকোভেলিডা (Metchnikovellida vivier, 1975)

পূর্বেকার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

উদাহরণ : মেটচ্‌নিকোভেল্লা (**Metchnikovella**).

শ্রেণী—II মাইক্রোস্পোরিয়া (Microsporea Dlephy, 1963)

(i) স্পোর বহু কোষ দ্বারা গঠিত।
(ii) কোষে অনেক মেরুসূত্র (**Polar filament**) থাকে।
(iii) স্পোর আবরণী তিনটি স্তর বিশিষ্ট।

বর্গ I মিনিস্পোরিডা (Minisporida Sprague, 1972)

ক্ষুদ্র মেরুসূত্রযুক্ত কোষ।

উদাহরণ : বার্কিয়া (**Burkea**)

বর্গ 2. মাইক্রোস্পোরিডা Microsporida Balbiani, 1882)

(i) পোষককোষের অভ্যন্তরে স্পোরোসিস্ট থাকিতেও পারে অথবা

অনুপস্থিত,

(ii) স্পোর আকৃতি বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে।

(iii) মেরোগনি উপস্থিত।

উদাহরণ: নোসেমা (Nosema)

পর্ব V এসেটোস্পোরা (Ascetospora Sparague, 1978)

(i) স্পোর বহুকোষ দ্বারা গঠিত।

(ii) এক বা একাধিক স্পোরোপ্লাজম থাকে।

(iii) মেরুসূত্র অনুপস্থিত।

(iv) সকলেই পরজীবী।

শ্রেণী—I স্টেলাটোসপোরিয়া (Stellatosporea Sporague, 1978)

(i) হ্যাপ্লোস্পোরোজোম থাকে। স্পোর এক বা একাধিক স্পোরোপ্লাজম সমন্বিত।

বর্গ I অকলুস্পোরিডা (Occlusporida Perkins, in Sprague 1978)

(i) স্পোর একাধিক স্পোরোপ্লাজম সমন্বিত।

(ii) স্পোর প্রাচীর সর্বত্র।

উদাহরণ: মার্টিলিয়া (Marteilia)

বর্গ 2. বালানোস্পোরিডা (Balanosporida Sprague, 1978)

(i) একটিই স্পোরোপ্লাজম সমন্বিত স্পোর।

(ii) স্পোর প্রাচীর সর্বত্র নয়।

(iii) অরিফাইস (orifice) বাইরের দিকে অপারকুলাম দ্বারা আবৃত থাকে।

উদাহরণ: হ্যাপ্লোস্পোরিডিয়াম (Haplosporidium)

শ্রেণী II প্যারামিক্সিয়া (Paramyxea Levine, in Sprague, 1979)

(i) স্পোরে প্যারাইটাল কোষ (Parietal cell) এবং একটিই স্পোরোপ্লাজম থাকে।

(ii) অরিফাইস অনুপস্থিত।

বর্গ I প্যারামিক্সিডা (Paramyxida Chatton, 1911) বৈশিষ্ট্য পূর্বে আলোচিত।

উদাহরণঃ প্যারামিক্সা (Paramyxa)।

পর্ব—VI মিক্সোজোয়া (Myxozoa Grassé, 1970 emend)

(i) স্পোর বহুকোষী।

(ii) একাধিক স্পোরোপ্লাজম।

(iii) সকলেই পরজীবী।

শ্রেণী—I মিক্সোস্পোরিয়া (Myxosporea Bütschli, 1881)

(i) একাধিক স্পোরোপ্লাজম, স্পোর প্রাচীরে সাধারণতঃ 2, কখনও 6 কপাটিকা থাকে।

(ii) ট্রফোজোয়েট দশা খুব উন্নত।

(iii) সিলোজোয়িক অথবা হিস্টোজোয়িক।

বর্গ I বাইভাল্‌ভুলিডা (Bivalvulida Shulman, 1959)

স্পোর প্রাচীর 2-কপাটিকা বিশিষ্ট।

উদাহরণঃ মিক্সিডিয়াম (Myxidium), মিক্সোবোলাস (Myxobolus)

বর্গ 2 মাল্টিভাল্‌ভুলিডা (Multivalvulida Shulman, 1959)

একাধিক কপাটিকা বিদ্যমান।

উদাহরণঃ ট্রাইলোস্পরা (Trilospora)

শ্রেণী II অ্যাক্‌টিনোস্পোরিয়া (Actinosporea Cl.n. Noble)

(i) প্রাচীর তিনটি কপাটিকা বিশিষ্ট।

(ii) অসংখ্য স্পোরোপ্লাজম।

(iii) ট্রফোজয়েট দশা সংক্ষিপ্ত।

উপশ্রেণী I অ্যাক্‌টিনোমিক্সিয়া Actinomyxia Stolc, 1899)

বর্গ I অ্যাক্‌টিনোমিক্সিডা (Actinomyxida ord.n. Lom)

বৈশিষ্ট পূর্বে আলোচিত।

উদাহরণঃ ট্রিয়াক্টিনোমিক্সন (Triactinomyxon),

পর্ব VII সিলিয়োফোরা (Ciliophora Dofliny 1911)

(i) চলন অঙ্গ সরল সিলিয়া অথবা সিলিয়াযুক্ত যৌগ অঙ্গাঙ্গ।
(ii) নিউক্লিয়াস দুই ধরনের—মাইক্রো এবং মাক্রো নিউক্লিয়াস (micro and macronucleus)
(iii) জননকার্য মাইক্রোনিউক্লিয়াস দ্বারা সম্পন্ন হয়। কনজুগেশান (Conjugation) নিউক্লিয়াসের সংযুক্তির ফলে সম্পন্ন হয়।
(iv) সাইটোস্টোম পরিলক্ষিত হয়।
(v) পুষ্টি মিশ্র অথবা বিষমপ্রকার (heterotrophic)

শ্রেণী I কাইনেটোফ্রাগমিনোফোরিয়া (Kinetofragminophorea de Puytorac, etal, 1974)

(i) সাইটোস্টোম সম্মুখভাগে অথবা দেহের মাঝ বরাবর থাকে।
(ii) সাইটোফারিঙ্কস সুস্পষ্ট।

উপশ্রেণী I গিমনোস্টোমটিয়া (Gymnostomatia Bütschli, 1889)
বৈশিষ্ট্য পূর্বে আলোচিত।

বর্গ I প্রোষ্টোমাটিডা (Prostomatida Schewiakoff, 1896)
মাক্রোনিউক্লিয়াস স্বনির্ভর।
উদাহরণ: ডাইডেস্‌মিস (Didesmis).

বর্গ II প্লিউরোস্টোমাটিডা (Pleurostomatida Schewiakoff, 1896)
লম্বা ফালির আকৃতি সাইটোষ্টোম পার্শ্বে বিদ্যমান।

উদাহরণ: অ্যাম্ফিলেপ্টাস (Amphileptus)

উপশ্রেণী II ভেস্টিবিউলিফেরিয়া (Vestibuliferia, de Puytorac etal., 1974)

(i) সম্মুখ ভাগে সাধারণতঃ ভেসটিবিউলাম উপস্থিত।
(ii) সিলিয়া ঘিরিয়া থাকে।
(iii) মুক্তজীবী ও পরজীবী।

বর্গ I ট্রাইকোস্টোমাটিডা (Trichostomatida Bütschli, 1889)

দেহে ক্ষুদ্র সিলিয়া বিদ্যমান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিরাই (cirri) দেখা যায়।

উদাহরণ: ব্যালানটিডিয়াম (Balantidium)

বর্গ 2. এণ্টোডিনিয়োমরফিডা (Entodiniomorphida Reichenow in Doflein & Reichenow, 1929)

(i) পেলিকল্ সাধারণতঃ শক্ত হয়। দেহ সিলিয়া গুচ্ছাকৃতি।

উদাহরণ: এণ্টোডিনিয়াম (Entodiniun)

বর্গ 3. কোল্পোডিডা (Colpodida depuytorac, etal 1974

(i) বেশীর ভাগই মুক্তজীবী।

(ii) সিস্ট দেখা যায়।

উদাহরণ: কোল্পোডা (Colpoda), টিলিনা (Tillina)

উপশ্রেণী II! হাইপোস্টোমাটিয়া (Hypostomatia Schewiakoff, 1896)

(i) দেহ নলাকার অথবা চ্যাপ্টা।

(ii) সাইটোষ্টোম অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত।

সুপার বর্গ I নাসুলিডিয়া (Nassulidea Jankowski, 1967)

(i) মুক্তজীবী, স্বাদুজলবাসী।

(ii) দেহটি সম্পূর্ণভাবে সিলিয়া ঘিরিয়া থাকে।

বর্গ 1 সিনহাইমেনিডা (Synhymeniida depuytorac etal, 1974)

দেহটিকে সম্পূর্ণভাবে সিলিয়া ঘিরিয়া থাকে।

উদাহরণ: অর্থোডোনেল্লা (Orthodonella)

বর্গ 2 নাসুলিডা (Nassulida Jankowski, 1967)

ফ্রেঞ্জ, (Frange) সুস্পষ্ট।

উদাহরণ: নাসুলা (Nassula)

সুপার বর্গ II ফাইলোফারিনগিডিয়া (Phyllopharyngidea depuytorac etal, 1971)

(i) সিলিয়া অঙ্কীয়দেশে সজ্জিত থাকে।

(ii) ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস সাধারণতঃ হেটেরোমেরাস (Heteromerous)

বর্গ I কির্টোফোরিডা (**Cyrtophorida** Fauré-Fremiet, in Corliss 1956)

ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস হেটেরোমেরাস।
উদাহরণ: ডিস্‌টেরিয়া (**Dysteria**)

বর্গ 2, কোনোট্রিকিডা (**Chonotrichida** wallengren, 1895)

(i) সম্পূর্ণভাবে বহিঃ পরজীবী।
(ii) কোরকোদ্‌গম দ্বারা জনন কার্য সম্পন্ন হয়।

উদাহরণ: হেলিয়োকোনা (**Heliochona**), স্পাইরোকোনা (Spirochona)

সুপার বর্গ **III** রিঙ্কোডিয়া (**Rhynchodea Chatton** & Lwoff, 1939)

পরিণত দশার দেহটি অনাবৃত থাকে।

বর্গ 1 রিঙ্কোডিডা (**Rhynchodida Chatton & Lwoff,** 1939)

বৈশিষ্ট্য পূর্বে আলোচিত।
উদাহরণ: স্ফেনোফ্রিয়া (**Sphenophrya**)

সুপার বর্গ **IV** এপোস্টোমাটিডিয়া (**Apostomatidea Chatton & Lwoff,** 1928

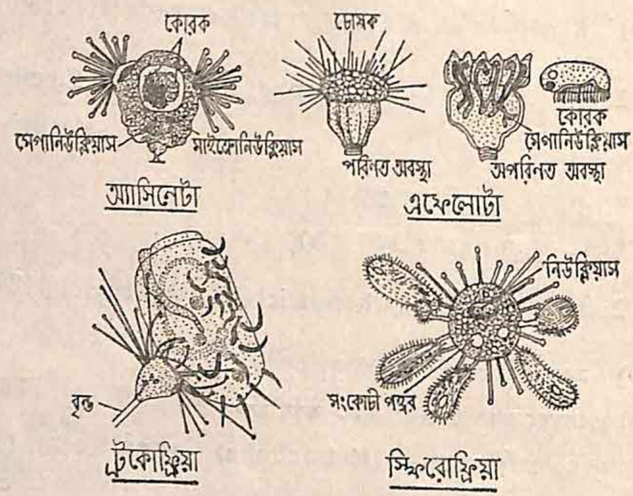
সাইটোষ্টোম সুস্পষ্ট নয় অথবা অনুপস্থিত।

বর্গ I এপোস্টোমাটিডা (**Apostomatida Chatton & Lwoff**) 1939

বৈশিষ্ট্য পূর্বে আলোচিত।

উদাহরণ: কনিডোফ্রিস (**Conidophrys**)

উপশ্রেণী **IV** সাক্টোরিয়া (**Suctoria Claparede & Lachmann,** 1858)



চিত্র 3

(i) শুধুমাত্র শৈশব অবস্থায় ইহাদের দেহে সিলিয়া থাকে।
(ii) অগ্রাংশে কর্ষিকা থাকে।
(iii) গালেট অনুপস্থিত।

বর্গ—সাক্টোরিডা (**Suctorida Claparede & Lachmann, 1858**)
বৈশিষ্ট্য পূর্বে আলোচিত।
উদাহরণ: অ্যাসিনেটা (**Acineta**, এফেলোটা (**Ephelota**)

শ্রেণী II অলিগোহাইমেনোফোরিয়া (**Oligohymenophorea de Puytoracetal, 1974**)
বাক্কাল সিলিয়া খুব উন্নত।

উপশ্রেণী 1 হাইমেনোস্টোমাটিয়া (**Hymenostomatia Delage & Herouard, 1896**)
(i) মুখবিবর অঙ্কীয়দেশে বিদ্যমান।
(ii) বেশীর ভাগই স্বাদুজলবাসী।

বর্গ I হাইমেনোস্টোমাটিডা (**Hymenostomatida Delage & Herouard, 1896**)
(i) মুখবিবর সুস্পষ্ট,
(ii) ঢেউখেলানো পর্দা থাকে।

উদাহরণ : কোল্পিডিয়াম (Colpidium)

বর্গ 2. স্কুটিকোসিলিয়াটিডা (Scuticociliatida Small, 1967)

(i) সিস্ট দেখা যায়।

(ii) দেহকে ঘিরিয়া সিলিয়া থাকে।

(iii) ইহারা স্বাধীনজীবী।

উদাহরণ : প্লিউরোনেমা (Pleuronema)

বর্গ 3. এস্টোমাটিডা (Astomatida Schiwakoff, 1896)

(i) মুখ অনুপস্থিত।

(ii) জননকার্য কোরকোদগম্ দ্বারা সাধিত হয় এবং শৃঙ্খল তৈয়ারী করে।

(iii) সাইটোপ্রক্ট অনুপস্থিত।

উদাহরণ : রেডিওফ্রিয়া (RadioPhrya)

উপশ্রেণী 2. পেরিট্রিকিয়া (Peritrichia Stein, 1859)

গালেটের সহিত ঢেউখেলানো পর্দা থাকে।

বর্গ 1. পেরিট্রিকিডা (Peritrichida Stein, 1859)

বৈশিষ্ট্য পূর্বের মত।

উদাহরণ : ভর্টিসেলা (Vorticella), এপিস্টাইলিস, (Epistylis)

শ্রেণী III পলিমেনোফোরিয়া (Polymenophorea Jankowski 1967)

(i) বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সিলিয়ার সজ্জা বাহিরের দিকে অল্প থাকে।

(ii) কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিরাই বিদ্যমান।

উপশ্রেণী 1 স্পাইরোট্রিকিয়া (Spirotrichia Bütschli 1889)

পূর্বের মত বৈশিষ্ট্য।

বর্গ 1 হেটেরোট্রিকিডা (Heterotrichida Stein, 1859)

(i) মাক্রোনিউক্লিয়াস গোলাকৃতি।

(ii) ইহারা পরজীবী এবং মুক্তজীবী হয়।

উদাহরণ : স্পাইরোস্টোমাম (Spirostomum), স্টেনটর (Stentor)

বর্গ 2. ওডোণ্টোস্টোমাটিডা (Odontostomatida Sawaya, 1940)

(i) সাইটোপ্রক্ট অনুপস্থিত।

(ii) পশ্চাৎভাগ কণ্টকময় হয়।

উদাহরণ : মাইলেসটোমা (Mylestoma)

বর্গ 3. অলিগোট্রিকিডা (Oligotrichida Bütschli, 1887)

(i) দেহে কখনও কখনও লেজ থাকে।

(ii) পেলিকল চওড়া হয়।

উদাহরণ : কোডোনেল্লা (Codonella)

বর্গ 4. হাইপোট্রিকিডা (Hypotrichida Stein, 1858)

(i) সিরাই সুস্পষ্ট নয়, অঙ্কীয় দেশে বিদ্যমান।

(ii) সিলিয়া দেহের উপরিপৃষ্ঠে থাকে।

উদাহরণ : ইউপ্লোটিস (Euplotes)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পর্ব ঃ সারকোম্যাসটিগোফোরা (Sarcomastigophora)

শ্রেণী—লোবোসিয়া (Lobosea)

আদ্যপ্রাণীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পর্ব সারকোম্যাসটিগোফোরা। অসংখ্য প্রজাতি এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্বের লোবোসিয়া শ্রেণীর অন্তর্গত প্রাণীরা ক্ষণপদের সাহায্যে চলাফেরা করে। ক্ষণপদ সাইটোপ্লাজমের পরিবর্তিত রূপ। ক্ষণপদের আকার আয়তন ও সংখ্যা বিভিন্ন ধরনের হয়। ক্ষণপদের বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করিয়া লোবোসিয়া শ্রেণীকে বিভিন্ন বর্গ, গণ বা প্রজাতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—

1. দেহের বাহিরে কোন শক্ত পেলিকল, বা আবরণী থাকে না।
2. সাইটোপ্লাজমের পরিবর্তিত রূপ ক্ষণপদের সাহায্যে চলাচল করে এবং খাদ্য সংগ্রহ করে।
3. ক্ষণপদ বিভিন্ন আকৃতির ও নানা সংখ্যায় হয়।
4. নির্দিষ্ট মুখছিদ্র থাকে না।
5. সামুদ্রিক প্রাণী ব্যতিরেকে সকলক্ষেত্রে সংকোচী গহ্বর থাকে।
6. মেগানিউক্লিয়াস থাকে না।
7. সাধারণতঃ দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে জননকার্য সমাধান করে।
8. বেশীরভাগ স্বাধীনজীবী, কয়েকটি প্রজাতি পরজীবী হয়।

অ্যামিবা প্রোটিয়াস (Amoeba-proteus)

গঠন ও জীবনচক্র ঃ

অ্যামিবা প্রাণিজগতের সবচেয়ে সহজতম উদাহরণ। কারন ইহার দেহ একখণ্ড প্রোটোপ্লাজম দ্বারা আবৃত। তাহা ছাড়াও অ্যামিবা একটি কোষের দ্বারা সকল প্রকার জৈবিককার্য সম্পন্ন করে যেমন চলন, পুষ্টি, শ্বসন, রেচন, ও জনন ইত্যাদি। অ্যামিবা আদ্যপ্রাণীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সহজতম পরিচায়ক।

প্রাণীরাজ্যে অ্যামিবা প্রোটিয়াসের অবস্থান নিম্নরূপ :

পর্ব—সারকোম্যাসটিগোফোরা (Sarcomastigophora)

উপপর্ব—সার্কোডিনা (Sarcodina)

স্থপারশ্রেণী—রাইজোপোডা (Rhizopoda)

শ্রেণী—লোবোসিয়া (Lobosea)

বর্গ—অ্যামিবিডা (Amoebida) বা লোবোসা (Lobosa)

উপবর্গ—টিউবিলিনা—(Tubilina)

গণ—অ্যামিবা (Amoeba)

প্রজাতি—প্রোটিয়াস (Proteus)

স্বভাব ও বসতি (Habit and Habitat)

অ্যামিবা প্রোটিয়াস স্বাধীনজীবী প্রাণী। ইহা সাধারণতঃ পুকুর, ডোবা, স্রোতবিহীন মিঠাজল, ঈষৎ লোনা জল এবং লোনাজলে বাস করে। ইহা পুকুর, ডোবার তলদেশে পচা লতাপাতার উপর বা পাঁকের মধ্যেও থাকে। স্যাঁতস্যাঁতে মাটি ও জলজ উদ্ভিদের উপরও পাওয়া যায়। অ্যামিবা প্রোটিয়াস আনুবীক্ষণিক প্রাণী। খালি চোখে প্রায় অদৃশ্য। ইহারা আঙ্গুলের মতো ক্ষণপদ (Pseudopodia) দ্বারা ধীরে ধীরে চলাফেরা করে।

গঠন (Structure) :

আয়তন :—অ্যামিবা এককোষী আনুবীক্ষণিক আদ্যপ্রাণী। ইহার ব্যাস সাধারণতঃ 600 মাইক্রো হইতে 5 মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। ইহাকে খালি চোখে সাদা ক্ষুদ্র কণিকার মতো দেখায়।

আকার (Shape) : ইহার দেহ আকারবিহীন কিম্বা অনিয়মিত এবং বর্ণহীন অস্বচ্ছ একখণ্ড জেলীর ন্যায় দেখিতে হয়। ইহার দেহ অগ্র পশ্চাৎ এবং পৃষ্ঠ ও অঙ্কীয় তলে নির্দিষ্ট নয় কারণ ইহার দেহের আকার সদা পরিবর্তনশীল।

অ্যামিবার দেহকে প্রধানতঃ দুইটি অংশে ভাগ করা যায়। (I) প্লাজমালেমা (Plasmalemma) নামক সূক্ষ্ম আবরণী (2) সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm) ও উহার অন্তঃস্থ বিভিন্ন বস্তু।

(I) প্লাজমালেমা :—অ্যামিবার দেহকোষটি একটি পাতলা, সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক, অর্ধভেদ্য আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে, ইহাকে প্লাজমালেমা বা প্লাজমাপর্দা বলে। বস্তুতঃ প্রোটোপ্লাজম পরিবর্তিত হইয়া প্লাজমা

পর্দা সৃষ্টি করে। প্লাজমালেমা 25 হইতে 2 মাইক্রা পুরু হইতে পারে। কিন্তু **Bairati** এবং **Lehmann (1953)** এর মতানুসারে প্রায় 500 A. (আর্মস্ট্রং) পুরু এবং ঘন মিউকোপ্রোটিডস (**Mucoproteids**) দ্বারা গঠিত। অর্ধভেদ্য হওয়ায় ইহার মধ্য দিয়া জল, অক্সিজেন, কার্বনডাইঅক্সাইড আস্রাবন পদ্ধতি দ্বারা দেহকোষের মধ্যে প্রবেশ ও বাহির হইতে পারে। স্থিতিস্থাপক ধর্মের জন্য ইহা ক্ষণপদ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

(2) সাইটোপ্লাজম (**Cytoplasm**) :—প্লাজমা পর্দার মধ্যে দেহকোষটি প্রধানতঃ স্বচ্ছ দানাদার জালিকার ন্যায় সমসত্ব গহ্বরযুক্ত জেলীর মত পদার্থ দ্বারা গঠিত। ইহাকেই **সাইটোপ্লাজম** বলে। সাইটোপ্লাজম প্রধানতঃ দুইটি নির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত।

I) বহিঃপ্লাজম বা এক্টোপ্লাজম (**Ectoplasm**)

II) অন্তঃপ্লাজম বা এণ্ডোপ্লাজম (Endoplasm)

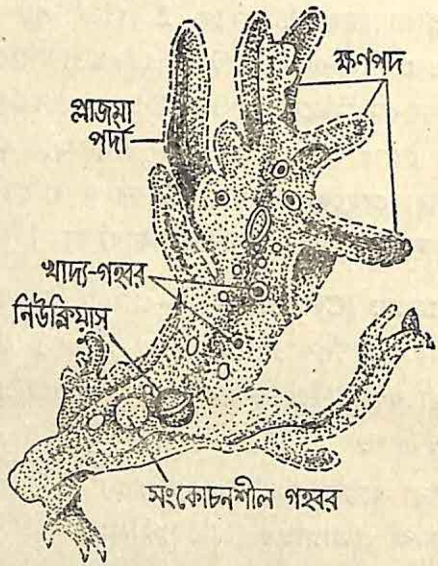
(I) **বহিঃপ্লাজম**—দেহকোষের পরিধি বরাবর প্লাজমাপর্দার ঠিক নীচে সাইটোপ্লাজমের অংশকে **বহিঃপ্লাজম** বা **এক্টোপ্লাজম** বলে। ইহা দানাবিহীন স্বচ্ছ, সমসত্ব এবং অপেক্ষাকৃত ঘন। ইহা কিছুটা অনমনীয় ও সংকোচনশীল হয়। ইহার ক্ষণপদ সামনের দিকে অপেক্ষাকৃত পুরু হয় এবং হায়ালিন টুপি (**Hyaline Cap**) তৈরী করে কিন্তু পিছনের দিকে অপেক্ষাকৃত পাতলা হয়।

(ii) **অন্তঃপ্লাজম** :—দেহকোষের মাঝখানে অবস্থিত বহিঃপ্লাজম দ্বারা পরিবেষ্টিত সাইটোপ্লাজমের অংশকে অন্তঃপ্লাজম বা এণ্ডোপ্লাজম (**Endoplasm**) বলে। ইহা অপেক্ষাকৃত তরল, দানাদার ও ঈষৎ স্বচ্ছ। **Mast** (1931)-এর মতানুসারে ইহার ঘনত্ব (pH) প্রায় 6·8 থেকে 7·3।

Mast এর মতে এণ্ডোপ্লাজম বা অন্তঃপ্লাজমকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। (ক) অপেক্ষাকৃত শক্ত, অমসৃণ দানাদার, জেলীর মতো বাহিরের অংশকে প্লাজমাজেল (**Plasmagel**) এবং ভিতরের দিকে অপেক্ষাকৃত তরল অংশকে (খ) প্লাজমাসল (Plasmasol) বলে।

অন্তঃপ্লাজমের অন্তঃস্থ বিভিন্ন বস্তু—

অ্যামিবা প্রোটিয়াসের অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে বা তরল প্লাজমাসলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সজীব অংশ বা অজীবিয় বস্তু ভাসমান বা নিমজ্জিত অবস্থায়



চিত্র-4 অ্যামিবা প্রোটিয়াস

থাকে। অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে—**নিউক্লিয়াস, খাদ্যগহ্বর, সংকোচীগহ্বর,** বিভিন্ন প্রকার কণিকা, কেলাস ইত্যাদি থাকে। কেলাসের মধ্যে কিছু হইল সঞ্চিত খাদ্য এবং বাকী অংশ হইল বিপাকীয় বস্তু। তাছাড়াও বালুকা কণা, ও বিভিন্ন প্রকার অপ্রয়োজনীয় পদার্থ থাকে।

নিউক্লিয়াস (Nucleus) :—অ্যামিবা প্রোটিয়াসের অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে একটি ডিসের ন্যায় বা বর্তুল (Spherical) এবং উভয় পার্শ্বে উত্তল নিউক্লিয়াস থাকে। এণ্ডোপ্লাজমের মধ্যে ইহার কোন নির্দিষ্ট অবস্থান নাই। নিউক্লিয়াসকে জীবিত অবস্থায় দেখা যায় না কিন্তু **Acetocarmine** নামক রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা বিশেষভাবে রঙ্ করিয়া নিউক্লিয়াসকে দেখা যায়। নিউক্লিয়াসে আ-ক্রোমাটিন ও ক্রোমাটিন নামক দুই ধরনের কণিকা থাকে। নিউক্লিয়াসকে বেষ্টন করিয়া রাখে একটি পাতলা স্বচ্ছ নিউক্লিয়ার পর্দা। **Mereir (1959), Roth, Obet** এবং **Daniels (1960)** মতানুসারে অ্যামিবা প্রোটিয়াসের নিউক্লিয়াসের ভিতরকার ফাঁকা জায়গা সরু সূতার ন্যায় পদার্থ দ্বারা ভর্তি থাকে। ইহা মাকড়সার জালের মত বিস্তারিত থাকে। অ্যামিবার সকল প্রকার জৈবনিক কার্য নিউক্লিয়াস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(ii) সঙ্কোচী গহ্বর (**Contractile Vacuole**) :—অন্তঃপ্লাজমের বাহিরের অংশে দেহকোষের পিছনের দিকে একটি স্বচ্ছ অপেক্ষাকৃত বড়,

গোলাকার এবং সঙ্কোচনশীল, তরল পদার্থপূর্ণ গহ্বর দেখা যায়। ইহাকে **সংকোচী গহ্বর** বা কনট্রাকটাইল ভ্যাকুওল বলে। কয়েকটি ছোট ছোট তরল পদার্থপূর্ণ গহ্বর একসঙ্গে যুক্ত হইয়া সংকোচী গহ্বর তৈয়ারী হয়। ইহা অবিরাম আকার প্রসারিত করে এবং অবশেষে বৃহত্তম আকারে পৌছায় ইহার পর গহ্বরটি ফাটিয়া যায় এবং ইহার ভিতরকার তরলপদার্থ বাহিরে নিক্ষেপ করে। সঙ্কোচনশীল গহ্বরের স্থিতিকাল অনির্দিষ্ট, ইহা সমমাত্রায় সংকুচিত ও প্রসারিত হইয়া দেহকোষের জলসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে ও (**Osmo-regulation**) ও রেচনকার্য সম্পন্ন করিতে সাহায্য করে।

(**iii**) খাদ্য গহ্বর (**Food Vacuole**) :—অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে ইতস্ততঃ অনেকগুলি ছোট ছোট গহ্বর দেখা যায়। এই সকল গহ্বরের মধ্যে বিভিন্ন আকারের খাদ্য কণিকা থাকে। এই গহ্বরকে **খাদ্য গহ্বর** বলে। খাদ্যবস্তু খাদ্য গহ্বরের মধ্যে পরিপাক হয়। পরিপাকের পর খাদ্য গহ্বর অপাচিত বস্তুর সহিত দেহকোষ হইতে বাহির হইয়া যায়, বা অদৃশ্য হইয়া যায়।

(iv) জল গহ্বর (Water Vacuole):—এই সকল গহ্বর স্বচ্ছ, বর্ণহীন, অসঙ্কোচী, গোলাকার এবং জলপূর্ণ হয়।

(v) বিটা কণিকা (Beta granules) বা মিটোকনড্রিয়া (Mito chondria):—বিশেষরং করিয়া ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে, অ্যামিবা প্রোটিয়াসের সঙ্কোচী গহ্বরের চারিদিকে কতকগুলি গোলাকার কণিকা দেখা যায়, ইহাদের **বিটা কণিকা** বলে। এই **কণিকা** বহুকোষী প্রাণীদের মিটোকনড্রিয়া বা কনড্রিওসোমের সমতুল্য। এই **কণিকা** দেহ কোষের শ্বসনকার্য, উৎসেচক কার্যের ও সঙ্কোচী গহ্বরের সঙ্কোচন প্রসারণের কার্য সম্পাদন করিতে সাহায্য করে।

(vi) গলজি বস্তু (Golgi material) :—বিশেষ পদ্ধতিতে রং করিয়া ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিলে অ্যামিবার দেহকোষের অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে ইতস্ততঃ কতকগুলি ব্যাগের মত বা নলাকার বস্তু বা কণিকা দেখা যায়। এই সকল কণিকা বা বস্তুকে **গলজি বস্তু** বলে। ইহা দেহকোষের নিঃসরণ ও রেচনে সাহায্য করে।

(vii) লাইসোজোম (Lysosome):—বিশেষ উপায়ে রং করিয়া ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিলে দেহকোষের অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে কতকগুলি

গোলাকার পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত বস্তু দেখা যায়। ইহাকে **লাইসোজোম** বলে।

(iv) কেলাস (**Crystals**) ঃ—অন্তঃপ্লাজমে সঞ্চিত খাদ্যের চতুর্দিকে প্লেটের মতো বা দ্বিপিরামিড আকারের অসংখ্য কেলাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা লম্বায় $8{\cdot}2\mu$ পর্যন্ত হইতে পারে। শারীরবৃত্তীয় কাজের ফলে এই কেলাসগুলি অ্যামিবার দেহে বর্জ্যপদার্থ হিসাবে সঞ্চিত হয়।

গমন (Locomotion) ঃ—

যে প্রক্রিয়ায় জীবদেহ নিজের **চেষ্টায়** একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে তাহাকে **গমন** বলে। প্রতিকূল পরিবেশ ও শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য, খাদ্যসংগ্রহ করিবার জন্য ও জনন ইত্যাদির জন্য জীব স্থানান্তরে গমন করে।

অ্যামিবা দেহ পরিধি হইতে সৃষ্ট **ক্ষণপদ** দ্বারা গমন করিয়া থাকে।

ক্ষণপদ (Pseudopodia) ঃ—**Pseudopodia (GK—Pseudos-False) (Podium—Foot)** কথার অর্থ ক্ষণপদ। গমনের সময় গতিপথের দিকে অ্যামিবা একাধিক আঙ্গুলের মতো ক্ষণপদ বা স্যুডোপোডিয়া সৃষ্টি করে। অ্যামিবার ক্ষণপদ আঙ্গুলের মতো, মোটা, অগ্রভাগ ভোঁতা বলিয়া, ইহাকে লোবোপোডিয়া (**Lobopodia**) বলে। দেহকোষের পরিধি হইতে প্লাজমাপর্দা ও বহিঃপ্লাজম লম্বা আঙ্গুলের মতো অংশে প্রসারিত হয় এবং ইহার মধ্যে সামান্য অন্তঃপ্লাজম প্রবেশ করিয়া লোবোপোড়িয়া সৃষ্টি করে। লোবোপোডিয়া গঠন অনুসারে দুই প্রকার।

(i) প্রোফ্লুয়েন্ট টাইপ (**Profluent type**) ঃ— এই প্রকার চলনে লোবোপোডিয়ায় বহিঃপ্লাজম স্ফীত হয় এবং ক্রমে ক্রমে বড় হইতে থাকে এবং ইহার মধ্যে অন্তঃপ্লাজম প্রবেশ করিয়া লোবোপোডিয়া তৈয়ারী করে। প্রোফ্লুয়েন্ট লোবোপোডিয়ামকে আবার দুই প্রকারে ভাগ করা যাইতে পারে।

(a) লোবস (**Lobose**) বা মালটিপোডাল (**Multipodal**) এই পদ্ধতিতে অনেকগুলি লোবোপোডিয়া একসঙ্গে তৈয়ারী হয়।

(b) লিমেক্স (**Limax**) বা মনোপোডাল (**Monopodal**) এই পদ্ধতিতে একটি মাত্র বড় লোবোপোডিয়া তৈয়ারী হয়।

(ii) **ইরাপটিভ টাইপ (Eruptive type)** ঃ—

দেহকোষের বহির্ভাগ বা উপরের স্তরে কোন একটি স্থান ফাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া যায় এবং ঐ অংশ হইতে বহিঃপ্লাজম ও অন্তঃপ্লাজম বাহির হইয়া আসে এবং ক্ষণপদ তৈয়ারী করে। এই সময় একটি স্থানে একটি মাত্র ছোট ক্ষণপদ তৈয়ারী হয়।

অ্যামিবার গমন পদ্ধতি ঃ

অ্যামিবয়েড চলন (Amoeboid movement) :—ক্ষণপদ দ্বারা গমন করিবার পদ্ধতিকে **অ্যামিবয়েড চলন** বলে। অ্যামিবা এই পদ্ধতিতে গমন করে। অ্যামিবা ব্যতীত স্পঞ্জের (Sponge) অ্যামিবোসাইট ও লিউকোসাইট কোষ এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্বেতরক্তকণিকায় ও মিক্সোমাইসিটিস জাতীয় উদ্ভিদে এইরূপ অ্যামিবয়েড চলন দেখিতে পাওয়া যায়। **Berthhold** (1886) প্রথম অ্যামিবয়েড চলনের ব্যাখ্যা করেন। অ্যামিবয়েড চলনের সময় দেহকোষ হইতে সৃষ্ট ক্ষণপদের মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম ক্ষণপদের মুক্ত অগ্রভাগ হইতে একপ্রকার আঠালো রস নিঃসৃত হয় এবং উহার সাহায্যে মাটি বা জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি কঠিন বস্তুর উপর আটকাইয়া যায় এবং তখন



চিত্র-5 অ্যামিবার গমন পদ্ধতি

ক্ষণপদ বা লোবোপোডিয়ামের ভিতর সাইটোপ্লাজম প্রবেশ করে। ফলে অ্যামিবা দেহের গতিপথের দিকে অগ্রসর হয়। এইভাবে পরবর্তী লম্বা ক্ষণপদ দেহকে নির্দিষ্ট গতিপথের দিকে অগ্রসর করে এবং অ্যামিবা অগ্রসর হয়। অ্যামিবা মন্থরগতি প্রাণী। ইহা ঘণ্টায় 1 মিলিমিটার হইতে 3 মিলিমিটার পর্যন্ত যাইতে পারে। অ্যামিবার গমনের দ্রুতি পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। 0° হইতে 30° সেন্টিগ্রেড এর উপর উষ্ণতায় ইহার দ্রুতি কমিতে থাকে এবং 33° সেন্টিগ্রেডে ইহার চলন প্রায় নিশ্চল হইয়া যায়।

অ্যামিবয়েড চলনের তত্ত্ব—অ্যামিবা কিভাবে গমন করে অর্থাৎ কি ভাবে ক্ষণপদ গঠনের সময় সাইটোপ্লাজমের প্রবাহ সাহায্য করে তাহা এখনও পর্যন্ত সঠিক ভাবে জানা যায় নাই। বহুবছর গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা অ্যামিবয়েড চলনের বা ক্ষণপদ সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেকগুলি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। নীচে সংক্ষিপ্তভাবে এই তত্ত্বগুলি আলোচনা করা হইল।

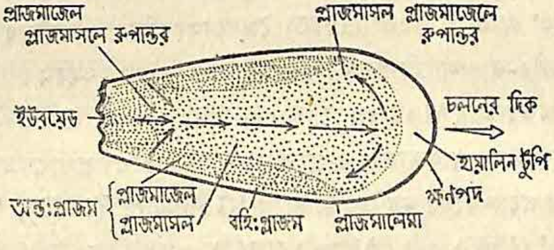
(1) **কন্‌ট্রাকশন্ তত্ত্ব (Contraction Theory)**—'Dellinger' (1906) অ্যামিবা প্রোটিয়াসের চলনের উপর গবেষণা করেন এবং কনট্রাকশন তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার মতে অন্তঃপ্লাজম-এর মধ্যে উপস্থিত একপ্রকার সঙ্কোচনশীল বস্তু প্রধানতঃ ক্ষণপদ গঠনের জন্য দায়ী। তাঁহার তত্ত্ব অনুসারে নূতন সৃষ্ট ক্ষণপদ তাহার অগ্রভাগ দিয়া কঠিন বস্তু আঁকড়াইয়া ধরে এবং তারপর দেহকোষটি সংকুচিত হয়, তাহার ফলে অ্যামিবা সামনের দিকে অগ্রসর হয়। অতএব অ্যামিবা ক্ষণপদের অগ্রভাগ দিয়া চলাচল করে।

(2) **ঘূর্ণন তত্ত্ব (Rolling movement theory)**—'Jennings' (1904) অ্যামিবা ভেরুকোসার উপর এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। অ্যামিবা ভেরুকোসার দেহকোষের চারিদিকে প্রোটোপ্লাজমের পরিবর্তন হয়। সাইটোপ্লাজম প্রথমে অংকীয়ভাগে সামনে হইতে পশ্চাতে এবং পরে উপরে উঠিয়া পিছন হইতে সামনের দিকে যায়। এর ফলে চাকার মতো সাইটোপ্লাজমের দিকের পরিবর্তনের সংগে অ্যামিবা সামনের দিকে অগ্রসর হয়, অনেকটা একটি জলভরা বেলুন মাটিতে গড়ানোর মতো। ইহাকে রোলিং তত্ত্ব বা চলনের '**ঘূর্ণন তত্ত্ব**' বলা হয়।

(3) **সারফেস্ টেনশান্ তত্ত্ব (Surface tension theory)**—'Berthold' (1886) দীর্ঘকাল গবেষণার পর তিনি এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং পরবর্তীকালে 'Bütschli' (1894) এবং 'Rhumbler' (1898) এই তত্ত্বকে সমর্থন করেন। তাঁহাদের মতবাদ অনুসারে পৃষ্ঠটানের ফলে ক্ষণপদ সৃষ্টি হয়। দেহকোষের কোন অংশ হইতে ক্ষণপদ সৃষ্টি হইবার সময় ঐ স্থানের সাইটোপ্লাজমের পৃষ্ঠটান হ্রাস পায়। পৃষ্ঠটানের হ্রাস পাওয়ার কারণ অংশতঃ অভ্যন্তরীণ। এই চাপ হ্রাস পাওয়ার ফলে সাইটোপ্লাজম উহার ভিতরের চাপে ঐ অংশে প্রসারিত হয়, ফলে ক্ষণপদের সৃষ্টি হয়। ক্ষণপদ দ্বারা দেহকোষ কোন বস্তুকে আঁকড়াইয়া ধরে এবং প্লাজমাপর্দায়

পৃষ্ঠটান বৃদ্ধি করে এবং দেহকোষের পিছনের অংশ সঙ্কুচিত করে। ফলে অ্যামিবা সামনের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু বর্তমানে এই তত্ত্বটি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(4) **সল-জেল তত্ত্ব (Sol-Jel theory)**—এই তত্ত্বকে **সান্দ্রতার পরিবর্তন** তত্ত্ব বলা হয়। 'Rhumbler (1910) পৃষ্ঠটান (Surface tension) তত্ত্বের অসুবিধা ও ভুল বুঝিতে পারেন এবং সল-জেল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। তিনি



চিত্র-6 সল-জেল মতবাদ

বলেন সাইটোপ্লাজমের চলনের ফলে সদানিয়ত বহিঃপ্লাজম অন্তঃপ্লাজমে এবং অন্তঃপ্লাজম বহিঃপ্লাজমে পরিণত হয় এবং ক্ষণপদ সৃষ্টি করে। এই তত্ত্বকে 'Hyman' (1917) আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং 'Pantin' **(1923),** এই তত্ত্বকে সমর্থন করেন। তিনি একটি সামুদ্রিক লিমেক্স অ্যামিবা **(Limax amoeba)** লইয়া গবেষণা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে দেহকোষের যে অংশ হইতে ক্ষণপদ সৃষ্টি হয় সেই স্থান হইতে অ্যাসিড নিঃসৃত হয় এবং জল শোষিত হয়। ইহার ফলে সেই স্থানের সাইটোপ্লাজম স্ফীত হয় এবং ক্ষণপদ সৃষ্টি করে। 'Mast' (1923) এই তত্ত্বকে সমর্থন করেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ অ্যামিবা প্রোটিয়াসের উপর গবেষণা করেন এবং এই তত্ত্বের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার মতানুসারে—অ্যামিবার চলন নিম্নলিখিত চারটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি দ্বারা সম্পন্ন হয়।

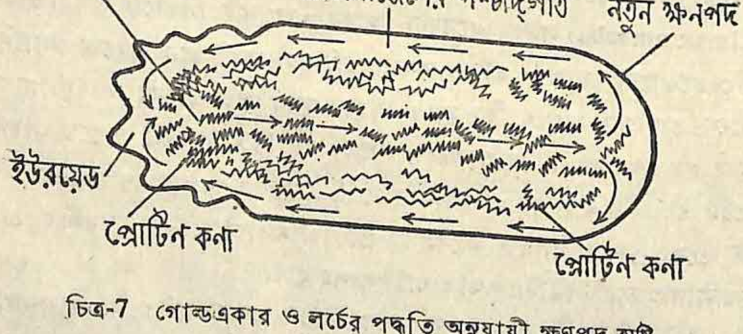
(i) বাহিরে স্থিতিস্থাপক বা সঙ্কোচনশীল কোষপ্রাচীর বা প্লাজমাপর্দা কঠিন বস্তুর সহিত আটকাইয়া যায়।

(ii) মধ্যস্থানের প্লাজমাসল্ পৃষ্ঠটানের ফলে প্লাজমাজেলকে ভেদ করিয়া বিপরীত দিকে চলিয়া যায় এবং প্লাজমাজেলে পরিণত হয় এবং ক্ষণপদের সূচনা করে।

(iii) একই সময়ে দেহের বিপরীতদিকে একই হারে প্লাজমাজেল প্লাজমাসলে পরিবর্তিত হয়। ফলে প্লাজমাজেল নলের আকারে গতিপথের দিকে অগ্রসর হয়। ইহার পর প্লাজমাসল নলের মধ্যে পিছন দিক হইতে সামনের দিকে অবিরামভাবে প্রবাহিত হইয়া গতিপথের দিকে অগ্রসর হয়।

(iv) নল আকার প্লাজমাজেল সংকুচিত হয় এবং দেহকোষকে সামনের দিকে অগ্রসর করে।

(5) **গোল্ডএকার এবং লর্চের তত্ত্ব (Goldacre and Lorch—1950)—** 'Goldacre' and 'Lorch' (1950) জৈবরাসায়নিক গবেষণার দ্বারা মাস্ট্‌ এবং পানটিনের অ্যামিবয়েড চলনের সংশোধন করেন। এই তত্ত্বকে **আধুনিক মতবাদ (Modern theory)** বলা হয়। 'Goldacre' এবং 'Lorch' বলেন যে প্লাজমাসল ও প্লাজমাজেলের পরস্পর রূপান্তরজনিত চাপ ক্ষণপদ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়। এবিষয়ে 'Goldacre' (1952), 'Auen' ও 'Roslanky' (1958) এবং 'Alten,' (1962) প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ অ্যামিবয়েড চলনের ব্যাখ্যা করিতে প্রোটোপ্লাজমের গঠনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বিজ্ঞানীরা অ্যামিবার সাইটোপ্লাজমে একপ্রকার **ATP** কাতর প্রোটিনের অ্যাকটোমায়োসিন জাতীয়ের **(actomyosin like)** অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন। এই প্রোটিন বহুকোষী জীবের পেশী সঙ্কোচনের



চিত্র-7 গোল্ডএকার ও লর্চের পদ্ধতি অনুযায়ী ক্ষণপদ সৃষ্টি

কারণ। ইহাদের মতে প্রোটোপ্লাজমের **'সল' (Sol)** দশা নির্ভর করে প্রোটিন অণুর ভাঁজ হইয়া গুটাইয়া যাইবার উপরে। প্রোটিন অণুগুলির শিকল খুলিয়া নিজেদের মেলিয়া ধরিয়া দৃঢ় কোলয়েড গঠনের সঙ্গে সঙ্গে 'জেল, **(Jel)** দশায় ফিরিয়া আসে। গমনের সময়ে অ্যামিবার পিছনের

অংশে অবস্থিত অণুগুলি ভাঁজ হয় এবং সেখানে অপেক্ষাকৃত ঘন প্লাজমাজেল অধিকতর তরল প্লাজমাসলে পরিবর্তিত হয়। এই প্লাজমাসল সামনের দিকে গড়াইয়া যায়। ক্রমশঃ বর্ধিত ক্ষণপদটির অগ্রভাগে প্রোটিন অণুগুলির শিকল খুলিয়া যাইবার ফলে প্লাজমাসল ঘন ও দৃঢ় প্লাজমাজেল-এ রূপান্তরিত হয়। যাহা হউক A T P-র রাসায়নিক পরিবর্তনজনিত উদ্ভূত শক্তি ক্ষণপদ সৃষ্টির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। এই মতবাদ **'Barrington' (1967)** দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

পুষ্টি (Nutrition) ঃ—

যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, পরিপাকীয় খাদ্যবস্তু বা পাচিত খাদ্যবস্তু শোষণ এবং অপাচ্য খাদ্যবস্তু বহিষ্কৃত হয় তাহাকে পুষ্টি বা নিউট্রিশান বলে।

অ্যামিবা হোলোজয়িক পদ্ধতিতে পুষ্টিসাধন করে। এই প্রক্রিয়ায় উচ্চতর প্রাণীর মতো অ্যামিবা জটিল কঠিন জৈব খাদ্যবস্তু গ্রহণ ও পরিপাক করে।

খাদ্য (Food)—অ্যামিবা প্রধানতঃ আণুবীক্ষণিক জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীকে খাদ্যহিসাবে গ্রহণ করে। নানা রকম ব্যাকটিরিয়া, ডায়াটম, ছোট শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ, কিলোমোনাস, কলপিডিয়াম, প্যারমিসিয়াম ইত্যাদি এককোষী প্রাণী, ছোট ছোট কৃমিজাতীয় প্রাণী, মৃত জৈব বস্তু এবং রটিফার নামক ছোট বহুকোষী প্রাণী অ্যামিবার প্রধান খাদ্য।

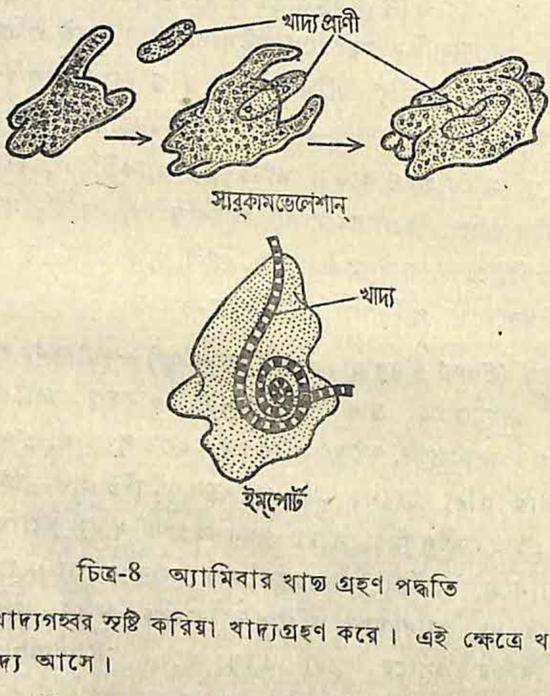
খাদ্যগ্রহণ (Food Capture and Ingestion)—অ্যামিবা সর্বভুক প্রাণী, অ্যামিবার দেহকোষে ঘ্রাণ আস্বাদনের কোনরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই কিন্তু ইহা জৈবখাদ্যবস্তুকে, অজৈব বালিকণা হইতে পৃথক করিতে পারে।

অ্যামিবার খাদ্য গ্রহণের জন্য কোনরূপ নির্দিষ্ট অঙ্গ নাই। অ্যামিবা দেহের যে কোন অংশ দিয়া খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্য অ্যামিবার দেহের সংস্পর্শে আসিলে, অ্যামিবা খাদ্যগ্রহণ করে। ক্ষণপদ অ্যামিবার শুধু চলনে সাহায্য করে না, খাদ্যগ্রহণ করিতেও প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করে। অ্যামিবা বিভিন্ন উপায়ে খাদ্য গ্রহণ করে। **'Rhumbler' (1910)** এর মতানুসারে, নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে অ্যামিবা খাদ্যগ্রহণ করে।

(I) সারকামভ্যালেশান (Circumvallation)ঃ—এই পদ্ধতিতে সক্রিয় খাদ্যবস্তু অ্যামিবা গ্রহণ করে। যখন খাদ্যবস্তুটি অ্যামিবার নিকটবর্তী হয়, তখন অ্যামিবার দেহের পরিধি হইতে ক্ষণপদ খাদ্যের দিকে অভিক্ষিপ্ত হয় এবং স্পর্শ না করিয়া খাদ্যবস্তুকে আবৃত করে। অবশেষে

ক্ষণপদের মুক্ত প্রান্তগুলি জুড়িয়া যায় এবং এইভাবে একটি অসঙ্কোচনশীল খাদ্যগহ্বর তৈরী হয়, খাদ্যগহ্বর-এর মধ্যে কয়েকফোঁটা জল পরিবেষ্টিত খাদ্য থাকে এবং খাদ্য সাইটোপ্লাজম দ্বারা বেষ্টিত থাকে। অ্যামিবা কি ভাবে খাদ্য নির্বাচন করিয়া তাহার দিকে ক্ষণপদকে অগ্রসর করে সেই সম্পর্কে কোন সঠিক তত্ত্ব জানা যায় নাই।

(2) **সারকামফ্লুয়েনস (Circumfluence)** ঃ— এই পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত সক্রিয় বা নিশ্চল খাদ্যবস্তু অ্যামিবা গ্রহণ করে। অ্যামিবা খাদ্য সংলগ্ন হওয়া মাত্রই, খাদ্যের চারিদিকে ক্ষণপদ বিস্তার করিয়া খাদ্যকে ঘিরিয়া ফেলে এবং অবশেষে পূর্বের ন্যায় একটি খাদ্যগহ্বর

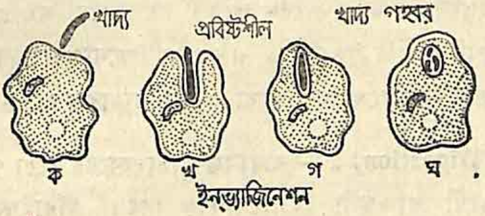


চিত্র-8 অ্যামিবার খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি

সৃষ্টি করিয়া খাদ্যগহ্বর সৃষ্টি করিয়া খাদ্যগ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে খাদ্যগহ্বরের সংস্পর্শে খাদ্য আসে।

(3) **ইনভ্যাজিনেশান (Invagination)** ঃ—এই পদ্ধতিতে জীবন্ত খাদ্য অ্যামিবার সংস্পর্শে আসিলে, ক্ষণপদ হইতে নিঃসৃত একপ্রকার বিষাক্ত রসদ্বারা খাদ্যবস্তু মারা যায় এবং অ্যামিবার দেহের সহিত আটকাইয়া যায়। খাদ্যের সংস্পর্শে আসামাত্র, খাদ্যসংলগ্ন বহিঃপ্লাজম নলের আকারে অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে প্রবেশ করে। অবশেষে প্লাজমালেমা বা প্লাজমা পর্দা অদৃশ্য হয়

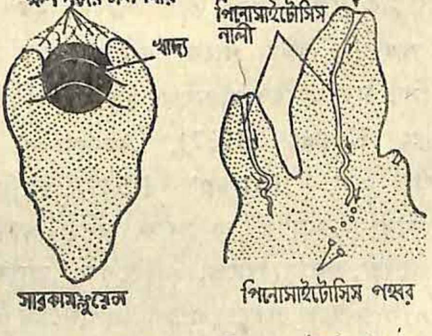
এবং অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে খাদ্যগহ্বর সৃষ্টি হয়।



চিত্র-9 অ্যামিবার ইনভ্যাজিনেশন পদ্ধতিতে খাদ্য গ্রহণ

(4) **ইমপোরট (Import)** ঃ—এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ অ্যামিবা ফিতাকৃতি শেওলা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। খাদ্যবস্তু অ্যামিবার দেহের সংস্পর্শে আসিলে অ্যামিবা খুব অল্প দেহ আন্দোলিত করিয়া খাদ্য বস্তুকে অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে প্রবেশ করায়, এই পদ্ধতিতে ক্ষণপদের কোনরূপ প্রয়োজন হয় না।

(5) **পিনোসাইটোসিস (Pinocytosis)** ঃ এই পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কার করেন Lewis (1931)। যে পদ্ধতিতে তরল খাদ্য দেহকোষের বহির্ভাগ দ্বারা অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে গৃহীত হয় তাহাকে **পিনোসাইটোসিস (Pinocytosis)** বলে। ইহাকে **সেল ড্রিংকিং (Cell Drinking)** পদ্ধতিও বলে। এই পদ্ধতিতে অ্যামিবা প্রোটিয়াস খাদ্য গ্রহণ করে। 'Mast' ও 'Doyle' (1934) এর মতানুসারে পিনোসাইটিসিস ব্যাপন-এর ন্যায় দেহের সমগ্র বহির্ভাগ দিয়া খাদ্য শোষণ করে না। পিনোসাইটোসিস অ্যামিবাকে উচ্চ আণবিক গুণ সম্পন্ন খাদ্য গ্রহণ করিতে সাহায্য করে। প্লাজমাপর্দা উচ্চ আণবিক



চিত্র-10 অ্যামিবার সারকামফ্লুয়েন্স ও পিনোসাইটোসিস পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহণ

গুণসম্পন্ন। খাদ্যবস্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া পিনোসাইটিক নালিকা গঠন করে এবং অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে প্রবেশ করে। অবশেষে অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে এই নালিকা ফাটিয়া পিনোসাইটিক গহ্বর বা পিনোগহ্বর *(Pinosomes)* গঠন করে। এই পিনোসোমের মধ্যে গৃহীত খাদ্যবস্তু থাকে।

পরিপাক *(Digestion)* ঃ— খাদ্যবস্তু খাদ্যগহ্বরের মধ্যে পরিপাক হয়। খাদ্যগহ্বর অস্থায়ী পাকস্থলী হিসাবে কাজ করে। খাদ্যগহ্বর প্লাজমাপর্দা এবং বহিঃপ্লাজম দ্বারা আবৃত থাকে। কিন্তু যখন খাদ্যগহ্বর লুপ্ত হইয়া যায় তখন বহিঃপ্লাজম, অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে মিশিয়া যায়। অ্যামিবা প্রোটিয়াসের দেহকোষের মধ্যে অনেকগুলি খাদ্যগহ্বর থাকে। খাদ্যগহ্বরগুলি প্লাজমাসল্-এর মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করে। গহ্বরগুলির আকার ও আয়তন খাদ্যআকৃতি ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

সাইটোপ্লাজম হইতে নিঃসৃত কতকগুলি জারকরস দ্বারা খাদ্যগহ্বরের কঠিন খাদ্যবস্তু তরলে পরিণত হয়। লাইসোজেম জারক রস ধারণ করে এবং খাদ্যগহ্বরের সহিত মিশিয়া যায়।

খাদ্যগহ্বরের মধ্যে তরল প্রথমে আম্লিক হয় এবং জীবন্ত খাদ্যবস্তু গহ্বরের মধ্যে মারা যায়। পরে খাদ্যগহ্বরের মধ্যে তরল ক্ষারীয় হয় এবং তখন খাদ্যবস্তুর পরিপাক আরম্ভ হয়। সাইটোপ্লাজম কর্তৃক একরকম খনিজ অ্যাসিড (সম্ভবতঃ HCl) নিঃসৃত হওয়ায়, খাদ্যগহ্বরের তরল অম্লধর্মী হয়। কিন্তু 'Mast' *(1942)* এর মতানুসারে, খাদ্যগহ্বরের তরলের অম্লতা বৃদ্ধি সাইটোপ্লাজমের নিঃসরণের ফলে হয় না। সম্ভবতঃ জীবন্ত খাদ্যের শ্বসনে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি এবং জীবন্ত খাদ্যের মৃত্যু ও পচন ইত্যাদি রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে গহ্বরের তরল অম্লধর্মী হয়। জীবন্ত খাদ্যের মৃত্যু অক্সিজেনের অভাবেও ঘটিয়া থাকে, সাইটোপ্লাজম নিঃসৃত কোনরূপ জারকরস বা অ্যাসিড দ্বারা জীবিত খাদ্যবস্তুর মৃত্যু হয় না।

'Holter' এবং **'Kopac'** *(1937)*, **'Andersen'** এবং **'Hatler'** *(1949)* **'Holter'** এবং **'Lvtrap'** *(1949)* অ্যামিবা প্রোটিয়াসের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কয়েকটি পরিপাক রস আবিষ্কার করেন। পেপটিডেজ, প্রোটিনেজ, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, অ্যামাইলেজ, শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক করিতে সাহায্য করে। পেপ্‌টিডেজ এবং প্রোটিনেজ, প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকে দ্রবনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডে *(Amino acid)*

পরিণত করিতে সাহায্য করে। অ্যামিবা চিনিজাতীয় শর্করা এবং সেলুলোজজাতীয় জটিলশর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক করিতে পারে। অ্যামিবার **অন্তঃকোষীয় পরিপাক** হয়।

শোষন *(Assimilation)* :—ব্যাপন পদ্ধতিতে পাচিত খাদ্য অ্যামিবার সাইটোপ্লাজমের মধ্যে শোষিত হয়। অ্যামিবার দেহে কোনরূপ সংবহনতন্ত্র নাই কারণ খাদ্যগহ্বর সর্বদা আবর্ত পদ্ধতিতে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে চলাচল করে এবং দেহকোষের বিভিন্ন অংশে সরাসরি পাচিত খাদ্য সরবরাহ করে। শোষিত খাদ্য নূতন প্রোটোপ্লাজম সৃষ্টি করে।

বহিষ্করণ *(Egestion)* :—পরিপাক ও শোষণের পর অপাচ্য খাদ্যবস্তু ক্রমে দেহকোষের পিছনের দিকে চলিয়া যায় এবং অ্যামিবা যখন চলিতে শুরু করে তখন অপাচ্য খাদ্যবস্তু দেহকোষের পিছনের দিক দিয়া বাহির হইয়া যায়। অ্যামিবার দেহে অপাচ্য খাদ্যবস্তু বাহির হইবার জন্য কোনরূপ নির্দিষ্ট ছিদ্র নাই। অপাচ্য খাদ্য বহিষ্কারের সময় দেহকোষের যে কোন স্থানে অনির্দিষ্ট ছিদ্র তৈয়ারী হয়।

শ্বসন (Respiration) :—

স্বাধীনজীবী অ্যামিবার কোনরূপ শ্বসন যন্ত্র নাই। ইহা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় জল হইতে দ্রবীভূত অক্সিজেন সংগ্রহ করে এবং কার্বন-ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে। ব্যাপনের ফলে প্লাজমাপর্দার মধ্য দিয়া অক্সিজেন সাইটোপ্লাজমের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাহির হইয়া যায়। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘনত্বের পরিমাণ অ্যামিবার সাইটোপ্লাজম অপেক্ষা বেশী হওয়ায় অক্সিজেন সর্বদা সাইটোপ্লাজমের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দহনের ফলে অ্যামিবার সাইটোপ্লাজমে উদ্ভূত কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমাণ পারিপার্শ্বিক জল অপেক্ষা বেশী হইয়া যায়। তাহার ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্লাজমাপর্দার মাধ্যমে দেহ হইতে বাহির হইয়া আসে। বিপাকীয় প্রক্রিয়ার সময়, খাদ্যবস্তু শ্বসনের ফলে গৃহীত অক্সিজেনের সাহায্যে দাহিত হয়। শ্বসনের ফলে জল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া তৈরী হয় ও প্রয়োজনীয় শক্তি উদ্ভূত হয় এবং উহা **A T P** অণুতে সঞ্চিত থাকে এবং জৈবিক কার্যে ব্যবহৃত হয়। **'Clark'** (1942) এর মতানুসারে স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যামিবা প্রতি ঘণ্টায় $1{\cdot}4 \times 10^{-৪}$ সি সি অক্সিজেন গ্রহণ করে।

রেচন (Excretion) ঃ

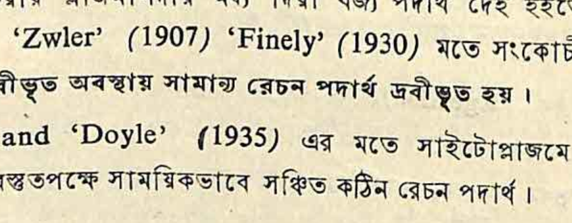
যে পদ্ধতিতে বিপাকীয় প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থগুলি দেহ হইতে বাহির হইয়া যায় তাহাকে রেঁচন বলে।

বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে অ্যামিবার দেহে সম্ভবতঃ জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেনজাতীয় বর্জ্য পদার্থ যেমন, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। অ্যামিবার দেহে কোনরূপ রেচন যন্ত্র নাই। ব্যাপন প্রক্রিয়ার প্লাজমাপর্দার মধ্য দিয়া বর্জ্য পদার্থ দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। 'Zwler' (1907) 'Finely' (1930) মতে সংকোচী গহ্বর-এর তরলে **দ্রবীভূত অবস্থায় সামান্য রেচন পদার্থ দ্রবীভূত হয়।**

'Mast' and 'Doyle' (1935) এর মতে সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত কেলাসগুলি বস্তুতপক্ষে সাময়িকভাবে সঞ্চিত কঠিন রেচন পদার্থ।

জলসাম্য (Osmo-regulation) ঃ

আস্রাবণ প্রক্রিয়ায় প্লাজমাপর্দার মধ্য দিয়া খাদ্যগ্রহণের সময় ও অন্য সময় জল প্রবেশ করে। বিপাকীয় প্রক্রিয়ার ফলে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কিছু জল উৎপন্ন হয়। ইহার ফলে অ্যামিবার দেহ ফুলিয়া যায় এবং



চিত্র-11 অ্যামিবার রেচনপদার্থের নিষ্কাশন ও জলসাম্য নিয়ন্ত্রণ

অবশেষে ফাটিয়া মারা যাইতে পারে। সুতরাং এই জল বিতাড়িত করা একান্ত প্রয়োজন। সংকোচী গহ্বর এই অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জল সংগ্রহ করে এবং দেহ হইতে বিতাড়িত করে।

আধুনিক মতবাদ অনুসারে সংকোচী গহ্বর প্রথমে একটি ছোট গহ্বরের আকারে আবির্ভূত হয়, ইহার পর সংকোচী গহ্বর পর্যায়ক্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হইয়া জল সংগ্রহ করে এবং উহার মধ্যস্থ তরল দেহের বাহিরে

নির্গত করিয়া দেয়। এই মতবাদ অনুসারে, সংকোচী গহ্বর পরিশেষে দেহের পরিধির নিকট আসে এবং হঠাৎ ফাটিয়া যায়। সংকোচী গহ্বরের সঞ্চিত তরল পদার্থ অস্থায়ী ছিদ্র দিয়া দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। ইহার পর পুরাতন গহ্বর অদৃশ্য হইয়া যায় ও একটি নূতন গহ্বর সৃষ্টি হয় ও উহা পূর্বের মত দেহ হইতে জল বিতাড়িত করে। এই প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে চলিতে থাকে। একটি সংকোচী গহ্বর 30-50 মাইক্রা পর্য্যন্ত হইতে পারে। **'Schneider'** (1966) মতানুসারে সংকোচীগহ্বরের প্রাচীরে সংকোচীতন্তু থাকে, যাহার ফলে গহ্বর সংকুচিত হয়। সংকোচী গহ্বরের সঙ্কোচনের হার অ্যামিবার শারীরবৃত্তিয় অবস্থা, দেহে উপস্থিত খাদ্যের পরিমাণ, পারিপার্শ্বিক জলে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ এবং উষ্ণতা ইত্যাদির সহিত সমানুপাতিক।

উত্তেজিতা (Irritability or Sensitivity) ঃ

অ্যামিবা সকল সময় চলন, ক্ষণপদ গঠন, খাদ্যগ্রহণ পরিবর্তন করে। এই পরিবর্তন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিক্রিয়ার জন্য হয়। অ্যামিবার এই গুণকে **উত্তেজিতা** বলে।

অ্যামিবার কোনরূপ স্নায়ুতন্ত্র বা বিশেষ কোন স্নায়ুযন্ত্র নাই। কিন্তু ইহা খুব অনুভূতিশীল। অ্যামিবা অনুভূতির দ্বারা খাদ্যবস্তুকে বালিকণা বা কঠিন বস্তু হইতে পৃথক করিতে পারে। যদি ভাসমান অ্যামিবার ক্ষণপদে কোন কঠিন বস্তু দিয়া স্পর্শ করা যায়, অ্যামিবা তখন ঐ দিকে ক্ষণপদ গুটাইয়া লয় এবং অন্যদিকে ক্ষণপদ বিস্তার করিয়া ক্রমে কঠিন বস্তু হইতে দূরে সরিয়া যায়। ঠিক সেইরূপ অ্যামিবার গতিপথে যদি কোন জোরালো ক্ষারকীয়, আম্লিক বা শর্করা দ্রবণ রাখা যায়, অ্যামিবা উহা হইতে দূরে চলিয়া যায়। কিন্তু খাদ্যবস্তুর দেহ হইতে নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে অ্যামিবা খাদ্যের দিকে ক্ষণপদ বিস্তার করে।

উদ্দীপকের প্রতি ব্যাবহারিক প্রতিক্রিয়া ঃ

বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপকে অ্যামিবার সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

(i) স্পর্শঃ—অ্যামিবাকে কোন সরু সূচ বা দণ্ডের সাহায্যে স্পর্শ করিলে, ইহা সেই সময়েই স্থান ত্যাগ করে, অথচ ভাসমান কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে ইহা সেই বস্তুর অভিমুখী হয়, ক্ষুধায় ক্ষণপদগুলির সক্রিয়তায় ইহা দেহ সংকুচিত করে।

(ii) **আলোক ঃ**—কোন চলন্ত অ্যামিবার উপর তীব্র আলোকরশ্মি পতিত হইলে ইহা গতিমুখ পরিবর্তন করিয়া ভিন্ন মুখে চলিয়া যায় অথচ অল্প আলোর অভিমুখে ইহা ধাবিত হয়।

(iii) **রাসায়নিক পদার্থ ঃ** অ্যামিবা কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ হইতে দূরে সরিয়া যায়, যেমন—লবণ (**Sodium Choloride**), অ্যাসেটিক অ্যাসিড প্রভৃতি।

(iv) **তাপমাত্রা ঃ** তাপমাত্রার পরিবর্তনে অ্যামিবার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অ্যামিবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় হিমাঙ্ক 0°—30° **C** তাপমাত্রায়, 40° **C** তাপমাত্রায় অ্যামিবার সাইটোপ্লাজম জমিয়া যায় এবং অ্যামিবার মৃত্যু ঘটে।

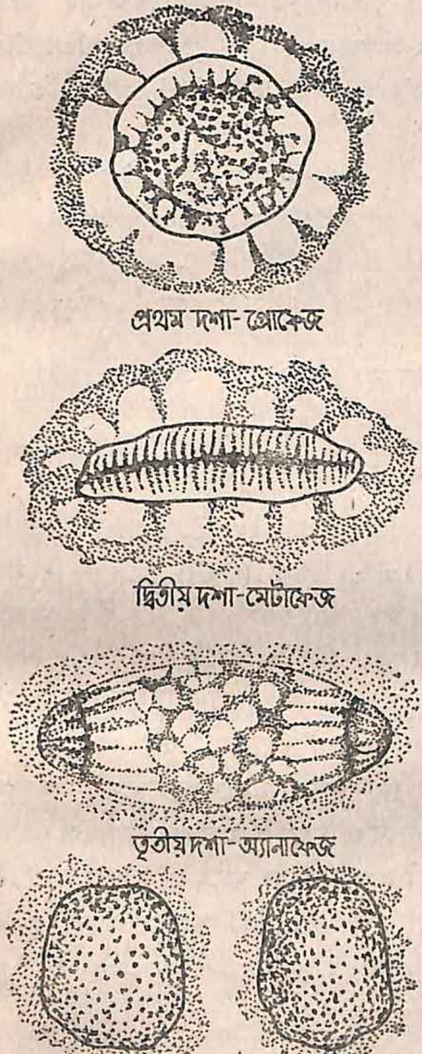
(v) **বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা ঃ**—অ্যামিবা বৈদ্যুতিক উদ্দীপক হইতে স্থান ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যায়।

জনন (Reproduction) ঃ

অ্যামিবা প্রোটিয়াস বিভিন্ন প্রকার অযৌন জনন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করে। যেমন দ্বিবিভাজন (**Binary fission**), বহুবিভাজন (**Multiple fission**), কোরকোদগম (**Budding**), স্পোরুলেশান (**Spprulation**), ইত্যাদি।

(1) **দ্বি-বিভাজন (Binarry fission) ঃ** অ্যামিবা সাধারণতঃ দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় জনন কার্য্য সম্পাদন করে। অযৌন জননে একটি অ্যামিবা হইতে দুইটি অপত্য অ্যামিবা সৃষ্টি হয়। অ্যামিবার নিউক্লিয়াস মাইটোসিস পদ্ধতিতে দুইটি সমান অংশে বিভক্ত হয় এবং ইহার সাইটোপ্লাজমের মধ্যে খাঁজ সৃষ্টি হয়। অনুকূল অবস্থায় অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য ও উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় দ্বি-বিভাজন ঘটিয়া থাকে। এই সময় দেহকোষটি আকারে সবথেকে বড় হয় এবং সাইটোপ্লাজমের মাঝ বরাবর একটি খাঁজ সৃষ্টি হয় ও অবশেষে দুইটি সমান অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। **'Liesihe'** এর মতে অ্যামিবা প্রোটিয়াসের নিউক্লিয়াসে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। উহার সংখ্যা 500-600। **'Chalkley'** এবং **'Daniel'** এর মতানুসারে দ্বি-বিভাজনের সহিত অ্যামিবার বহিরাকৃতির নির্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। প্রফেজ দশায় অ্যামিবা

গোলাকার হইয়া যায় এবং অনেকগুলি ছোট ছোট ক্ষণপদের সৃষ্টি করে। প্রতিফলিত আলোকে দেখিলে, অ্যামিবার দেহকোষের কেন্দ্রে একটি স্বচ্ছ অঞ্চল দেখা যায়, মেটাফেজ দশায় এই স্বচ্ছ অঞ্চল অদৃশ্য হইয়া যায়। মেটাফেজের শেষের দিকে ক্ষণপদ স্থূল হইতে থাকে। টেলোফেজে ইহার দেহ লম্বাটে আকার ধারণ করে ও দেহের মাঝখানে একটি খাঁজ সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ ক্ষণপদ আরও মোটা হয় এবং পূর্বের আকারে ফিরিয়া যায়। অবশেষে অ্যামিবার দেহ প্রায় দুইটি সমান অংশে বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেকটিতে নিউক্লিয়াস থাকে। দ্বিভাজন পদ্ধতিতে সৃষ্ট অপত্য অ্যামিবা খাদ্য গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বড় হইতে থাকে এবং পূর্ণাঙ্গ অ্যামিবার সকল বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আট-ঘণ্টার সময়ের মধ্যে অযৌন জনন সম্পন্ন হয় কিন্তু তাপ-মাত্রার পরিবর্তন হইলে



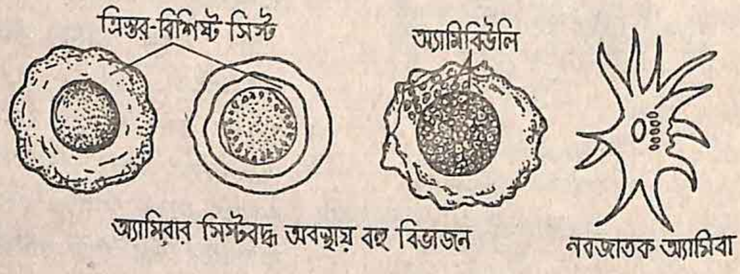
চিত্র-12

অ্যামিবার দ্বিবিভাজন পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়

সময়ের ও পরিবর্তন হয়। সাধারণতঃ কয়েকদিনের মধ্যে 1,000 পর্যন্ত

অপত্য অ্যামিবা একটি অ্যামিবা হইতে সৃষ্ট হয়।

(2) বহুবিভাজন (Multiple fission) ঃ—পূর্বতন বিজ্ঞানীর মতে অ্যামিবা প্রতিকূল অবস্থায় অর্থাৎ অপর্যাপ্ত খাদ্য, অনুপযোগী পরিপার্শ্বিক অবস্থায়, বহুবিভাজন প্রক্রিয়ায় অ্যামিবা বংশবিস্তার করে। এই প্রক্রিয়ায়

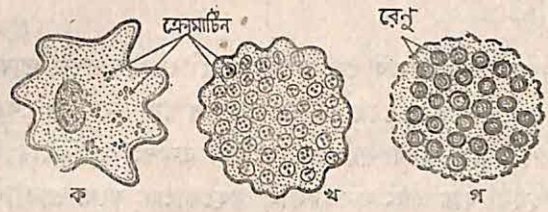


চিত্র-13 বহুবিভাজন পদ্ধতিতে অ্যামিবার জনন

অ্যামিবা তিন স্তর বিশিষ্ট আবরণী নিঃসৃত করে এবং উহা দ্বারা আবৃত হয় ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এই আবরণীকে **সিস্ট (Cyst)** বলে। সিস্টের মধ্যে নিউক্লিয়াসটি পর্যায়ক্রমে ভাঙ্গিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। এই অপত্য নিউক্লিয়াসগুলি পরিধির নিকট সুনির্দিষ্টভাবে অবস্থান করে। প্রত্যেকটি অপত্য নিউক্লিয়াস ইহার পর সাইটোপ্লাজম দ্বারা আবৃত হয় এবং অপত্য অ্যামিবার সৃষ্টি করে, ইহাকে **অ্যামিবুলা (Amoebula)** বা **সিউডোপোডিওস্পোর** বলে। অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলে সিস্টের প্রাচীর বিদীর্ণ হয় এবং অপত্য অ্যামিবা বাহির হইয়া আসে, উহার প্রত্যেকের সহিত সূক্ষ্ম ক্ষণপদ থাকে। অপত্য অ্যামিবা পূর্ণাঙ্গ অ্যামিবার তুলনায় খুব ছোট হয় এবং উহা আস্তে আস্তে পূর্ণাঙ্গ অ্যামিবায় পরিণত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে কোন সময় অ্যামিবা বহুবিভাজন প্রক্রিয়ায় জনন কার্য সম্পন্ন করে না।

(3) স্পোরুলেশান (Sporulation)ঃ—সাম্প্রতিকালে 'Taylor' মতে প্রভৃতি অবস্থায় স্পোরুলেশান পদ্ধতিতে অ্যামিবা বংশবিস্তার করে। এই

পদ্ধতিতে নিউক্লিয়ার পর্দাটি অদৃশ্য হইয়া যায় এবং নিউক্লিয়াসটি অনেকগুলি



চিত্র-14 অ্যামিবার স্পোরুলেশন পদ্ধতি

অংশে বিভক্ত হয় এবং উহা সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায়। ইহার পর প্রত্যেকটি নিউক্লিয় বস্তু একটি করিয়া নিউক্লিয় পর্দা দ্বারা আবৃত হইয়া একটি সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং উহা একখণ্ড সাইয়টাপ্লাজম দ্বারা আবৃত হয়। অতঃপর ইহাকে ঘিরিয়া একটি স্পোর আবরণী গঠিত হয়। এই ভাবে মাতৃকোষের অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে প্রায় 200টি অ্যামিবুলা বা স্পোর সৃষ্টি হয়। প্রতিকূল অবস্থায় এই সকল স্পোর সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং অনুকূল অবস্থায় প্রতিটি স্পোর ফাটিয়া গিয়া ছোট অপত্য অ্যামিবার সৃষ্টি করে। অপত্য অ্যামিবা শীঘ্র পূর্ণাঙ্গ অ্যামিবায় পরিণত হয়।

(4) কন্‌জুগেশান (Conjugation) ঃ—অনেকের মতে অ্যামিবা প্রোটিয়াসের যৌন জনন হয়। তাঁদের মতে অ্যামিবার নিউক্লিয়াস জনন কোষ গঠন করে, দুইটি জনন কোষ মিলিত হইয়া জাইগোট গঠন করে।

অনেকের মতে দুইটি অ্যামিবার মধ্যে অস্থায়ী সংযোগ স্থাপন হয়। কিছুক্ষণ পরে দুইটি অ্যামিবা পৃথক হইয়া যায় ও পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী সক্রিয় হয়, ও অতিমাত্রায় সজীবতা প্রকাশ পায়। ইহাকেই অ্যামিবার কনজুগেশান বলে।

(5) পুনর্গঠন (Regeneration) ঃ—অ্যামিবার পুনর্জন্ম বা পূর্ণসৃষ্টি যদিও কোন প্রকার জনন প্রক্রিয়া নয় কিন্তু ইহা প্রাণীকে বংশবিস্তার করিতে সহায়তা করে। পরীক্ষাগারে যদি অ্যামিবাকে দুইটি খণ্ডে বিভক্ত করা যায়, তখন যদি প্রতিটি খণ্ডে নিউক্লিয়াসের অংশ থাকে, তাহা হইলে প্রতিটি খণ্ড আবার পূর্ণাঙ্গ-অ্যামিবায় পরিণত হয়। যদি কোন খণ্ডে নিউক্লিয়াসে অংশ না থাকে তাহা হইলে সেই খণ্ড বিনষ্ট হইয়া যায়।

(6) আবরণীবদ্ধতা (Encystment) ঃ আবরণীবদ্ধতা অ্যামিবা

প্রোটিয়াসের ক্ষেত্রে যদিও দেখা যায় না কিন্তু ইহা অন্যান্য অ্যামিবার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

তীব্র ঠাণ্ডায় বা গরমে বা যে জলে অ্যামিবা বাস করে তাহার **pH**-এর পরিবর্তনে বা উহার অভ্যন্তরস্থ অক্সিজেনের পরিমাণ বা অন্য কোন প্রতিকূল অবস্থায় অ্যামিবার আবরণীবদ্ধতা ঘটে। ক্রমশঃ অ্যামিবার দেহকোষটি বর্তুলাকার হইয়া যায় এবং ক্ষণপদগুলি দেহকোষের মধ্যে প্রত্যাহার করিয়া লয় এবং দেহকোষের মধ্যে সঙ্কোচী গহ্বরগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়। সাইটোপ্লাজম দ্বারা নিঃসৃত প্রতিরোধশীল দ্বি-প্রাচীরবিশিষ্ট আবরণী দেহকোষটিকে আবৃত করিয়া রাখে। অ্যামিবা এই সময় নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

অনুকূল অবস্থা ফিরিয়া আসিলে সিষ্টের প্রাচীর বিদীর্ণ হয় এবং অ্যামিবা সিষ্টের মধ্যে হইতে বাহির হইয়া যায় ও পুনরায় স্বাভাবিক জীবনযাপনকরে।

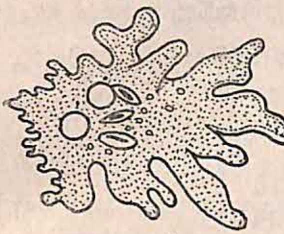
আবরণীবদ্ধতা অ্যামিবাকে প্রতিকূল অবস্থায় সুরক্ষিত রাখে কিন্তু ইহা জনন কার্যে সাধারণতঃ কোনরূপ সহায়তা করে না। কারণ পরীক্ষাগারে গবেষণা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সিষ্টের মধ্যে অ্যামিবার নিউক্লিয়াসের কোনরূপ বিভাজন সাধারণতঃ হয় না।

কয়েকটি অ্যামিবার পরিচিতি ঃ

(a) অ্যামিবা ভেরুকোষা (Amoeba verrucosa) ঃ এই প্রজাতি স্বাধীনজীবী, দেহের উপরিভাগ কুঞ্চিত, প্রায় 0·2 মিলিমিটার দেহের ব্যাস। দেহে বহিরাবরণী পেলিকল শক্ত এবং ক্ষণপদ ছোট ও অসংখ্য হয়। নিউক্লিয়াস ডিম্বাকৃতি। ইহারা প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে অর্ধেক মাইক্রন চলাফেরা করে।

(b| অ্যামিবা ডিসকয়েডস (Amœba discoides) ঃ দেহটি ছোট, একটি ছোট চ্যাপ্টা উত্তল নিউক্লিয়াস থাকে। এই অ্যামিবার ব্যাস 4 মিলিমিটার পর্য্যন্ত হয়।

(b) অ্যামিবা টেরিকোলা (Amoeba terricola) ঃ অ্যামিবা টেরিকোলা ভিজা মাটিতে বাস করে।



অ্যামিবা ডুবিয়া

চিত্র-15

(d) অ্যামিবা ডুবিয়া (Amoeba dubia) ঃ অ্যামিবা ডুবিয়ার ব্যাস প্রায় 4 মিলিমিটার হয়, দেহটি চ্যাপ্টা, অনেকগুলি সরু ক্ষণপদ থাকে। নিউক্লিয়াসটি গোলাকার। এণ্ডোপ্লাজমের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কণিকা থাকে।

(e) অ্যামিবা রেডিওসা (Amoeba radiosa) ঃ এই প্রজাতির বাহিরের ব্যাস 0·08 মিলিমিটার হয়। দেহটি ডিম্বাকৃতি, দেহের চারিপাশে সরু সরু ক্ষণপদ থাকায় তারকাকৃতি দেখায়। ক্ষণপদগুলি শক্ত, সোজা ও সরু হয়।

এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকা (Entamoeba histolytica) :

ইহা একটি আণুবীক্ষণিক পরজীবী আদ্যপ্রাণী, মানুষের অন্ত্রে বাস করে। ইহারা আমাশয় রোগের কারণ। 'Lambb' 1859 সালে প্রাগে আমাশয়ে আক্রান্ত শিশুর মলের মধ্যে প্রথম জীবন্ত এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকা দেখিতে পান। 1875 সালে (Losch) প্রথম ইহাকে অপকারী পরজীবী আদ্যপ্রাণী হিসাবে চিহ্নিত করেন। 1883 সালে 'Robert Koch' মানুষের বৃহৎঅন্ত্রের ক্ষতের (ulcer) মধ্যে এই পরজীবীকে প্রথম দেখিতে পান।

1887 সালে 'Kartulis' এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকার পূর্ণাঙ্গ অবস্থা আবিষ্কার করেন।

1893 'Quincke' এবং 'Roos' প্রথম এই পরজীবীর সিস্ট দশার আবিষ্কার করেন।

1913 সালে 'Walker' এবং 'Sellards' মানুষের উপর পরীক্ষা করেন এবং প্রমাণিত করেন যে এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকা আমাশয় রোগের সৃষ্টি করে।

ভৌগোলিক অবস্থান ঃ এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকা পৃথিবীর সর্বত্র অবস্থান করে। কিন্তু প্রধানতঃ ক্রান্তীয় অঞ্চলে এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে ইহাদের প্রাদুর্ভাব বেশী।

প্রাণীজগতে অবস্থান ঃ— পর্ব ঃ সারকোম্যাসটিগোফোরা
উপপর্ব ঃ সারকোডিনা
সুপার শ্রেণী ঃ রাইজোপোডা
শ্রেণী ঃ লোবোসিয়া
উপশ্রেণী ঃ গিমনামিবিয়া
বর্গ ঃ অ্যামিবিডা
উপবর্গ ঃ টিবিউলিনা।
গণ ঃ এণ্টামিবা
প্রজাতি ঃ এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকা

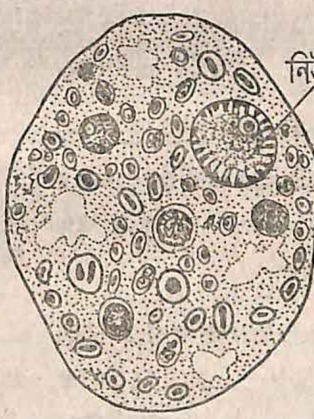
স্বভাব ও বাসস্থান ঃ এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকা একটি আন্ত্রিক পরজীবী আদ্যপ্রাণী। সাথারণতঃ বৃহৎ অন্ত্রের উপরের দিকে (colon) বা ক্ষুদ্রান্ত্রের নিচের দিকে (ileum) থাকে, ইহারা অন্ত্রের মিউকাস পর্দা বা তার নীচের স্তরে থাকে। **এণ্টমিবা** একপ্রকার প্রোটিন হজমকারী রস নিঃসরণ করে, এই রস দ্বারা এণ্টামিবা অন্ত্রের মিউকাস প্রাচীরকে দ্রবীভূত করে। সাধরণতঃ দ্রবীভূত কোষ, ব্যাকটিরিয়া ও লোহিতকণিকাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। যকৃতের মধ্যেও ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহারা ফুসফুস ও মস্তিষ্কের মধ্যেও বসবাস করিতে পারে।

বহিরাকৃতি ঃ সাধারণতঃ আয়োডিন এবং লৌহঘটিত হিমাটক্সিলিন দ্বারা ইহাকে অণুবীক্ষণযন্ত্রে পরীক্ষা করা হয়। ইহাদের জীবনচক্রে তিনটি দশা দেখিতে পাওয়া যায়।

(i) **ট্রফোজয়েট দশা ঃ** অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে জীবন্ত এণ্টামিবাকে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ইহারা খুব আস্তে আস্তে ভাসিয়া বেড়ায় বা হড়কাইয়া চলাফেরা করে। ট্রফোজয়েট অবস্থার কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই কারণ ইহারা সর্বদাই নড়াচড়া করে ও স্থান পরিবর্তন করে। ইহাদের আয়তন 18 হইতে 40 মাইক্রন হয়। 'Dobell' (1919) সালে দুইপ্রকার পরজীবীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন; যেমন বড় ও ছোট। জীবদ্দশায় এণ্টামিবার সাইটোপ্লাজমকে দুইটি পৃথক অংশে ভাগ করা যায়; যেমন বহিঃপ্লাজম ও অন্তঃপ্লাজম। বহিঃপ্লাজম স্বচ্ছ ও দানাবিহীন। অন্তঃপ্লাজম দানাদার, ইহার মধ্যে লোহিত রক্তকণিকা এবং মৃতকোষ প্রভৃতি দেখা যায়। পূর্ণাঙ্গ এণ্টামিবা ক্ষণপদ দ্বারা চলাচল করে। ইহাদের ক্ষণপদ লম্বা এবং আঙুলের

মতো। ক্ষণপদ ছোট ও চওড়া হয়। রোগীর মলের মধ্যে ইহারা খুব সক্রিয় এবং একটিমাত্র ক্ষণপদ দ্বারা সরলরেখা অবলম্বন করিয়া দ্রুত চলাচল করে। এইরকম চলনকে **দিকনির্দিষ্ট চলন** (directonal movement) বলে।

জীবন্ত অবস্থায় ট্রফোজয়েটের নিউক্লিয়াস অস্পষ্ট দেখায় কিন্তু যদি হিমাটক্সিলিন দ্বারা রঙ করা হয় তবে নিউক্লিয়াসকে বেশী স্পষ্ট দেখায়। নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে একটি ছোট ফুটকির মতো অংশ থাকে, তাহাকে ক্যারিওসোম বলে। ক্যারিওসোম অন্যান্য কোষের নিউক্লিওলাসের মতো কাজ করে। ক্যারিওসোমের চারিপাশে একটি স্বচ্ছ গোলাকার অংশ থাকে, তাহাকে **'Halo'** অঞ্চল বলে। নিউক্লিয়াসের বাহিরে একটি সূক্ষ্ম নিউক্লিয় পর্দা থাকে। ইহার ভিতরের প্রাচীরে ক্রোমাটিন দানাগুলি গোলাকারে একটি স্তরে অঙ্গুরীর ন্যায় সাজান থাকে। ক্যারিওসোম ও নিউক্লিয় পর্দার মধ্যবর্তী অংশে **নিউক্লিওপ্লাজম** থাকে। নিউক্লিওপ্লাজম ও ক্যারিওসোমের মধ্যে সূক্ষ্ম সুতোর ন্যায় **লাইনিন** নির্মিত জালের মতো অংশ থাকে। ইহা স্পোক এর মতো, অরীরভাবে সজ্জিত থাকে।

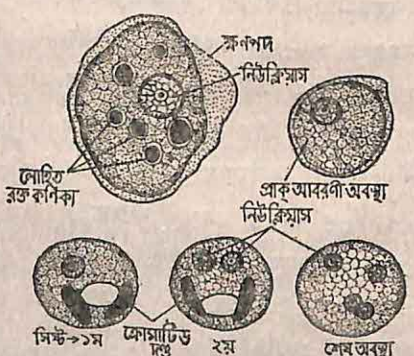


চিত্র-16 এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকার পূর্ণাংগ দশা

প্রাকআবরণীবদ্ধ (Pre-cystic stage) ঃ—এই দশায় পরজীবী প্রাণীটি প্রায় বর্ণহীন, গোলাকার বা ঈষৎ ডিম্বাকার হয়। বৃহদন্ত্রের ক্ষতস্থানে ক্রমান্বয়ে দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে গঠিত যে ট্রফোজয়েট কোলনের গহ্বরে মুক্ত হয়, যেগুলি অন্যান্য ট্রফোজয়েট অপেক্ষা আকারে ছোট, প্রায় গোলাকার ও অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় হয়। ইহাদের ব্যাস 7 হইতে 10 মাইক্রন হয়। এণ্টামিবার এই অবস্থাকে প্রাক-আবরণীবদ্ধ অবস্থা বলে। এই অবস্থায় এণ্টামিবা খাদ্য গ্রহণ করে না বা খাদ্য গহ্বরের থাকে না। ক্রমশঃ ইহাদের দেহনিঃসৃত রসের সাহায্যে নিজ দেহের চারিপাশে একটি পাতলা বর্ণহীন, স্বচ্ছ ও প্রতিরোধী আবরণী প্রাচীরের সৃষ্টি করে। এই

দশার শেষের দিকে গ্লাইকোজেন দানা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাক আবরণীবদ্ধ অবস্থা হইতে সিস্ট তৈরী হয়। কিন্তু যদি প্রাক আবরণীবদ্ধ দশায় পরজীবী মলের সহিত বাহিরে চলিয়া আসে তাহা হইলে আর সিস্ট গঠন করিতে পারে না। এই দশায় নিউক্লিয়াসের বৈশিষ্ট্য ট্রফোজয়েটের নিউক্লিয়াসের মতো।

সিস্ট অবস্থা (Cystic stage) ঃ আবরণীবদ্ধতার সময় পরজীবীটি গোলাকার আকার ধারণ করে। **সিস্ট** অবস্থায় ইহারা একটি পাতলা পর্দা দ্বারা নিজেকে আবৃত করে, ইহাকে সিস্ট বা আবরণী বলে। এই সিস্টের মধ্যে চারিটি নিউক্লিয়াস থাকে, নিউক্লিয়াসের বৈশিষ্ট্য ট্রফোজয়েটের নিউক্লিয়াসের মতো। ইহার সাইটোপ্লাজম খুবই স্বচ্ছ। ইহার আয়তন সাধারণ 6 থেকে 9 মাইক্রন, এমনকি 12 হইতে 15 মাইক্রন পর্যন্ত ইহাদের ব্যাস হইতে পারে। সিস্টের প্রারম্ভিক দশায় একটি মাত্র নিউক্লিয়াস থাকে, কিন্তু খুব শীঘ্রই দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে দুইটি ও পরে চারিটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াসের আয়তন ক্রমশঃ কমিতে থাকে তথন নিউক্লিয়াসের ব্যাস 2 মাইক্রন হয়। সিস্টের এই অবস্থাকে **এণ্টামিবা মায়নুটা** (Entamoeba minuta) বলে। সিস্টের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে নিম্নলিখিতঅংশগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।



চিত্র-17. এণ্টামিবার আবরণী ও প্রাকআবরণী দশা

1) ক্রমিডিয়াল কণা ঃ—ইহা রডের মতো এবং দুইপ্রান্ত গোলাকার হয়। ক্রোমাটিডকে হিমাটক্সিলিন দ্বারা রঙ করিলে কালো দেখায়। ক্রোমাটিডের সংখ্যা এক হইতে চার হইতে পারে, উহার আয়তন সিস্টের ব্যাসের অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ হয়। এই ক্রোমিডিয়াল কণিকা সিস্টের প্রাথমিক অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সিস্ট চারিটি নিউক্লিয়াসযুক্ত হইলে ক্রোমাটিড অদৃশ্য হইয়া যায়।

2) গ্লাইকোজেন কণা : আয়োডিন দ্বারা রঙ করিলে গ্লাইকোজেনকে বাদামী বর্ণের দেখায়। ইহা সিস্টের প্রারম্ভিক দশায় থাকে কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে গ্লাইকোজেনকে দেখা যায় না।

জনন পদ্ধতি : এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকার জনন নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতিতে হয়।

a) আবরণীহীনতা (Excystation): এই পদ্ধতিতে সিস্ট ট্রফোজয়েট বা পূর্ণাংগ অবস্থায় পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়। মানুষের পৌষ্টিকনালীতে এই ট্রফোজয়েটের রূপান্তর ঘটে। আবরণীবদ্ধহীনতার সময় চারিটি নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট সিস্ট আটটি অপত্য এণ্টামিবাতে পরিণত হয়।

b) আবরণীবদ্ধতা (Encystation) : এই পদ্ধতিতে ট্রফোজয়েট একটি আবরণী দ্বারা আবৃত হয় এবং সিস্টে পরিণত হয়। এই রূপান্তর সংক্রামিত মানুষের অন্ত্রের গহ্বরের মধ্যে ঘটে। আবরণীবদ্ধতা পদ্ধতিতে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ট্রফোজয়েট আবরণীর মাধ্যমে সিস্টে রূপান্তরিত হয়। সিস্ট মানুষের অন্ত্রের মধ্যে প্রায় দুইদিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

আবরণীবদ্ধহীনতা এবং আবরণীবদ্ধতা একই পোষকের মধ্যে ঘটে। আবরণীবদ্ধ অবস্থায় ইহারা মানুষের মলের সংগে দেহের বাহিরে আসে। সিস্ট খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে মানুষের খাদ্যনালীতে প্রবেশ করে, নতুন মানুষের দেহে সিস্ট পূর্ণাংগ অবস্থা অর্থাৎ ট্রফোজয়েটে রূপান্তরিত হয়।

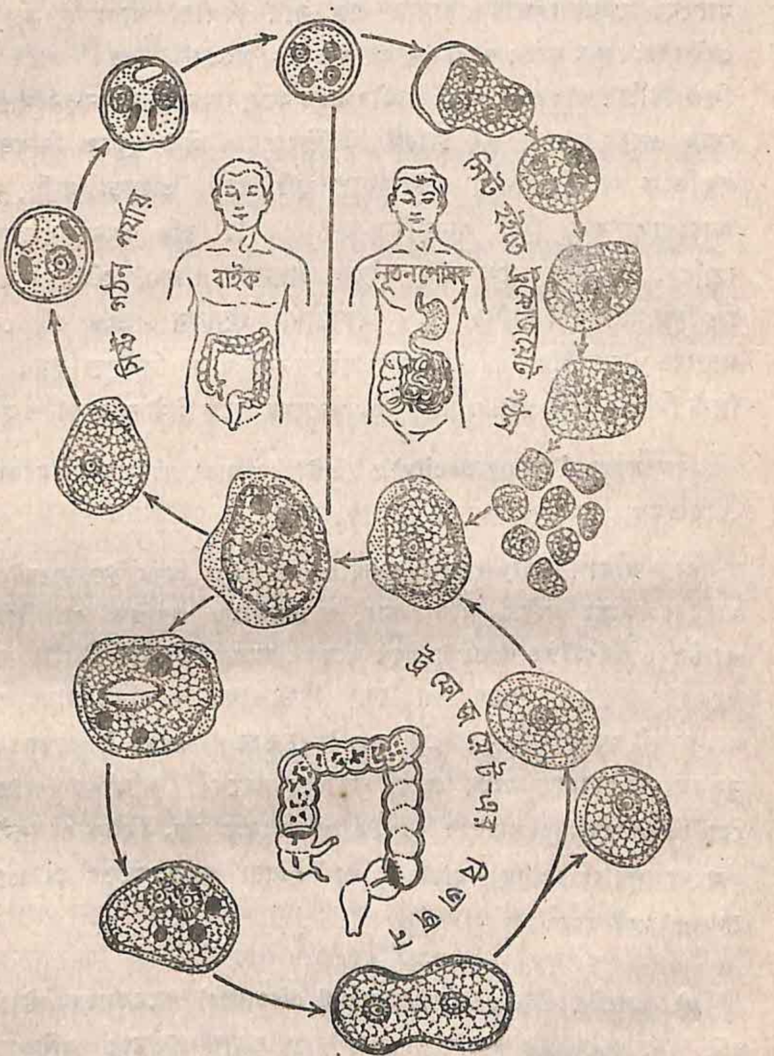
c) বিভাজন (fission) বিভাজন পদ্ধতি ট্রফোজয়েট দশায় ঘটে। মানুষের পৌষ্টিকনালীতে এণ্টামিবার পূর্ণাংগ অবস্থা দ্বিভাজনে পদ্ধতিতে অসংখ্য এণ্টামিবাতে পরিণত হয়। এই সময় ট্রফোজয়েটের নিউক্লিয়াস মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয় এবং পরে ট্রফোজয়েটের সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয়। একটি ট্রফোজয়েট হইতে অসংখ্য অপত্য এণ্টামিবার সৃষ্টি হয়, এবং অপত্য এণ্টামিবা পূর্ণাংগ এণ্টামিবাতে পরিণত হয়।

জীবনচক্র : এণ্টামিবার জীবনীচক্রে কোনও প্রকার যৌনজনন ঘটে না। দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে এণ্টামিবা বংশবৃদ্ধি করে। মানুষই একমাত্র পোষক প্রাণী। উহাদের জীবনচক্র সম্পূর্ণ করিতে দুইটি পোষকের প্রয়োজন হয়। দূষিত জল ও খাদ্যের মাধ্যমে সংক্রামিত মানুষ হইতে সুস্থ মানুষের দেহে

এণ্টামিবার সংক্রমণ ঘটে। ইহাদের জীবনে তিনটি দশা দেখিতে পাওয়া যায়। ট্রফোজয়েট দশা—মানুষের বৃহদন্ত্রে থাকে ও বৃহদন্ত্রের কোষের ক্ষতি সাধন করে এবং ক্ষত সৃষ্টি করে। মানুষের আমাশয় রোগ ইহাদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়।

পূর্ণাংগ চারিটি নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট সিস্ট এণ্টামিবার সংক্রামিত রূপ। দূষিত বা সংক্রামিত খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়ের সহিত সিস্ট মানুষের পৌষ্টিক নালীতে পৌছায়। এইসময় সিস্ট মানুষের খাদ্যনালীতে প্রবেশ করে। ইহা অপরিবর্তিত অবস্থায় পাকস্থলীর মধ্যদিয়া অগ্রসর হয়। সিস্টের প্রাচীর পাকস্থলীর রসে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু ইহা অন্ত্র দ্বারা নিঃসৃত ট্রিপসিন রসদ্বারা দ্রবীভূত হয়। **সিস্ট ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ অংশে পৌঁছাইবার পর আবরণীবদ্ধহীনতা** ঘটে। এইসময় প্রতিটি সিস্ট হইতে চারিটি নিউক্লিয়াসযুক্ত অ্যামিবা মুক্ত হয়। সংগে সংগে দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে বিভক্ত হইয়া আটটি অপত্য এণ্টামিবার সৃষ্টি করে। অপত্য এণ্টামিবা স্বাধীনভাবে চলাচল করিতে পারে এবং অন্ত্রের প্রাচীরকে আক্রমণ করে। অন্ত্রের প্রাচীরের মাসকুলারিস মিউকোসা, সাবমিউকোসা স্তরকে এণ্টামিবা নষ্ট করিয়া ফেলে এবং সজীব কোষকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে অসংখ্য অপত্য এণ্টামিবা সৃষ্টি করে। **এইভাবে** ট্রফোজয়েটের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং অন্ত্রের প্রাচীর ক্রমাগত নষ্ট হইবার ফলে আশ্রয়দাতা মানুষ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়। কলা বেশীমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হইলে অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই সময় অনেক ট্রফোজয়েট আশ্রয়দাতার মলের সহিত দেহের বাহিরে আসে। দেহের বাহিরে চলিয়া আসিবার পর ট্রফোজয়েট বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ট্রফোজয়েট মারা যায়। আশ্রয়দাতা পোষকের দেহ সিস্ট দেহের বাহিরে আসে। যদি ঐ সিস্ট খাদ্য ও পানীয়ের সংঙ্গে নূতনপোষকের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে তবে নতুন পোষককে আক্রমণ করে। মানুষের পৌষ্টিকনালীতে কিছু ট্রফোজয়েটের আবরণীবদ্ধতা ঘটে এবং সিস্টে পরিণত হয়। এই সিস্ট দেহের বাহিরে আসে এবং খাদ্যের সংগে নূতন পোষকের দেহে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ট্রফোজয়েটে পরিণত হয়।

এইভাবে দুইটি পোষকের মাধ্যমে এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকার জীবনীচক্র



চিত্র-18 মানুষের দেহে এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকার জীবনীচক্র

শেষ হয়।

সংক্রমণ প্রথা (Mode of infection) : আবরণীবদ্ধ অবস্থায় সিস্ট এক মানুষ হইতে অন্য মানুষের দেহে স্থানান্তরিত হয়। সিস্ট দশাই এণ্টামিবার সংক্রামিত রূপ। সিস্ট মিশ্রিত বর্জ্যপদার্থ দ্বারা সংক্রামিত

পানীয়জল, শাকসবজী খাদ্যই সংক্রমণের প্রধান কারণ। অনেকসময় মানুষের বর্জ্যদ্রব্য তরিতরকারীর জন্য সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়, সেইকারণে মূল, কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা সিস্ট দ্বারা সংক্রামিত হয়। মানুষ যখন সিস্ট মিশ্রিত শাকসব্জী, খাদ্য, পানীয় গ্রহণ করে, তখন সিস্ট নতুন মানুষের দেহে প্রবেশ করে। এই চারিটি নিউক্লিয়াসযুক্ত সিস্ট হইতে দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে আটটি অপত্য এণ্টামিবার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া মাছি, মশা, আরশোলা দ্বারা সিস্ট সংক্রামিত হয়। ইহারা যদি কখনও সংক্রামিত বর্জ্যপদার্থের উপর বসে তাহা হইলে তাহাদের পাখনা, শুঁড়, ও দেহে সিস্টযুক্ত বর্জ্যপদার্থ লাগিয়া যায়। ইহার পর এইসকল পতংগ যদি কোন মানুষের খাদ্যদ্রব্যের উপর বসে তাহা হইলে সেই খাদ্য সিস্টযুক্ত হয়। এই সিস্ট মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ করিলে নূতন মানুষের দেহে সিস্ট স্থানান্তরিত হয়।

বিকারতত্ব (**Pathogenecity**) ঃ এণ্টামিবা দ্বারা প্রধানতঃ তিনরকমের রোগ হয়।

a) আমাশয় (**Dysentry**) ঃ পূর্ণাংগ এণ্টামিবা অথবা ট্রফোজয়েট দশা মানুষের অন্ত্রের গহ্বরে বাস করে, খাদ্যনালীতে অবস্থিত ব্যাকটিরিয়া, পাচিত ও অর্ধপাচিত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। অন্ত্রের মিউকাস ঝিল্লীর ক্ষতি করে। এইভাবে অন্ত্রের প্রাচীরের মিউকোসা, সাবমিউকোসা স্তর, মাংসপেশী স্তরের ক্ষতি করে এবং ক্ষত তৈরী করে। এরপর ঐ ক্ষতের রক্ত, মৃতকলা পায়খানার সংগে দেহের বাহিরে আসে। আমাশয় আক্রান্ত রোগীর পায়খানার অম্লভাব বেশী। পায়খানায় রক্ত, মিউকাস, সিস্ট ও অসংখ্য পূর্ণাংগ অবস্থা থাকে। এবং ইহারা আন্ত্রিকক্ষতের (**Gastric** Ulcer) সৃষ্টি করে।

b) পেটের পীড়া ঃ (**Abdominal disorder**) অনেকসময় এণ্টামিবা দ্বারা আক্রান্ত রোগীর আমাশয়ের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কলিকাতায় মিলার ও গিলীনী (1951) লক্ষ্য করেন অনেকসময় আমাশয় রোগীর ক্ষেত্রে এণ্টামিবা দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এই সকল রোগী কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথাব্যথা, বমিভাব, অবসাদ ও পেটের পীড়াতে ভোগে।

c) ক্ষত ঃ (**Ulcer**) সংবহনের মাধ্যমে ট্রফোজয়েট অবস্থা যকৃত,

প্লীহা, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয়, ফুসফুস এমন কি মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। প্রধানতঃ যকৃত এণ্টামিবা দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং যকৃতে ক্ষতের সৃষ্টি করে। এইসকল রোগীর ক্ষেত্রে যকৃতে ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও ব্যথা হয় এবং যকৃত আকার-আয়তনে বাড়িয়া যায়। ফুসফুস ও মস্তিষ্ক পূর্ণাংগ অবস্থা দ্বারা আক্রান্ত হইলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

প্রতিরোধ ঃ (Control) এণ্টামিবা হিস্টোলিকা হইতে নিজেকে রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

i) পায়খানা, পয়ঃপ্রণালী উন্নত ও পরিষ্কার থাকা একান্তই প্রয়োজন।

ii) এক মানুষের দেহ হইতে অন্য মানুষে খাদ্য ও পানীয়ের সংগে এণ্টামিবার সিস্ট সংক্রামিত হয়, সেজন্য পাচক-পাচিকার পরিচ্ছন্নতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

iii) অপরিশুদ্ধ জল ভাল করিয়া ফুটাইয়া খাওয়া প্রয়োজন।

iv) বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য শাকসব্জী, তরিতরকারী রান্না করিবার পূর্বে ভাল করিয়া ধুইয়া লওয়া উচিত। খাদ্যকে ভালভাবে ঢাকা রাখা প্রয়োজন।

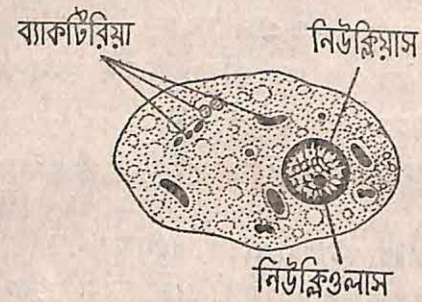
v) সব্জী ও তরিতরকারী শতকরা 15 ভাগ অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত জলে একঘণ্টা রাখা বাঞ্ছনীয়।

vi) মানুষের মলমূত্রকে সার হিসাবে ব্যবহার করিবার পূর্বে জীবাণুমুক্ত করা প্রয়োজন।

কয়েকটি এণ্টামিবার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

(i) এণ্টামিবা জিনজিভালিস (Entamoeba gingivalis) ঃ শতকরা সত্তর ভাগ মানুষের মুখে এই পরজীবি প্রাণী বাস করে। সাধারণতঃ চোয়ালের ক্ষতে, গলা, টনসিলের ক্ষতে এরা বাস করে। দাঁতের গোড়া থেকে রস নিয়ে শতকরা ·7 ভাগ সাধারণ লবণের দ্রবণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে ইহাদের ট্রফোজয়েট অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। দেহে একটিমাত্র নিউক্লিয়াস থাকে, 10 হইতে 12 মাইক্রন ব্যাস হয়, অন্তপ্লাজম দানাদার, নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রে নিউক্লিওলাস থাকে। জিনেজিভালিস মারাত্মক ক্ষতিকারক নয়, কিন্তু মাড়ির ক্ষতিসাধন করে এবং পায়োরিয়া রোগের সৃষ্টি করে। এই প্রজাতি এক মানুষের দেহ হতে অন্য মানুষের দেহে চুম্বন ও খাদ্যের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়।

(ii) এণ্টামিবা কোলাই (Entamoeba Coli) : শতকরা পঞ্চাশজন মানুষের কোলনের গহ্বরে এই প্রজাতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রজাতি ক্ষতিকারক নয়। ব্যাকটিরিয়া, অপাচ্য খাদ্যকে ইহারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ইহাদের আয়তন 20 হইতে 30 মাইক্রন হয়। বহিঃপ্লাজম ও অন্তঃপ্লাজম বেশ সুস্পষ্ট। নিউক্লিয়াসের একপ্রান্তে নিউক্লিওলাস অবস্থিত। ইহাদের সিস্টের মধ্যে অনেক গ্লাইকোজেন কনিকা থাকে। পরিণত সিস্টের মধ্যে আটটি নিউক্লিয়াস থাকে। অর্থাৎ একটি সিস্ট হইতে আটটি অপত্য এণ্টামিবা কোলাই এর সৃষ্টি হয়। ইহাদের এণ্টামিবা হিস্টোলিকার মত দ্বি বিভাজন হয় না।



চিত্র-19 এণ্টামিবা কোলাই

(iii) এণ্টামিবা হারটম্যানি (Entamoeba hartmanni) ইহারা মানুষের কোলনে বাস করে, অন্ত্রের কোষকলাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ট্রফোজয়েটের প্রায় 9 থেকে 14 মাইক্রন ব্যাস হয়। এই এণ্টামিবা আমাশয় রোগের কারণ ঘটায়।

পলিস্টোমেলা (Polystomella) [Elphidium]

সারকোম্যাসটিগোফোরা পর্বভুক্ত প্রাণীদের মধ্যে পলিষ্টোমেলা অন্যতম। এই পর্বের অন্তর্ভূক্ত অনেক আদ্যপ্রাণীর দেহের চারিদিকে দেহ নিঃসৃত রসে গঠিত শক্ত ও মজবুত বহিরাবরণী বা খোলক থাকে। ইহারা সামুদ্রিক, তবে কয়েকটি প্রজাতি মিঠা জলে বাস করে। ভিজা মাটিতেও কয়েকটি প্রজাতি বাস করে। দেহনিঃসৃত রসের কৃত্তিকময় পদার্থ, বালুকা লইয়া খোলক গঠিত। 0·1 মি.মি. পর্যন্ত নানা মাপের খোলক বিভিন্ন প্রজাতিতে দেখা যায়। খোলক এক প্রকষ্ঠ বা বহুপ্রকষ্ঠ হইতে পারে। সমগ্র খোলকে অসংখ্য ছিদ্র থাকে, তাই এই প্রাণীদের ফোরামিনিফেরা বলে। এই ছিদ্রপথে দীর্ঘ, সূত্রাকার ক্ষণপদ বাহির হইয়া আসে এবং ক্ষণপদ জালকের (reticulopodia) সৃষ্টি করে।

মৃত খোলকগুলি সমুদ্রবক্ষে সঞ্চিত হইয়া বাদামী বর্ণের কাদামাটি সৃষ্টি

করে, ইহাকে পলিস্টোমেলার যুজ (00ze) বলে।

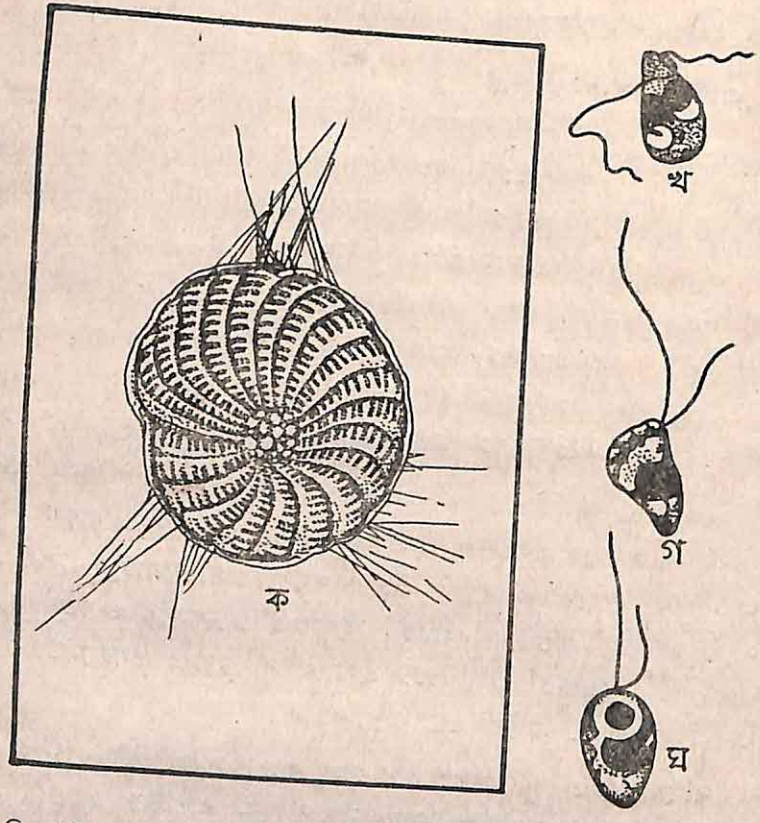
প্রাণীজগতে অবস্থান ঃ

পর্ব ঃ সার্কোম্যাস্টিগোফোরা
উপপর্ব ঃ সারকোডিনা
শ্রেণী ঃ গ্রানিউলোরেটিকিউলোসিয়া
সুপারশ্রেণী ঃ রাইজোপোডা
বর্গ ঃ ফোরামিনিফেরিডা
উপবর্গ ঃ রোটালিনা
গণ ঃ এলফিডিয়াম বা পলিস্টোমেলা
প্রজাতি ঃ ক্রিসপাম

স্বভাব ও বাসস্থান ঃ পলিস্টোমেলা স্বাধীনজীবি সামুদ্রিক প্রাণী। অধিকাংশ সমুদ্রের তলদেশে বাস করে। সাধারণতঃ সমুদ্রউপকূল হইতে 600 মিটার গভীরে বাস করে। ইহারা ক্ষণপদের সাহায্যে খুব ধীর গতিতে সমুদ্রে মাটির উপর চলিয়া বেড়ায়। ইহাদের নোনাজলে ও ভিজামাটিতে দেখা যায়। (Bradshaw) 1959 খ্রীষ্টাব্দে বাসস্থানের উপর নির্ভর করিয়া ফোরামিনিফেরাকে চারিটি ভাগে ভাগ করেন।

বহিরাকৃতি ঃ পলিস্টোমেলার দেহ শক্ত বহুকক্ষবিশিষ্ঠ খোলক দ্বারা আবৃত। ইহাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ছোট শামুকের খোলের মতো দেখায়।

খোলক (Shell) : ইহা শক্ত, অস্বচ্ছ, দ্বিউত্তল, বর্তুলাকার বা ডিম্বাকার হয়। ইহার বর্ণ লাল, বাদামী বা ফ্যাকাসে হলুদ হয় এবং ইহার ব্যাস প্রায় এক মিলিমিটার হয়। এই খোলক ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, সিলিকা, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট প্রভৃতি দ্বারা তৈয়ারী। খোলকের মধ্যস্থানে অবস্থিত গোলাকার অংশকে **Umbo** বলে ও পরিধির অবিচ্ছেদ্য শক্ত অংশকে **keel** বলে। খোলকটি বহুসংখ্যক ছিদ্রবিশিষ্ঠ হয়। এই ছিদ্রপথে সাইটোপ্লাজম দেহের বাহিরে চলিয়া আসে এবং ক্ষণপদ সৃষ্টি করে।



চিত্র-20 ক) পলিস্টোমেলা খ-ঘ-যৌনজননের জননকোষ

পলিস্টোমেলার খোলক বহুপ্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, '**V**' আকারের অনেকগুলি বর্তুলাকারে সজ্জিত প্রকোষ্ঠ দ্বারা গঠিত। প্রকোষ্ঠগুলি পার্শ্বীয়দেশ বরাবর লম্বাটে হয় এবং সামনের দিক উত্তল ও পিছনের দিক অবতল হয়। অবতল পার্শ্বের পশ্চাত অংশ হইতে অনেকগুলি ফাঁপা বদ্ধ অংশ পশ্চাৎদিক বরাবর বাহির হয় তাহাকে **রিট্রাল প্রসেস** বলে।

খোলক গঠনের প্রারম্ভিক দশায় একটি মাত্র প্রকোষ্ঠ থাকে তাহাকে প্রোলোকিউলাম বলে। খোলক ক্রমশঃ সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় এবং বর্তুলাকারে প্রোলোকিউলাম কে বেষ্টন করিয়া আবর্ত সৃষ্টি করে। পিছনের আবর্ত পূর্বের আবর্তকে অংশতঃ আবৃত করিয়া রাখে। শুধুমাত্র শেষ আবর্ত বাহির হইতে দেখা যায় এবং এইটি আকারে সবচেয়ে বড় হয়।

সাইটোপ্লাজম ঃ খোলকের প্রকোষ্ঠগুলি দানাদার সাইটোপ্লাজম দ্বারা পূর্ণ থাকে। একটি পাতলা সাইটোপ্লাজমের স্তর বা প্রলেপ খোলকের বাহিরের অংশকে আবৃত করিয়া রাখে। খোলকের সবজায়গায় সমভাবে সাইটোপ্লাজম অবস্থান করে। বাহিরের দিকের সাইটোপ্লাজমকে বহিঃপ্লাজম, এবং ভিতরের দিকের সাইটোপ্লাজমকে অন্তঃপ্লাজম বলে।

পলিস্টোমেলার গঠনগত বৈষম্য বা দ্বিরূপতা দেখা যায়। পূর্ণাঙ্গ পলিস্টোমেলাকে দুইটি অবস্থায় দেখা যায়। যথা, **বৃহৎগোলক** বা মেগালোস্ফেরিক ও **ক্ষুদ্রগোলক** বা মাইক্রোস্ফোরিক। বৃহৎগোলকের প্রথম বা আদি প্রকোষ্ঠ অপেক্ষাকৃত বড়, ক্ষুদ্র গোলকে আদি প্রকোষ্ঠ ছোট হয়। বৃহৎগোলকের আদি প্রকোষ্ঠে একটিমাত্র বড় নিউক্লিয়াস থাকে, ক্ষুদ্রগোলকের আদিপ্রকোষ্ঠে একাধিক ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস বিক্ষিপ্ত ভাবে সাইটোপ্লাজমে ছড়ানো থাকে। ক্ষুদ্রগোলকের সংখ্যানুপাতে বৃহৎগোলকের সংখ্যা তিরিশ গুণ বেশী হয়।

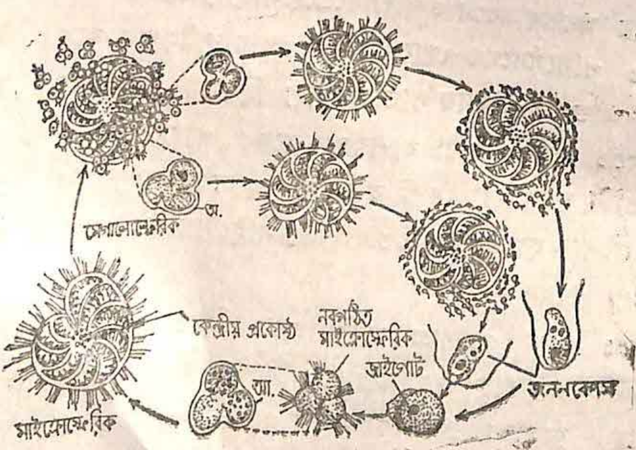
ক্ষণপদ ঃ বাহিরের দিকের সাইটোপ্লাজম বা বহিঃপ্লাজম গোলকের ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসে এবং অসংখ্য জালের মতো ক্ষণপদের সৃষ্টি করে। ক্ষণপদগুলি সূতাকৃতি, শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া জালকের সৃষ্টি করে। এইরূপ ক্ষণপদকে **রেটিকিউলোপোডিয়া** বলে। এই ক্ষণপদের মধ্যে একটি শক্ত মধ্য অক্ষ বা তন্তু থাকে, তন্তুর বাহিরে সাইটোপ্লাজম থাকে। এই জালকাকার ক্ষণপদ চলনে ও খাদ্য সংগ্রহে সাহায্য করে।

পুষ্টি ঃ পলিস্টোমেলা হোলোজয়িক প্রথায় পুষ্টিসাধন করে। ইহারা ডায়াটম, আদ্যপ্রাণী, জলজ লার্ভাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ইহারা জালের মতো ক্ষণপদ দ্বারা খাদ্যবস্তুকে ধরে। খাদ্যগ্রহণের সময় ক্ষণপদ হইতে প্রোটিন হজমকারী রস নি স্মৃত হয়। খাদ্যবস্তু সম্পূর্ণরূপে খোলকের বাহিরে পরিপাক হয় এবং পাচিত খাদ্যবস্তু সাইটোপ্লাজম স্রোতের মাধ্যমে অন্তঃপ্লাজমে প্রবেশ করে।

জনন ঃ জনন প্রধাণতঃ বহুবিভাজন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। যৌন ও অযৌন উভয় প্রক্রিয়াই দেখা যায়। পলিস্টোমেলার জীবনীচক্রে জনুক্রম দেখা যায়। বৃহদাকার গোলকের সহিত ক্ষুদ্রগোলকের পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ঘটে। পলিস্টোমেলা বৃহদাকার গোলকরূপে যৌন পদ্ধতিতে জনন করে ও অনেক ক্ষুদ্রগোলক পলিস্টোমেলা সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে, ক্ষুদ্রাকার

গোলক অযৌন উপায়ে জনন করে ও অনেকগুলি বৃহদাকার গোলক পলিস্টোমেলা সৃষ্টি হয়। ফলে, যৌন ও অযৌন উভয় প্রকার জননচক্র আবর্তিত হইয়া জীবনচক্র সম্পূর্ণ হয়।

ক্ষুদ্রাকার গোলক পলিস্টোমেলা ঃ ক্ষুদ্রগোলক পলিস্টোমেলাতে একটি পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত ছোট মধ্য প্রকোষ্ঠ বা প্রোলোকিউলাম থাকে। ক্ষুদ্র গোলকের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অনেকগুলি নিউক্লিয়াস থাকে, উহা ক্রেমিডিয়াল কণিকা দ্বারা আবৃত থাকে। ইহাদের সংখ্যা অনেক কম হয়, কারণ ইহারা যৌনজনন প্রক্রিয়ায় জননকোষের মিলনের ফলে সৃষ্টি হয়।ক্ষুদ্রাকার গোলক বহুবিভাজনে পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে। বংশবৃদ্ধির সময় সমগ্র সাইটাপ্লাজম খোলক হইতে বাহির হইয়া আসে এবং একটি পিণ্ডের সৃষ্টি করে। সাইটোপ্লাজম ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়। প্রতি টুকরো সাইটোপ্লাজম একটি ছোট নিউক্লিয়াসকে আবৃত করিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট অ্যামিবয়েড কোষের সৃষ্টি করে। এই অপত্য কোষকে অ্যামিবিউলি বলে। ইহার পর অ্যামিবিউলি মাতৃকোষ হইতে পৃথক হইয়া যায়, প্রতিটি কোষ একটি খোলক তৈরী করিয়া নিজেকে আবদ্ধ করে। এইসময় ইহারা বৃহৎগোলক সৃষ্টি করে, অর্থাৎ অপত্য বৃহৎগোলক পূর্ণাঙ্গ বৃহৎগোলক পলিস্টোমেলাতে পরিণত হয়।



চিত্র-21 পলিস্টোমেলার জীবনীচক্র

বৃহৎগোলক পলিস্টোমেলা ঃ বৃহৎগোলকে একটি পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট বড় মধ্য প্রকোষ্ঠ বা প্রোলোকিউলাম থাকে। ইহার সাইটোপ্লাজমের মধ্যে একটি মাত্র বড় নিউক্লিয়াস থাকে, উহা ক্রোমিডিয়াল কণিকা দ্বারা আবৃত থাকে। বৃহৎগোলক পলিস্টোমেলার সংখ্যা বেশী হয় কারণ বহুবিভাজন পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়। বৃহৎগোলক যৌনজনন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে।

জনন প্রক্রিয়ার সময় নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় অনেকগুলি ছোট ছোট নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। সাইটোপ্লাজম ছোট ছোট টুকরায় বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসকে ঘিরিয়া অপত্য কোষের সৃষ্টি করে। এই কোষগুলির প্রতিটি হইতে একজোড়া করিয়া ফ্লাজেলার উৎপত্তি হয়। ফ্লাজেলাযুক্ত কোষগুলিকে সমজননকোষ (**isogamete**) বলে। ইহার পর এই জননকোষগুলি খোলকের ছিদ্রপথ দিয়া সমুদ্রের জলে আসিয়া পড়ে। ইহার পর জননকোষগুলি কিছুক্ষণ স্বাধীনভাবে জলে সাঁতরাইয়া বেড়ায় এবং অবশেষে ইহাদের ফ্লাজেলাগুলি বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিভিন্ন মাতৃকোষ হইতে উৎপন্ন জননকোষগুলি মিলিত হয় ও জাইগোট সৃষ্টি হয়। জাইগোট একটি খোলক তৈরী করিয়া নিজেকে আবদ্ধ করে এবং অপত্য ক্ষুদ্রগোলক পলিস্টোমেলাতে পরিণত হয়। অপত্য ক্ষুদ্রগোলকের ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস প্রথমে মিওসিস ও পরে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় অনেকগুলি হ্যাপলয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। অবশেষে অপত্য ক্ষুদ্রগোলক বহু নিউক্লিয়াস ও বহু-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট পূর্ণাংগ ক্ষুদ্রগোলক পলিস্টোমেলাতে পরিণত হয়।

পলিস্টোমেলার জীবনচক্র ছকের সাহায্যে দেখান হইল।

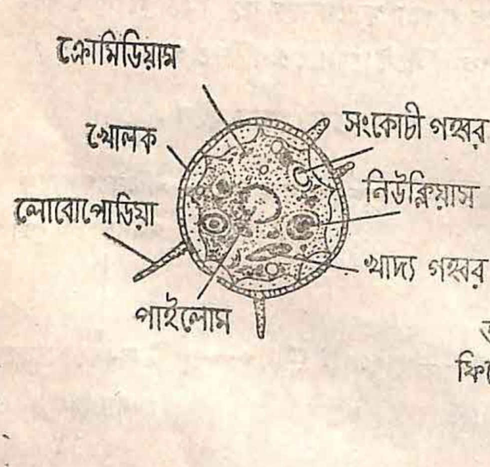
ক্ষুদ্রগোলক (n) ⟶ অ্যামিবিউলা ⟶ বৃহৎগোলক (n) ⟶ দ্বিফ্লাজেলাযুক্ত জননকোষ (n)
↑ ↓
—— মিওসিস প্রক্রিয়া ⟵ জাইগোট (2n) ⟵ দুইটি জননকোষের মিলন (2n)

ব্যতিক্রম ঃ কোন কোন প্রজাতিতে জনুক্রমের এই পর্যায়ক্রম ব্যাহত হয়। এইসকল প্রজাতির ক্ষেত্রে দেখা যায়, পর পর কতকগুলি বৃহৎ-

গোলকের বংশধারা বা জন্তু শুধুমাত্র অযৌন জননপদ্ধতিতে উদ্ভূত হয় এবং একসময় পুনরায় যৌন জনন পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র গোলকের আবির্ভাব ঘটে।

রাইজোপোডা ও অ্যাকটিনোপোডা সুপারশ্রেণীর কয়েকটি প্রাণীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

(i) পেলোমিক্সা (Pelomyxa) ঃ পেলোমিক্সা গণের অন্তর্গত প্রজাতিগুলি আকারে বড়। অ্যামিবার মধ্যে ইহারা বৃহত্তম আকারের হয়। ইহারা সাধারণতঃ কর্দমাক্ত জলাশয়ে, পচনশীল তরিতরকারীতে জন্মায়। ইহাদের ব্যাস সাধারণতঃ 2 মিলিমিটার হয়, কিন্তু পেলোমিক্সা ক্যারোলিনেনসিস প্রজাতির ব্যাস প্রায় 6 মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। প্রতি প্রজাতিতে অসংখ্য নিউক্লিয়াস থাকে, দুই হইতে এক হাজার পর্যন্ত নিউক্লিয়াস একটিমাত্র দেহকোষে থাকিতে পারে। সাইটোপ্লাজমে অনেক সংকোচী গহ্বর, সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য, খাদ্যগহ্বর ও বালুকণিকা দেখিতে পাওয়া যায় দেহের অংকীয়ভাগে অনেক ছোট ক্ষণপদ থাকে, ক্ষণপদগুলি আঠাল হয়। 'ইহাদের 'ইউবয়েড' বলে। সাধারণতঃ একটি দেহকোষ হইতে দুইটি অপত্যের সৃষ্টি হয়। যৌনজনন পদ্ধতিতে জননকোষের মাধ্যমে উভয় কোষের নিষেক হয়।





চিত্র-22 আরসেলা ভালগারিস, ইউগ্লাইফা

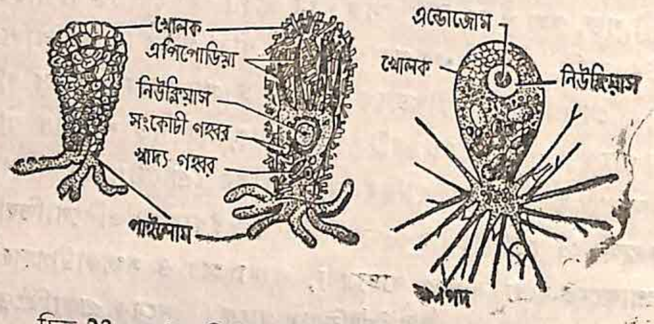
(ii) আরসেলা (Arcella) : ইহারা সাধারণতঃ জমিয়া থাকা জলাশয়ে বা আর্দ্র মাটিতে জন্মায়। ইহারা একপ্রকার রস নিঃসরণ করিয়া হলুদ, বাদামী, শক্ত, স্বচ্ছ ও চ্যাপ্টা খোলক গঠন করে। এই খোলক বা বহিরাবরণী প্রোটিন, বালি, লৌহ ও একপ্রকার কাইটিন দ্বারা গঠিত। এই আদ্যপ্রাণীর পৃষ্ঠভাগ গোলাকার, অঙ্কীয়ভাগে একটি ছোট গোলাকার মুখছিদ্র বা পাইলোম থাকে। এক হইতে ছয়টি সরু সরু আঙুলের মত শাখাযুক্ত বা শাখাহীন ক্ষণপদ মুখছিদ্র দ্বারা বাহির হয়। দেহের প্রোটোপ্লাজম বহিরাবরণীর সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রোটোপ্লাজমীয় তন্তু দ্বারা যুক্ত, ইহাদের এপিপোডিয়া বলে। অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য, খাদ্যগহ্বর ও সংকোচীগহ্বর থাকে। কোন কোন প্রজাতিতে দুইটি নিউক্লিয়াস থাকে। অনেক প্রজাতিতে 15 টির মত নিউক্লিয়াস থাকিতে পারে ; যেমন—অ্যামিবা পোডোফাইরা।

এই প্রজাতিগুলি দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে। একটি অপত্য কোষে পুরাতন বহিরাবরণী থাকে, অপর অপত্যকোষটি নতুন বহিরাবরণী গঠন করে। ইহারা অনেকসময় বহুবিভাজন পদ্ধতিতে জননকার্য সমাধান করে।

(iii) ইউগ্লাইফা (Euglypha) : ইহারা পরিষ্কার জলে বাস করে। ইহাদের দেহকোষের উপর পাতলা, ডিম্বাকৃতি লম্বা বহিরাবরণ বা খোলক গোলাকৃতি আঁইশ দ্বারা তৈয়ারী। আঁইশগুলি বালির দ্বারা তৈয়ারী একটি আর একটিকে কিছুটা আবৃত করিয়া রাখে। এই আঁইশগুলি প্রোটোপ্লাজম হইতে সৃষ্ট, দেহ কোষের বাহিরে আসিয়া খোলক গঠনে সাহায্য করে। এই খোলকের অগ্রপ্রান্তে বড় মুখছিদ্র বা **pylome** থাকে, মুখছিদ্রের নিকটবর্তী আঁইশে কণ্টক থাকে। দেহ হইতে সরু সরু ক্ষণপদ বাহির হয়, কিন্তু ক্ষণপদ জালের মতো আকার ধারণ করে না। অন্তঃপ্লাজমে একটি বা দুইটি নিউক্লিয়াস থাকে।

(iv) গ্লোবিজেরিনা (Globigerina) : গ্লোবিজেরিনা বুলয়েডস (G. bulloides) একটি সাধারণ পরিচিত প্রজাতি, ইহারা সামুদ্রিক, এমনকি 3000 ফ্যাদম গভীরতার দেখা যায়। দেহের বাহিরে ক্যালসিয়াম কার্বনেট নির্মিত খোলাক থাকে এবং অসংখ্য কণ্ঠক বহিঃগাত্রে থাকে। প্রকোষ্ঠগুলি অপেক্ষাকৃত সংখ্যায় কম, ছোট ও ডিম্বাকৃতি হয়। বহিঃপ্লাজমে গহ্বর থাকে, ফলে দেহকে হালকা করে ও জলে ভাসিতে সাহায্য করে। প্রাণীরা মারা

গেলে পরিত্যক্ত খোলককে গ্লোবিজেরিনা উজ (Ooze) বলে।



চিত্র 23 ক) ডিফিউজিয়া, খ) ক্ল্যামাইডোফিরিজ

(v) **অ্যালোগ্রোমিয়া (Allogromia)** ঃ দেহের বাইরের খোলকে ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র দ্বারা সাইটোপ্লাজম বাহিরে আসিয়া খোলককে আবৃত করে, অর্থাৎ খোলকটি ভিতরে চলিয়া যায়। ক্ষণপদগুলি লম্বা, সরু, শাখাযুক্ত এবং জালের আকার ধারণ করে, ও ক্ষণপদ খাদ্য সংগ্রহে সাহায্য করে।

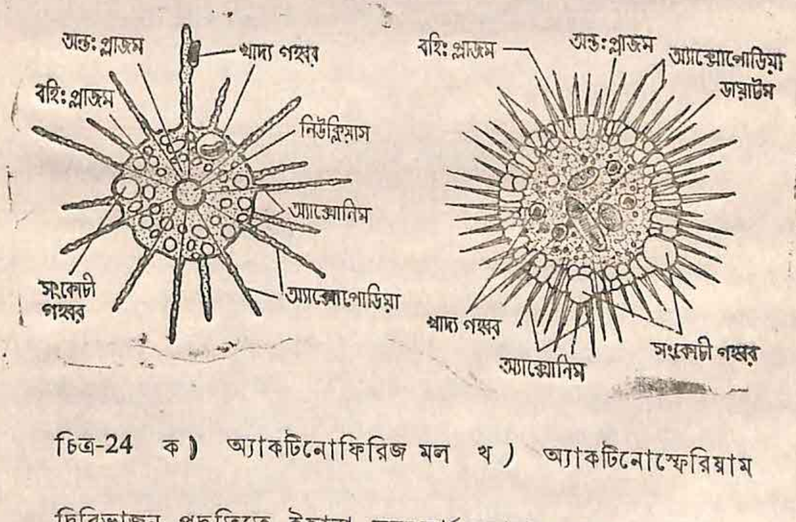
vi **মাইক্রোগ্রোমিয়া (Microgromia)** ঃ দেহকোষেব প্রোটোপ্লাজমে একটি নিউক্লিয়াস ও সংকোচীগহ্বর থাকে। প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরিয়া কাইটিন নির্মিত খোলক থাকে। খোলকের একটি বড় ছিদ্রের মাধ্যমে প্রোটোপ্লাজম বাহিরে আসিয়া সরু লম্বা শাখাযুক্ত ক্ষণপদ তৈরী করে। ইহারা দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে জননকার্য করে, অপত্য জীবগুলি পরস্পর যুক্ত থাকিয়া একটি কলোনী গঠন করে।

(vii) **ক্লামাইডোফিরিজ (Chlamydophrys)** ঃ ইহাদের আকৃতি মাইক্রোগ্রোমিয়ার মতো। ইহারা অন্তঃপরজীবিরূপে মানুষের বা স্তন্যপায়ীর অন্ত্রে বমি করে। দেহের গঠন ন্যাসপাতির মতো, বাহিরে কাইটিন নির্মিত খোলক থাকে। খোলকের একপ্রান্ত দ্বারা অসংখ্য সরু ক্ষণপদ বাহির হয়। ইহারা সাধারণতঃ দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে জননকার্য সম্পন্ন করে, অনেকসময় জননকোষ সৃষ্ট করিয়া যৌন জনন সমাধান করে।

(viii) **ডিফিউজিয়া (Diffugia)** ঃ ইহারা স্বাধীনজীবি। পরিষ্কার জলে, পুকুরে, ছোট নালা নর্দমা, জমিয়া থাকা জল, ভিজা মাটিতে বাস করে। ইহারা অনেকসময় বালি, ডায়াটম, স্পঞ্জের কণ্টক দ্বারা সুন্দর একটি বহিরাবরণী গঠন করে। খোলকের একপ্রান্ত সরু হয় এবং **pylome** নামে ছিদ্র

থাকে। এই ছিদ্র পথে প্রায় 10-12 টি সরু ক্ষণপদ বাহির হয়। অন্তঃপ্লাজমে খাদ্যগহ্বর ও সংকোচীগহ্বর থাকে। কেন্দ্রে অবস্থিত নিউক্লিয়াসকে ঘিরিয়া অণ্ডঃপ্লাজমের দানাদার অংশ থাকে। ইহারা আণুবীক্ষণিক জীবকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই প্রাণীর বর্ণ সবুজ হয়, কারণ প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে জুক্লোরেল্লা থাকে। ইহারা দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে।

(ix) অ্যাকটিনোফিরিজ (Actinophrys) ঃ এই গণের সাধারণ প্রজাতির নাম অ্যাকটিনোফিরিজ মল **(A. mol)** ইহারা পরিষ্কার জলে ভাসে বা জলাশয়ের নীচে মাটিতে অবস্থান করে, ইহাদের দেহ ·5 মিলিমিটার চওড়া, দেহস্থ প্রোটেপ্লাজম সুস্পষ্ঠভাবে বহিঃ ও অন্তঃপ্লাজমে বিভক্ত করা যায় না। অন্তঃপ্লাজমে কোন গহ্বর নাই, কিন্তু সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস ও খাদ্যগহ্বর থাকে। বহিঃপ্লাজমে অনেক ছোট ছোট গহ্বর থাকে, এবং দেহে একটিমাত্র বড় অংকোচীগহ্বর থাকে। দেহের চারিদিক হইতে অসংখ্য ছোট ছোট চুলের মতো সরু সরু ক্ষণপদ বাহির হয়। প্রতিটি ক্ষণপদের মধ্যে একটি শক্ত তন্তু অ্যাক্সোনিম থাকে, এই অ্যাক্সোনিমকে ঘিরিয়া সাইটোপ্লাজম থাকে।



চিত্র-24 ক) অ্যাকটিনোফিরিজ মল খ) অ্যাকটিনোস্ফেরিয়াম

দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে ইহারা জননকার্য সমাধান করে। বহিঃআবরনী গঠন করিয়া দুইটি জননকোষ তৈয়ারী করিয়া নিষেকের মাধ্যমে যৌনজনন করে। পরবর্তী পর্যায়ে বহিরাবরনী নষ্ট হইয়া নিষিক্ত নিউক্লিয়াস হইতে দুইটি অপত্য অ্যাকটিনোফিরিজের সৃষ্টি হয়।

(x) অ্যাকটিনোস্ফিরিয়াম (**Actinosphraeum**) ঃ অ্যাকটিনো ফিরিজের মতই ইহারা খোলকবিহীন, মিষ্টি জলের অধিবাসী, জলজ ভাসমান উদ্ভিদের সহিত লাগিয়া থাকিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। ইহার দেহের ব্যাস প্রায় এক মিলিমিটার হয় এবং একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে। প্রোটো প্লাজম বহিঃ ও অন্তঃপ্লাজমে বিভক্ত হয়। অন্তঃপ্লাজমে অনেক গহ্বর, একাধিক ছোট নিউক্লিয়াস এবং মিথোজীবি সবুজ শৈবাল থাকে। বহিঃপ্লাজম হইতে অ্যাক্সোনিম বাহির হয়। অ্যাক্সোনিমকে ঘিরিয়া সাইটোপ্লাজম থাকে এবং সরু সরু অসংখ্য ক্ষনপদের সৃষ্টি করে। ইহারা রটিকার, অ্যামিবাকে খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে।

ইহারা সাধারনতঃ অযৌন জনন পদ্ধতিতে বংশবিস্তারকরে। নিউক্লিয়াস দ্রুত অনেকভাগে বিভক্ত হয়, সাইটোপ্লাজম তত তাড়াতাড়ি বিভক্ত হইতে পারে না। ফলে দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে অনেকগুলি ছোট নিউক্লিয়াস লইয়া একটি অ্যাকটিনোস্ফিরিয়াম হইতে দুইটি অপত্যের সৃষ্টি করে।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রেণী ঃ ফাইটো ম্যাস্টিগোফোরা

এককোষী আদ্যপ্রাণীর মধ্যে অনেক প্রজাতির ফ্লাজেলা থাকে। ফ্লাজেলা প্রেটোপ্লাজম দ্বারা তৈরী, চলনে ও খাদ্য সংগ্রহে সাহায্য করে। ফ্লাজেলার মধ্যরেখা বরাবর এক শক্ত অংশ থাকে, তাহাকে অ্যাক্সোনিম বলে। অ্যাক্সোনিমকে ঘিরিয়া সাইটোপ্লাজমের আবরণী থাকে। আদ্যপ্রাণীর মধ্যে অসংখ্য ফ্লাজেলাযুক্ত আদ্যপ্রাণী পাওয়া যায়। ফ্লাজেলার সংখ্যা, আকৃতি অনুযায়ী ম্যাস্টিগোফোরা বিভিন্ন ধরনের হয়। যে সকল আদ্যপ্রাণী ফ্লাজেলার সাহায্যে চলাচল করে, তাহাদের ম্যাস্টিগোফোরা বলে।

ম্যাস্টিগোফোরা শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য ঃ

(i) দেহের বাহিরে একটি আবরণী থাকে, তাহাকে পেলিকল্ বলে।

(ii) ফ্লাজেলার সাহায্যে চলাফেরা করে, অনেক সময় ফ্লাজেলা দেহের সহিত যুক্ত থাকিয়া পাতলা পর্দার মতো আনডুলেটিং পর্দা গঠন করে।

(iii) দেহের বাহিরে সেলুলোজ, কাইটিন বা সিলিকার আবরণী থাকে।

(iv) লম্বভাবে দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে।

(v) বেশীরভাগ প্রাণীই স্বাধীনজীবি, পৃথকভাবে বা কলোণীগঠন করিয়া বাস করে।

(vi) দেহস্থ অন্তঃপ্লাজমে একটি নিউক্লিয়াস থাকে। মেগানিউক্লিয়াস থাকে না।

ইউগ্লিনা (Euglena) ঃ

ইউগ্লিনা একটি আনুবীক্ষনিক আদ্যপ্রাণী, ফ্লাজেলার মাধ্যমে চলাফেরা করে। ইহারা স্বাধীনজীবি এবং আদ্যপ্রাণীর মধ্যে ইউগ্লিনাকে আদিমতম মনে করা হয়। সাধারনতঃ 150 টি ইউগ্লিনার নাম করন হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের গঠন বৈচিত্র্য, আকৃতি, আয়তন, স্বভাব আলাদা। ইউগ্লিনা ভিরিডিস, ইউগ্লিনা ওরিয়েন্টালিস সাধারনতঃ ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়। ইহাদের পরীক্ষাগারে চাষ করা যায়। গোবর বা ঘোড়ার মল পরিস্রুত জলে ফুটাইয়া কিছু ইউগ্লিনা সমেত পুকুরের জল মেশান হয়। কয়েক দিন পরে ঐভাবে ইউগ্লিনা বংশবৃদ্ধি করে।

ইউগ্লিনার মধ্যে উদ্ভিদকোষের মতো সবুজ কণিকা ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। ইহার ফলে ইউগ্লিনা সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাদ্য তৈয়ারী করে এবং

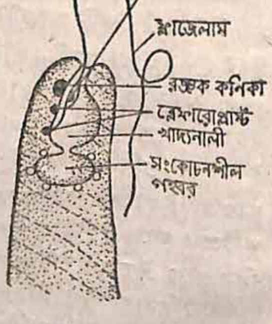
প্রয়োজনীয় পদার্থ জল হইতে শোষণ করে। নিচে ইউগ্লিনা ভিরিডিসের আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রাণীজগতে অবস্থান ঃ পর্ব ঃ সারকোম্যাষ্টিগোফোরা
উপপর্ব ঃ ম্যাষ্টিগোফোরা
শ্রেণী ঃ ফাইটোম্যাষ্টিগোফোরা
বর্গ ঃ ইউগ্লিনিডা।
গণ ঃ ইউগ্লিনা
প্রজাতি ঃ ইউগ্লিনা ভিরিডিস

খাদ্য ও অবস্থান ঃ ইউগ্লিনা আদ্যপ্রাণীর একটি সাধারণ উদাহরণ। ইহারা স্বাধীনজীবি, পুষ্করিণীর জলের উপরিতলে প্রচুর ইউগ্লিনা ভিরিডিস পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া জমে থাকা জল, খানা, ডোবা, নোংরা বদ্ধ জলাভুমিতে, পচা, গলিত নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব যৌগে এবং প্রাণীর মলমূত্রে ইউগ্লিনা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকসময় কোন কোন জলাশয়ে প্রচুর ইউগ্লিনা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন পুকুরের উপরিতল সবুজবর্ণের হয়। এমনকি ইউগ্লিনার কোন কোন প্রজাতি কাদা, ভিজা মাটি, বরফ, ব্যাঙাচির ত্বক এবং ক্রাসটেসিয়ার দেহত্বকে থাকে। ইহারা হোলাফাইটিক ও স্যাপ্রোফাইটিক প্রথায় পুষ্টিসাধন করে।

গঠন ঃ ইউগ্লিনা আণুবীক্ষণিক জীব। ইহারা দৈর্ঘ্যে 50 হইতে 100 মাইক্রন পর্যন্ত হইতে পারে। ইউগ্লিনা ভিরিডিস 55 মাইক্রন লম্বা এবং 15 মাইক্রন চওড়া হইতে পারে। ইউগ্লিনা গ্রেসিলিসের দৈঘ্য 200 মাইক্রা এবং ইউগ্লিনা অক্সিইউরিস 500 মাইক্রন পর্যন্ত লম্বা হইতে পারে। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ইউগ্লিনা মিনিমের দৈঘ্য 25 হইতে 50 মাইক্রন হয়। ইউগ্লিনা নিম্নলিখিত অংশগুলি লইয়া গঠিত।

(i) পেলিকল ঃ ইউগ্লিনার দেহের মধ্যভাগ মোটা এবং দুইপ্রান্ত সরু হয়। দেহের বাহিরে একটি পাতলা, নমনীয় কিউটিকলের আবরণী থাকে, তাহাকে পেরিপ্লাস্ট বা পেলিকল্ বলে। পেলিকল্ ইউগ্লিনার একটি নির্দ্দিষ্ট আকৃতি বজায় রাখে। পেলিকল বহিঃসাইটোপ্লাজম অংশ হইতে তৈয়ারী হয়। পেলিকলের নীচে সর্পিলাকার বা মায়োনিম সূত্র থাকে। এই মায়োনিম সূত্রগুলি সংকোচনশীল।



চিত্র-25 ইউগ্লিনার অগ্রপ্রান্ত

মায়োনিম স্থত্রগুলির সংকোচন প্রসারণের ফলে ইউগ্লিনার আকৃতি কিছুটা পরিবর্তিত হইতে পারে। chadefaude এর মতে পেলিকল্ বাহিরে এপিকিউটিকল ও পুরু অন্তঃকিউটিকল দ্বারা তৈয়ারী। ক্ল্যামাইডোমোনাস, প্লুরোকক্কাসের মত ইউগ্লিনার সেলুলোজ প্রাচীর নাই। ইহা প্রোটিনজাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত।

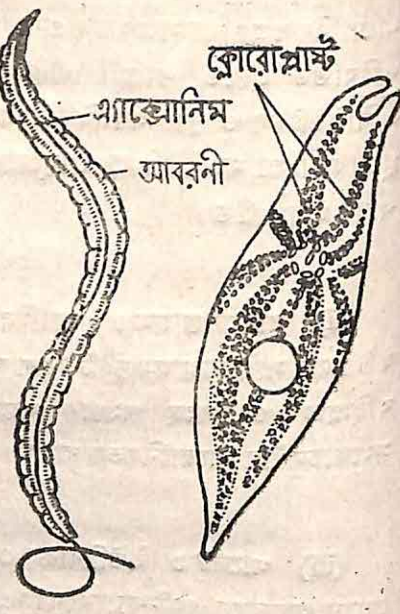
(ii) **সাইটোপ্লাজম ঃ** অ্যামিবা বা অন্যান্য এককোষী প্রাণীর মতো ইউগ্লিনার সাইটোপ্লাজম দুইটি অংশ দ্বারা গঠিত। বাহিরের সাইটোপ্লাজমকে বহিঃপ্লাজম ও অন্তঃস্থ অংশকে অন্তঃপ্লাজম বলে। বহিঃপ্লাজমের বাহিরে সংকোচনশীল মায়োনিমতন্তু থাকে।

(iii) **গালেট ঃ** ইউগ্লিনার দেহের অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত ভোঁতা। দেহের অগ্রভাগে একটি ফ্যানেলের মতো অংশ থাকে, ইহাকে cell mouth বা সাইটোজোম বলে। সাইটোজোম হইতে ফ্লাস্কের মতো অংশ দেহস্থ সাইটোপ্লাজমে নামিয়া আসে, ইহাকে সাইটোক্যারিংক্স বা গালেট বলে। গালেট পশ্চাত্ অংশে একটি গহ্বর বা reservoir এর স্বষ্টি করে। ইউগ্লিনা দেহে খাদ্য তৈয়ারী করে এবং তরল খাদ্য দেহের বহিরাবরণ দ্বারা পোষণ করে।

(iv) **স্টিগমা ঃ** গালেটের নীচে একদিকে একটি বড় রক্তককণিকা থাকে, ইহাকে **pigment spot** বা স্টিগমা বলে। ইহা উজ্জ্বল লাল বর্ণের হয়। **Leedale (1966)** এর মতে ইহার মধ্যে তৈলাক্ত পদার্থ থাকে এবং লালবর্ণের ক্যারোটিনয়েড থাকে। ইহার মধ্যে হিমাটোক্রোম নামে আলোকসংবেদী কণিকা থাকে। এই কণিকা ধাত্র পদার্থের মধ্যে কণিকার আকারে বর্তমান থাকে।

(v) **সংকোচী গহ্বর ঃ** গালেটের নীচে একটি বড় সংকোচী গহ্বর থাকে। এই সংকোচীগহ্বরের চারিদিকে কতকগুলি সংকোচীনালীযুক্ত থা.ক। গালেটের মধ্যে সংকোচীগহ্বর বর্জ্যদ্রব্য মুক্ত করে।

(vi) ফ্লাজেলা ঃ ইউগ্লিনার অগ্রপ্রান্তে সাইটোপ্লাজম দ্বারা সৃষ্ট একটি লম্বা ফ্লাজেলা থাকে। ইহা গালেটের অন্তঃস্থ প্রাচীর হইতে সর্পিলকারে উৎপন্ন হয়। ফ্লাজেলার মধ্যে একটি লম্বা মধ্যঅক্ষীয় সূত্র থাকে, এই সূত্রের বাহিরের দিকে প্রোটোপ্লাজমের আবরণী থাকে। ইউগ্লিনা ভিরিডিসের অক্ষীয় সূত্র দুইটি ফাইব্রিল দ্বারা গঠিত এবং ইউগ্লিনা গ্রেসিলিসির এই অক্ষীয় সূত্র নয়টি ফাইব্রিল দ্বারা গঠিত। সংকোচীগহ্বরের বিপরীত প্রান্তে গালেটের ভিতরের গাত্রে অবস্থিত দুইটি কাইনেটোসোম বা বেলে-ফেরোপ্লাস্ট হইতে দুইটি ফ্লাজেলা উৎপন্ন হয়। উৎস স্থলের পরেই দুইটি ফ্লাজেলা পরস্পর যুক্ত হইয়া একটি সাধারণ ফ্লাজেলা গঠন করে। বেলেফেরোপ্লাষ্ট সাইটোপ্লাজম দ্বারা আবৃত থাকে, প্রকৃতপক্ষ্যে ইহা কোষের সেণ্ট্রাজোম। বেলেফেরোপ্লাস্ট একদিকে ফ্লাজেলাকে ধরিয়া রাখে এবং অপর দিকে ইহা কোষের মাইটোসিস বিভাজনে অংশ গ্রহণ করে। ফ্লাজেলার উৎসস্থলের নিকটে যে কোন সূত্র একটি প্যারা ফ্লাজেলার বডি থাকে, ইহা আলোকসংবেদী। **'Chadefaud'** এবং **'Provasoli'** এর মতে প্যারাফ্লাজেলার বডি এবং স্টিগমা মিলিত-ভাবে আলোকসংবেদী যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। ফ্লাজেলার একপ্রার্শ্বে, উভয়-পার্শ্বে বা অগ্রভাগে সূক্ষ্ম তন্তু ফ্লিমার থাকে।



চিত্র-26 ইউগ্লিনায় ফ্লাজেলাম ও ক্লোরোপ্লাষ্টের গঠন

(vii) নিউক্লিয়াস ঃ ইউগ্লিনার দেহের মধ্যবর্তী অংশে বা অপেক্ষাকৃত পশ্চাতঅংশে একটি ছোট গোলাকার নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রে একটি এণ্ডোজোম থাকে। এণ্ডোজোম ও নিউক্লিয়পর্দার মধ্যবর্তী অংশে ক্রোমাটিন কণিকা থাকে।

(viii) **রঞ্জককণিকা ঃ** ইউগ্লিনার দেহে সবুজ কণিকা ক্লোরোফিল থাকায় ইহাদের বর্ণ সবুজ হয়। ক্লোরোফিলের উপস্থিতির জন্য উদ্ভিদবিজ্ঞানী-গণ ইউগ্লিনাকে শৈবালের মধ্যে শ্রেণী ক্লোরোফাইসির মধ্যে অন্তর্ভূ'ত করিয়াছেন। ইউ (eu-true), গ্লিন (glene-eyepupil), অর্থাৎ আলোকসং-বেদী ষ্টিগমা থাকায় ইহাদের গণ নাম ইউগ্লিনা করা হইয়াছে। ভিরিডিস্ অর্থ সবুজ সেজন্য সবুজ ইউগ্লিনার বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হইয়াছে ইউগ্লিনা ভিরিডিস্। ইউগ্লিনা রুবরা প্রজাতিতে ক্লোরোফিল থাকা সত্ত্বেও লাল বর্ণের কণিকা থাকে। এই লালবর্ণের সমস্ত কোষ জুড়িয়া অবস্থান করে অথবা একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকে। ক্লোরোফিল কণা অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে ক্রোম্যাটোফোরের মধ্যে অবস্থান করে। ক্রোম্যাটোফোরের গঠন, আকৃতি, আয়তন ও অবস্থানের প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন রকমের হয়। ক্রোমাটোফোর ফিতার মতো, চাকতির ন্যায়, সূত্রাকারে বা ডিম্বাকৃতি হইতে পারে। ইহারা নিয়মিতভাবে বা বিক্ষিপ্তভাবে অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে অবস্থান করে। ক্রোম্যা-টোফোরের মধ্যে ছোট ছোট বর্ণহীন অঞ্চলকে পাইরেনোফোর বলে। এই পাইরেনোফোর দ্বিউওল, একটি প্রোটিনজাত বস্তু পাইরিনয়েড দ্বারা আবৃত। এই পাইরিনয়েড একটি আবরণীদ্বারা আবৃত, ইহাকে প্যারামাইলাম বলে। প্যারামাইলাম একপ্রকারে শর্করাজাতীয় পদার্থ, ইহারা অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে ছড়ান অবস্থায় থাকে। ইউগ্লিনার ক্লোরোফিলে বেশী কার্বন, হাইড্রোজেন ও অল্পপরিমাণে নাট্রোজেন, ম্যাগনেসিয়াম থাকে।

গমন ঃ ইউগ্লিনা নিম্নলিখিত দুইরকম পদ্ধতিতে গমন করে।

(i) **ফ্লাজেলা দ্বারা গমন ঃ** ফ্লাজেলা দ্বারা গমনের কোনরকম সত্যকার তত্ত্ব এখনও পর্যন্ত জানা যায় নাই। এইরূপ গমন সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম মতবাদ আছে। 'Butschli' এই গমন সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার মতানুসারে ফ্লাজেলা অনেকবার আড়াআড়িভাবে নড়াচড়া করে ফলে দেহের সহিত সমকোণে জলের উপর চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপের ফলে শক্তি দুইদিকে বিভক্ত হয়। একটি শক্তি সমান্তরালভাবে কার্য করে এবং আর একটি শক্তি দেহের অক্ষের সহিত সমকোনে কার্য করে। প্রথম শক্তিটি ইউগ্লিনাকে সামনের দিকে যাইতে সাহায্য করে। তখন দ্বিতীয় শক্তিটি দেহকোষটিকে উহার অঘট বরাবর ঘুরিতে সাহায্য করে।

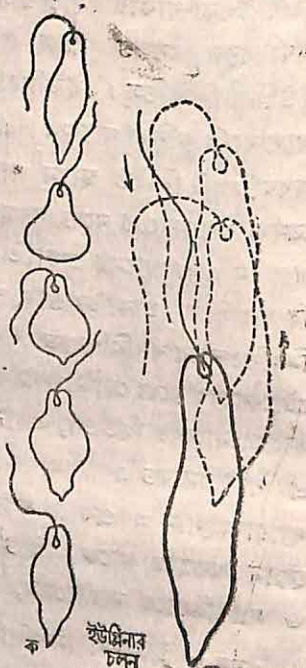
Gray (1928) এর মতে ফ্লাজেলামের ত্বরাণিত চলনের ফলে ইউগ্লিনা

গমন করিতে পারে। ফ্লাজেলামের গোড়া হইতে অগ্রপ্রান্ত পর্যন্ত অনেক তরংগ বহিয়া যায়। এই তরংগের ফলে ফ্লাজেলাম বতু'লাকারে ঘোরে। ইউগ্লিনা সরলরেখা বরাবর ঘুরিতে থাকে ও সামনের দিকে অগ্রসর হয়। এই পদ্ধতিতে গমনের ফলে ইউগ্লিনা সেকেণ্ডে 5মিলিমিটার দূরত্ব যায়।

পার্শ্বীয় তন্তুর সংকোচনের ফলে ফ্লাজেলাম নড়াচড়া করে। সংকোচনের জন্য প্রয়োজনীয় ম্যাইটোকনড্রিয়ার মধ্যে অবস্থিত এটিপি অণু সরবরাহ করে। এই মাইটোকনড্রিয়া বেলেফেরোপ্লাস্টের মধ্যে থাকে।

(ii) ইউগ্লিনয়েড চলন : এই পদ্ধতিতে দেহকোষের প্রোটোপ্লাজম, পেলিকল ও মায়োনিম তন্তু ক্রমান্বয়ে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। এই সংকোচনের ফলে উদ্ভূত তরঙ্গ দেহের অগ্রপ্রান্ত হইতে পশ্চাদ প্রান্তে অগ্রসর হয় ফলে ইউগ্লিনা সামনের দিকে অগ্রসর হয়।

পুষ্টি : যে পক্রিয়ায় খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, পাচিত খাদ্যবস্তু শোষণ ও অপাচ্য খাদ্যবস্তু বর্জন করা হয় তাহাকে পুষ্টি বা nutrition বলে।

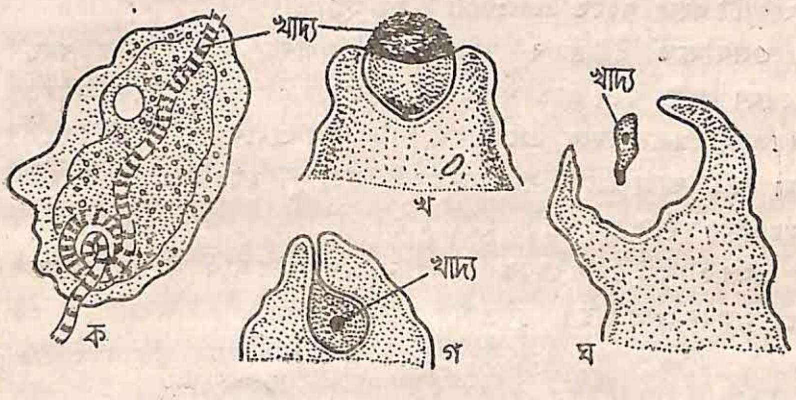


চিত্র-27 ইউগ্লিনার চলন

ইউগ্লিনা হোলোফাইটিক ও স্যাপ্রোফাইটিক প্রথায় পুষ্টিসাধন করে। অন্যান্য এককোষী প্রাণীর মতো হোলোজয়িক প্রথায় পুষ্টি সাধন করে না। তবে কিছু কিছু স্বাধীনজীবি ফ্লাজেলেট এই প্রথায় পুষ্টি সাধন করে (চিত্র-28)

(i) **হোলাফাইটিক পুষ্টি :** ইউগ্লিনা প্রধানতঃ হোলোফাইটিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের ন্যায় পুষ্টিসাধন করে। ইউগ্লিনা উদ্ভিদের মতো কার্বনডাই-অক্সাইড সংগ্রহ করে। উদ্ভিদের মতো ইউগ্লিনা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে, ইহাকে প্যারামাইলাম বলে। অতিরিক্ত খাদ্য দানারূপে অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে বা প্রোটিনকণা পাইরিনয়েডের চারিপাশে থাকিয়া ভবিষ্যতের খাদ্য

হিসাবে সঞ্চিত থাকে। যথার্থ শ্বেতসার হইতে ইহার পার্থক্য এই যে আয়োডিনের সংস্পর্শে নীলবর্ণ ধারণ করে না।



চিত্র-28 হলোজয়িক পুষ্টির বিভিন্নদশা

(ii) স্যাপ্রোফাইটিক পুষ্টি ঃ যে জল মৃত, পচা-গলা জৈব পদার্থ দ্বারা পূর্ণ হয়, সেই জলে ইউগ্লিনা হোলোফাইটিক প্রথায় পুষ্টি সাধন করিতে পারে না। ইউগ্লিনা সেইসময় স্যাপ্রোফাইটিক প্রথায় পুষ্টিসাধন করে। স্যাপ্রোফাইটিক প্রথায় ইউগ্লিনা দেহত্বক দ্বারা খাদ্য শোষণ করে।

বেশীরভাগ বৈজ্ঞানিকের মতে, ফ্লাজেলার সঞ্চালনের জন্য অনেক ছোট ছোট খাদ্যবস্তু গালেটের মধ্যে আসিয়া পড়ে।

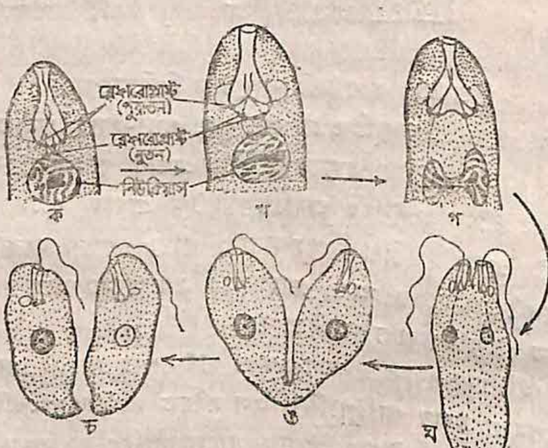
শ্বসন ঃ ইউগ্লিনা সবাত প্রক্রিয়ার শ্বসন কার্য সম্পন্ন করে। শ্বসণের সময় ইউগ্লিনা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পারিপার্শ্বিক জল হইতে অর্ধভেদ্য পেলিকল দ্বারা অক্সিজেন শোষণ করে। দিনের বেলায় সালোকসংশ্লেষের সময় ইউগ্লিনা জলে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন মুক্ত করে। এই অক্সিজেন দেহের বিভিন্ন অংশে জারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

রেচন ঃ বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে ইউগ্লিনা নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্যপদার্থ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় দেহের বাহিরে নির্গত করে। কিছু বর্জ্যদ্রব্য সংকোচী গহ্বর দ্বারা একটি প্রকোষ্ঠ বা **reservor** এ যুক্ত হয়। **'chadefaud'** এর মতানুসারে সংকোচী গহ্বর বিশেষ দানাদার বর্জ্যসাইটোপ্লাজম দ্বারা আবৃত থাকে। এই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট সহকারী গহ্বরের সৃষ্টি হয় এবং এই গহ্বর গুলি পরস্পর যুক্ত হইয়া একটি বড় সংকোচী গহ্বর সৃষ্টি করে। ক্রমে ক্রমে এই সংকোচী গহ্বর জল ও নাইট্রোজেন জাতীয়

বর্জ্যপদার্থ দ্বারা পূর্ণ হয় ও আয়োতনে বড় হয়। অবশেষে reservoir এর কাছে আসিয়া ফাটিয়া যায় এবং জল ও নাইট্রোজেনজাতীয় বর্জপদার্থ সংকোচী গহ্বর হইতে reservoir এ মুক্ত হয়।

জলসাম্য ঃ ইউগ্লিনার দেহকোষের লবণের ঘনত্ব জলের ঘনত্ব অপেক্ষা বেশী, ফলে এণ্ডোঅসমোসিস প্রক্রিয়ায় জল পারিপার্শ্বিক জলাশয় হইতে ইউগ্লিনার দেহে প্রবেশ করে। এই জল প্রথমে ছোট ছোট গহ্বরে জমা হয়। ডায়াষ্টোলের সময় গহ্বর জল দ্বারা পূর্ণ হয় এবং সিস্টোলের সময় গহ্বর হইতে জল বাহির হইয়া যায়।

জনন ঃ ইউগ্লিনার ক্ষেত্রে যৌনজনন দেখা যায় না। ইহাদের ক্ষেত্রে অযৌন জনন দেখা যায়। দুইপ্রকার অযৌনজনন হয়।



চিত্র-29 ইউগ্লিনার দ্বিবিভাজন—ক-গ—দেহের অগ্রাংশের ও নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘ-চ—অপত্য কোষের গঠন দশা।

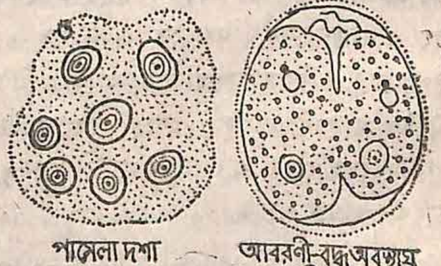
i) অনুদৈর্ঘ্য দ্বিভাজন ঃ অনুকূল অবস্থায় অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য তাপ ও জলের উপস্থিতে ইউগ্লিনা দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়ায় জননকার্য সম্পাদন করে। দ্বিবিভাজনের সময় ইউগ্লিনা নিশ্চল হইয়া পড়ে এবং ফ্লাজেলা গুটাইয়া লয়। এই বিভাজনের সময়, প্রথমে ব্লেফেরোপ্লাস্ট দুইটি ভাগে বিভক্ত হয় এবং উহা একটি মাকুর ন্যায় অক্ষের সহিত আটকাইয়া থাকে। ইহার পর নিউক্লিয়াস মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া যায়। এই বিভাজনের পূর্বে নিউক্লিয়াসটি দেহের মাতৃস্থান হইতে সরিয়া আসিয়া

অগ্রভাগে ফ্লাজেলার পাদদেশে অবস্থান করে। ইহার পর ইউগ্লিনার দেহকোষটি **reservoir** হইতে অনুদৈঘ্য বরাবর দুইভাগে বিভক্ত হয়। বিভাজনের পরে অপত্য ইউগ্লিনা দুইটি পুনরায় নতুন **reservoir,** অক্ষিবিন্দু 3 বেলেফেরোপ্লাস্ট সৃষ্টি করে এবং পূর্ণাংগ ইউগ্লিনাতে পরিণত হয়।

এইসময় প্রতিটি অপত্য ইউগ্লিনার একটি করিয়া নতুন ফ্লাজেলাম সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোনকোন সময় মাতৃদেহকোষের ফ্লাজেলামটি একটি অপত্য ইউগ্লিনা গ্রহণ করে এবং অপর অপত্য ইউগ্লিনা নূতন ফ্লাজেলাম গঠন করে।

(ii) **বহুবিভাজন ঃ** আবরণীবদ্ধ অবস্থায় ইউগ্লিনার বহুবিভাজন ঘটে। অনেকগুলি আববণীবদ্ধ ইউগ্লিনা পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসে, এবং ইহাদের ফ্লাজেলাম খসিয়া পড়ে। এই সময় ইউগ্লিনা নিশ্চল হইয়া পড়ে এবং গোলাকার আকার ধারণ করে। প্রতিটি ইউগ্লিনা সেলুলোজ দ্বারা সিস্ট বা আবরণী গঠন করিয়া নিজেকে আবদ্ধ করে। ইহার পর আবরণীবদ্ধ ইউগ্লিনা প্রথমে অনুদৈর্ঘ্য দ্বিবিভাজন দ্বারা বিভাজিত হয় এবং দুইটি অপত্য ইউগ্লিনাতে পরিণত হয়। কিন্তু কোন একটি বিশেষ অবস্থায় এই অপত্য ইউগ্লিনা দুইটি বহুবিভাজন প্রক্রিয়ায় সিস্টের মধ্যে বিভাজিত হয়। ফলে একটিমাত্র সিস্টের মধ্যে 16 হইতে 22টি পর্যন্ত অপত্য ইউগ্লিনার সৃষ্টি হয়। বহু অপত্য ইউগ্লিনা বিশিষ্ট সিস্টকে **পামেলা (Palmella)** দশা বলে। অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলে সিস্টের প্রাচীর বিদীর্ণ হয় এবং অপত্য ইউগ্লিনা সিস্ট হইতে বাহির হইয়া আসে। এই অপত্য ইলগ্লিনা ফ্লাজেলা সৃষ্টি করিয়া পূর্ণাংগ ইউগ্লিনাতে পরিণত হয়।

আবরণীবদ্ধতা ঃ প্রতিকূল পরিবেশে অর্থাৎ উপযুক্ত খাদ্য ও জলের অভাবে ইউগ্লিনা আবরণীবদ্ধ হয়। আবরণীবদ্ধতার সময় প্রাণীটি নিশ্চল হইয়া পড়ে। এইসময় ফ্লাজেলাম দেহের মধ্যে গুটাইয়া লয় বা খসিয়া পড়ে এবং ইউগ্লিনা গোলাকার আকার ধারণ করে। এণ্টামিবার চারি-



চিত্র-30 পামেলা দশা ও আবরণীবদ্ধ অবস্থায় বিভাজন

ধারে সুরক্ষিত প্রাচীর তৈরী হয় এবং তাহা দ্বারা নিজেকে আবৃত করে। এই প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ অবস্থাকে সিস্ট্ বলে। হিমোটোক্রোম নামক একপ্রকার রঞ্জক কণিকা থাকায় সিস্টে্র বর্ণ লাল হয়।

আবার অনুকূল অবস্থা ফিরিয়া আসিলে সিস্টের প্রাচীর বিদীর্ণ হয় এবং অপত্য ইউগ্লিনা বাহিরে চলিয়া আসে। নিউক্লিয়াসের বিভাজন আবরণীবদ্ধ অবস্থায় ঘটিয়া থাকে।

উত্তেজিতা ঃ ইউগ্লিনা আলোকের অনুভূতি গ্রহণ করিতে সক্ষম এবং ইহার উত্তেজনা আলোক রশ্মির তীব্রতার উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ ইহারা আলোকরশ্মির সহিত সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয় এবং আলোকের উৎসের দিকে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ ইহাদের আলোক অনুকূলবর্তী গমন দেখা যায়। অক্ষবিন্দু ও ফ্লাজেলার গোড়ায় অবস্থিত লেনস্ (optic lens) আলোক অনুভূতি গ্রহণ করে।

ইউগ্লিনা বিভিন্নরকম **রাসায়নিক পদার্থ যথা অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, তাপ** প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিলে উত্তেজিত হয়।

ঃ কয়েকটি ইঁউগ্লিনার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

(i) ইউগ্লিনা স্পাইরোগাইরা (Euglena spirogyra) ঃ ইউগ্লিনার এই প্রজাতি আকারে বড়, 10 মাইক্রন লম্বা ও 18 মাইক্রন চওড়া হয়। দেহটি লম্বা ও মাকুর ন্যায়, পশ্চাতে একটি সরু মতো অংশ থাকে। পেলিকলের উপর দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, বাহিরে মিউসিলেস্ ও ফেরিক হাইড্রক্সাইড নির্মিত আবরনী থাকে। দেহে অসংখ্য ছোট চ্যাপ্টা ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। পাইরিনয়েড থাকে না। দেহস্থ সাইটোপ্লাজম 2টি বড় ও অসংখ্য ছোট প্যারা-মাইলন কণিকা থাকে।

(ii) ইউগ্লিনা গ্রেসিলিস (Euglena gracilis) ঃ এই প্রজাতি মাকুর মতো, আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। দেহে বড় ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে, ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে প্রোটিন কণা পাইরিনয়েড থাকে। সাইটোপ্লাজোমে অসংখ্য ছোট প্যারামাইলন কণিকা থাকে।

ট্রাইপেনোসোমা গামবিএনস (ডাটন–১৯০২)
(Trypanosoma gambiense) (Dutton-1902)

ফোর্ড 1902 সালে গাম্বিয়াতে একজন ঘুমরোগাক্রান্ত ইউরোপীয়ানের মধ্যে কৃমি আকৃতির জীবাণু প্রথমে দেখিতে পান। ঐ বৎসরেই ডাটন ইংলণ্ডে এধরনের রোগীর রক্তে সেই জীবাণু দেখিতে পান এবং **ইহাকে ট্রাইপেনোসমা (tryponosoma) নামকরণ করেন।** ক্যাসেটেলানি **(1903)** সালে ঘুম রোগ আক্রান্ত রোগীর সুষুম্নারসে এই জীবাণু দেখিতে পান। ব্রুস এবং নাবারো (1903) এবং ক্লিন (1909) আবিষ্কার করেন যে সিট্‌সি (Tsetse) মাছি দ্বারা এই রোগের সংক্রামিত হয়। সিট্‌সি মাছি ট্রাইপেনোসোমার গৌন পোষক।

ভৌগলিক অবস্থান ঃ ট্রাইপেনোসোমা গামবিএনস্ সাধারণতঃ পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাণীজগতে অবস্থান ঃ পর্ব ঃ সারকোম্যাষ্টিগোফোরা
উপপর্ব ঃ ম্যাষ্টিগোফোরা
শ্রেণী ঃ জুম্যাষ্টিগোফোরা
বর্গ ঃ কাইনেটোপ্লাসটিডা
গণ ঃ ট্রাইপেনোসোমা
প্রজাতি ঃ ট্রাইপেনোসোমা গামবিএনস্

স্বভাব ও বাসস্থান ঃ ইহা সকল প্রকার মেরুদণ্ডী প্রাণী যথা—মানুষ, গৃহপালিত জন্তু, হরিণজাতীয় প্রাণীর রক্তে পরজীবি হিসাবে বাস করে। মানুষের ক্ষেত্রে রক্তে ও লসিকাগ্রন্থির মধ্যে দেখা যায়। ঘুম রোগে আক্রান্ত হইলে ইহাদের মস্তিকের সুষুম্না রসের মধ্যে দেখা যায়। ইহা মস্তিষ্ক ও লসিকাগ্রন্থিকে আক্রমণ করে। এই পরজীবি প্রাণী দুইটি কোষের মধ্যবর্তী অংশে অবস্থান করে।

গঠন ঃ ইহা আণুবীক্ষণিক জীব, দুইটি প্রান্ত ক্রমশঃ সরু হইয়া যায়, 15-35 মাইক্রন লম্বা এবং 1·5 হইতে 3·5 মাইক্রন চওড়া হয়। ইহার নিউক্লিয়াসটি বড়, ডিম্বাকার এবং দেহের মধ্যস্থানে অবস্থান করে। এই নিউক্লিয়াসটি দুইটি সছিদ্র নিউক্লিয়ার পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। নিউক্লিয়াসের নিকটে ব্লেফেরোপ্লাষ্ট বা বেসালকণিকা থাকে। ব্লেফেরোপ্লাষ্ট হইতে ফ্লাজেলা উৎপন্ন হয়। ফ্লাজেলা দেহের সহিত যুক্ত হইয়া পাতলা পর্দা গঠন করে,

ইহাকে undulating পর্দা বলে। এই পর্দা হইতে ফ্লাজেলা অগ্রপ্রান্তে মুক্ত হয়। আনডুলেটিং পর্দায় বহুসংখ্যক ভাঁজ থাকে, ভাঁজের সংখ্যা পরজীবীর দেহের দৈর্ঘ্যের সহিত সমানুপাতিক। কাইনেটোপ্লাস্ট দেহের পশ্চাদপ্রান্তে থাকে এবং আকারে ছোট হয়। কাইনেটোপ্লাস্টের এর মধ্যে ডি. এন. এ থাকে। অনেক সময় সাইটোপ্লাজমের **ভলিউটিন কণা** থাকে, ভলিউটিন কণা পরিপাকে সাহায্য করে এবং ভবিষ্যত্যের জন্য খাদ্য হিসেবে সঞ্চিত থাকে। দেহের বহিরাবরণকে পেলিকল বলে। পেলিকল স্থিতিস্থাপক পাতলা এবং দেহকে সুরক্ষিত রাখে। পরজীবী আদ্যপ্রাণী ফ্লাজেলা এবং আনডুলেটিং পর্দার সাহায্যে সক্রিয়ভাবে চলাচল করে।

জীবনচক্রের বিভিন্ন দশায় পরজীবীর বিভিন্নরকম আকার ও আয়তন হয়। ইহারা দুইরকমের হয় ;

যেমন **(a) খর্বাকৃতি ট্রাইপেনোসোমা ঃ** ইহারা ছোট ও মোটা হয়। এই ছোট আকৃতি ট্রাইপেনোসোমাতে ফ্লাজেলা থাকে না বা খুব ছোট হয়। ইহাদের ক্ষুদ্র খর্বাকৃতি (shorf stumpy) ট্রাইপেনোসোমা বলে।

(b) লম্বাকৃতি ট্রাইপেনোসোমা ঃ ইহারা পাতলা ও সরু হয়, একটি লম্বা ফ্লাজেলা থাকে। ইহা ছাড়াও বিভিন্নরকমের মধ্যবর্তী অবস্থা পাওয়া যায়। এই বহুরূপতা বা **polymorphism** ট্রাইপেনোসোমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।



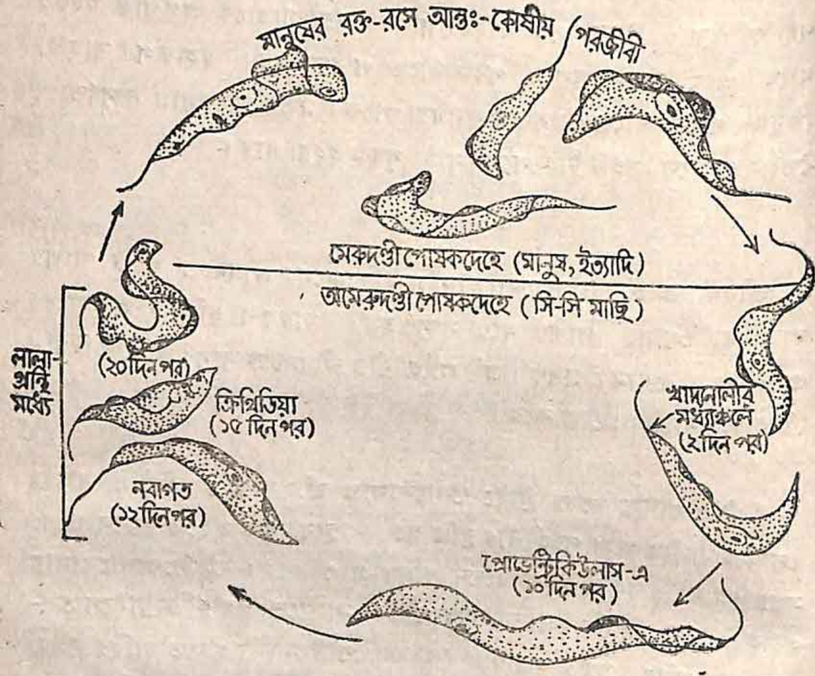
চিত্র-31 ট্রাইপেনোসোমা গামবিএনসের গঠন

জনন ঃ এই পরজীবী প্রাণী অযৌন জনন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে। অযৌনজনন অনুদৈর্ঘ্য দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে ঘটিয়া থাকে। দ্বিবিভাজনের সময় কাইনেটোপ্লাস্ট, ব্লেফেরোপ্লাস্ট এবং নিউক্লিয়াস দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। কিন্তু ফ্লাজেলাম বিভক্ত হয় না। এই সময় মূল বা প্রথম ফ্লাজেলাটি দুইটি অপত্য ব্লেফেরোপ্লাষ্টের যে কোন একটির সহিত যুক্ত থাকে, অপর

ব্লেফোরো প্লাস্ট হইতে নতুন ফ্লাজেলা সৃষ্টি হয়। নতুনভাবে আনডুলেটিং পর্দা সৃষ্টি হয়। ইহার পর সাইটোপ্লাজম অনুদৈর্ঘ্যভাবে অগ্রপ্রান্ত হইতে থাকে এবং দুইটি অপত্য পরজীবীতে পরিণত হয়। ইহার পর তাহারা কিছুক্ষণ পশ্চাতপ্রান্তে একসংগে লাগিয়া থাকে। নতুন ফ্লাজেলাম সম্পূর্ণভাবে তৈয়ারী হইলে দুইটি ট্রাইপেনোসোমা পৃথক হইয়া যায়।

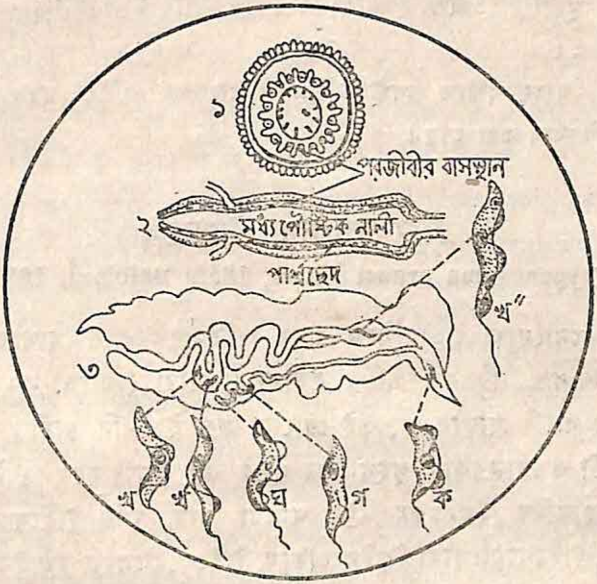
জীবনীচক্র ঃ ট্রাইপেনোসোমা গামবিএনসের জীবনচক্র দুইটি আশ্রয় দাতা বা পোষক প্রাণীর মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। মানুষ বা হরিণ হইল ইহাদের প্রাথমিক বা প্রধান **পোষক। এই পরজীবীর** জীবনচক্র সম্পূর্ণ করিতে সিট্‌সি (Tsetse) মাছি সাহায্য করে।

সিট্‌সি মাছির মধ্যে ট্রাইপেনোসোমার জীবনচক্র ঃ সিট্‌সি মাছির পৌষ্টিক নালীর মধ্যে পরজীবীর বৃদ্ধি হয়। মানুষের ত্বক হইতে রক্তশোষণের সময় এই মাছি খর্বাকৃতি দশা রক্তের সহিত গ্রহণ করে। **ট্রাইপেনোসোমার** খর্বাকৃতি দশা সিট্‌সি মাছির মধ্যপৌষ্টিক নালীতে লম্বাকৃতি ট্রাইপোনো-সোমাতে পরিণত হয়। লম্বাকৃতি দশা মধ্য পৌষ্টিকনালী হইতে বাহির হইয়া পেরিট্রফিক অঞ্চলের (পেরিট্রফিক পর্দা ও আবরণী কোষের মধ্যবর্তী অঞ্চল) পিছনের দিকে চলিয়া আসে। এইখানে ইহারা বহুবিভাজন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে। মাছির দেহে প্রবেশ করিবার **দশ হইতে বারোদিনের** মধ্যে লম্বাকৃতি দশা পেরিট্রফিক অঞ্চলের সামনের দিকে চলিয়া আসে। **পঞ্চদশ দিবসে** লম্বাকৃতি দশা এই অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া প্রোভেনট্রিকুলা-সের গহ্বরে প্রবেশ করে এবং দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ইহার পর লম্বাকৃতি দশা সামনের দিকে অগ্রসর হইয়া মুখবিবরে প্রবেশ করে। মুখবিবর হইতে অবশেষে লালাগ্রন্থি নালী পথে বাহির হইয়া লালাগ্রন্থিতে অবস্থান করে। এই লালাগ্রন্থিতে পরজীবীর বৃদ্ধি হয়। লালাগ্রন্থিতে এই লম্বাকৃতি দশার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং আকৃতির পরিবর্তন হয়। প্রথমে ক্রিথিডিয়াল (crithidial) দশা ও পরে মেটাসাইক্লিক (metacyclic) দশাতে পরিণত হয়। মেটাসাইক্লিক দশাই ট্রাইপেনোসোমার সংক্রামিতরূপ। মেটাসাইক্লিক অবস্থায় আসিতে ইহাদের প্রায় 20 দিন সময় লাগে,। 75 হইতে 80 ডিগ্রী ফারেনাহাইট তাপমাত্রায় পরজীবীর বৃদ্ধি ভাল হয়।



চিত্র-32 ট্রাইপেনোসোমা গামবিএনসের জীবনচক্র

মানুষ বা হরিণজাতীয় প্রাণীর মধ্যে ট্রাইপেনোসোমার জীবনচক্র ঃ সিট্‌সি মাছি মানুষ বা হরিণকে কামড়াইলে মেটাসাইক্লিক দশা মানুষ বা হরিণের দেহে সংক্রামিত হয়। ঐ ক্ষতস্থানে মেটাসাইক্লিক অবস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীকালে রক্তকে আক্রমণ করে। পার্শ্বীয় রক্তবাহীনালীর মধ্যে ট্রাইপেনোসোমার অনুদৈর্ঘ্য বিভাজন হয়।



চিত্র-33 সিটসি মাছির দেহে ট্রাইপেনোসোমা গামবিএনসের জীবনচক্র

ইতিমধ্যে পতংগ সংক্রামিত রোগীকে দংশন করিলে পুনরায় রক্তের সহিত পতংগের দেহমধ্যে পরজীবি স্থানান্তরিত হয়।

বিকারতত্ত্ব (Pathogenecity) ঃ ট্রাইপেনোসোমা গামবিএন্স দ্বারা রোগী প্রথমেই কোন অসুখে আক্রান্ত হয় না। যেখানে সিট্সি মাছি কামড়ায়, সেখানে শুধু জালা করে। কিন্তু কিছুদিন পর রক্তে তাহাদের সংখ্যাধিকত্ত হইলে রোগীর পর্যায়ক্রমে জর; মাথাধরা, মাথাব্যথা, রক্তাল্পতা, দুর্বলতা, গ্রন্থির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ লায়। পরবর্তী অবস্থায় ইহারা মস্তিস্ক ও সুষুম্নারসের মধ্যে প্রবেশ করে এবং রোগীর স্নায়ুবৈকল্য এবং ঘুমের অসুখ দেখা যায়।

প্রতিকার (prevention) ঃ

(i) সিট্সি মাছির উৎপাত কমাইতে পারিলে অসুখের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ডি.ডি.টি বা কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই মাছি দমন করা উচিৎ।

(ii) গৃহপালিত পশুকে যাহাতে কোন মাছি না কামড়ায় তাহা লক্ষ্য রাখা উচিৎ।

(iii) মাংসপেশীতে পেণ্টামিডিন ইনজেকশন করিয়া ছয়মাসের জন্য রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

ট্রাইপেনোসোমা ইভানসি
Trypanosoma evansi (Steel, 1855) Balbiani, 1888

ট্রাইপেনোসোমা ইভানসিকে প্রথম ক্ষতিকারক প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করেন বৃটিশ পশু চিকিৎসক গ্রিফিথ ইভানস। সারা (**surra**) নামক একটি মৃত্যুকারক ব্যাধি ঘোড়ার হয়, এই রোগের জন্য ইভানসি দায়ী। এছাড়া উট, হাতী ও কোন কোন গৃহপালিত পশুর এই ব্যাধি হয়। ট্রাইপেনোসোমা ইভানসির তিনরকম ষ্ট্রেন পাওয়া যায়, যথা—ট্রাইপেনোসোমা ইকুইনাম, ট্রাইপেনোসোমা ইকুইপারাডাম, ট্রাইপেনোসোমা বভাইন। এক একটি ষ্ট্রেন এক একটি প্রাণীর ক্ষতিসাধন করে। খুব সম্ভবতঃ ট্রাইপেনোসোমা ক্রুসি হইতে ট্রাইপেসোমা ইভানসির উদ্ভব হয়। সিটসি মাছি দ্বারা উটের মধ্যে ট্রাইপেনোসোমা ক্রুসির সংক্রমন দেখা যায়। পরবর্তীকালে এই ক্রুসি ক্রমশঃ ইভানসির বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং ট্যাবনাস মাছি দ্বারা সংক্রামিত হয়। এইভাবে আফ্রিকা হইতে উটের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জীবের (**ungulates**) মধ্যে ট্রাইপেনোসোমা ইভানসির সংক্রামন ছড়াইয়া পড়ে।

প্রাণীজগতে অবস্থান ঃ সারকোম্যাষ্টিগোফোরা
উপপর্ব ঃ ম্যাষ্টিগোফোরা
শ্রেণী ঃ জুম্যাষ্টিগোফোরা
বর্গ ঃ কাইনেটো প্লাসটিডা
গন ঃ ট্রাইপেনোসোমা
প্রজাতি ঃ ট্রাইপেনোসোমা ইভানসি

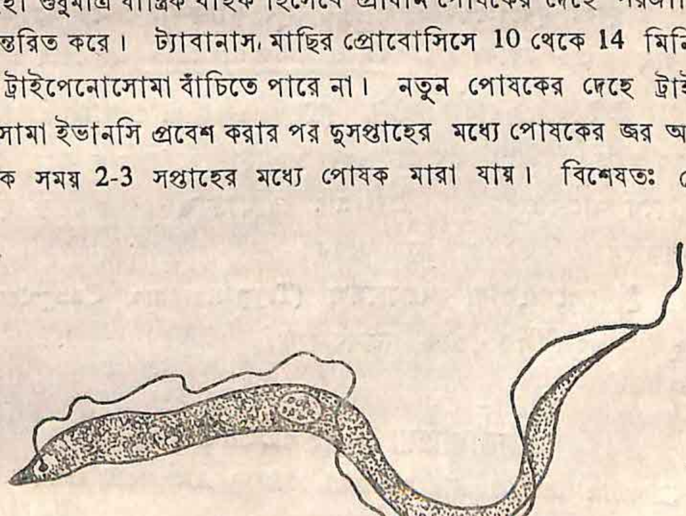
স্বভাব ও বসতি ঃ ইহারা অন্তঃপরজীবি আদ্যপ্রাণী। ঘোড়া, উট, হাতী ইত্যাদি প্রাণীর সংবহনে বাস করে।

বিস্তার ঃ ইহাদের পৃথিবীর সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ

লোহিত সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল অঞ্চলের দেশ সমূহে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। এছাড়া মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, ফিলিপাইন দেশে ইভানসির সংক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়।

গঠন ঃ দেহটি সরু লম্বা, পাশাপাশি চাপা ও সর্পিলভাবে বিন্যস্ত থাকে। দেহটি 15 হতে 34 মাইক্রন লম্বা হয়। দেহের সামনের দিকে নিউক্লিয়াস ও পশ্চাতে কাইনেটোপ্লাস্ট থাকে। দেহে সুস্পষ্ট আনডুলেটিং পর্দা থাকে। প্যারবাসাল অংশ ও ব্লেফেরোপ্লাষ্ট হইতে কাইনেটোপ্লাষ্ট গঠিত হয়। ব্লেফেরোপ্লাষ্ট হইতে উৎপন্ন ফ্লাজেলা দেহের সহিত যুক্ত থাকিয়া আনডুলেটিং পর্দা গঠন করে।

জীবনচক্র ঃ ট্রাইপেনোসোমা ইভানসির জীবনচক্র দুইটি পোষকের দেহে সম্পূর্ণ হয়। ঘোড়া, উট ইত্যাদি প্রাণী প্রাথমিক পোষক হিসেবে কাজ করে। ট্যাবানাস মাছি গৌনপোষক হিসাবে কাজ করে। তবে কুকুর, মহিষ, হাতী, শূকর, বিড়াল, টাপির, হরিণ প্রাথমিক পোষকের পর্যায়ে পড়ে। পরীক্ষাগারে ইঁদুর, খরগোস, গিনিপিগের মধ্যেও ইভানসির সংক্রমন করা যায়। গৌনপোষক ট্যাবানাসের দেহে ইভানসির কোন পরিবর্তন হয় না, ইহা শুধুমাত্র যান্ত্রিক বাহক হিসেবে প্রাধান পোষকের দেহে পরজীবিকে স্থানান্তরিত করে। ট্যাবানাস মাছির প্রোবোসিসে 10 থেকে 14 মিনিটের বেশী ট্রাইপেনোসোমা বাঁচিতে পারে না। নতুন পোষকের দেহে ট্রাইপেনোসোমা ইভানসি প্রবেশ করার পর দুসপ্তাহের মধ্যে পোষকের জ্বর আসে, অনেক সময় 2-3 সপ্তাহের মধ্যে পোষক মারা যায়। বিশেষতঃ ঘোড়া



চিত্র-34 ট্রাইপেনোসোমা ইভানসি

'সারা' অসুখে আক্রান্ত হইলে উপযুক্ত সতর্কীকরণের অভাবে কয়েক মাসের মধ্যে মারা যাইতে পারে।

কয়েকটি ট্রাইপেনোসোমার সংক্ষিপ্ত বিবরণী

(i) ট্রাইপেনোসোমা ক্রুজি (**Trypanosoma cruzi**) :—এই পরজীবি প্রাণী প্রধানতঃ মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার মানুষের মধ্যে 'চাগা' রোগের সৃষ্টি করে। এই পরজীবির গৌনপোষক হিসেবে রেডুভিডি (**Reduvidæ**) শ্রেণীর এক ধরণের পতংগ কাজ করে। প্রধানতঃ **Triatoma megista, Paustrongylus geniculatus, Triatoma infestans** ইত্যাদি বাহক হিসাবে সাহায্যে করে। এই পতংগ রাতে কামড়ায় দিনে বাড়ীতে অন্ধকার স্থানে বাস করে। রাতে এরা প্রধানতঃ ত্বক ও ঠোঁঠের কোনে কামড়ায়, সেজন্য একে **Kissing bug** বলে। এই পতংগের দেহে ট্রাইপেনোসোমা ক্রুজির মেটাসাইক্লিক অবস্থা শেষ হয় এবং নতুন প্রাথমিক পোষকের দেহে প্রবেশ করিয়া পূর্ণাংগ অবস্থায় পরিণত হয়।

ii) ট্রাইপেনোসোমা রোডেসিএন্স (**Trypanosoma rhodesiense**) ঃ ইহারা মানুষের ঘুমরোগের জন্য দায়ী। পূর্ব আফ্রিকার রোডেসিয়া অঞ্চলে দেখা যায়। এক ধরণের মাছি Glossina morsitans এই রোগ ছড়ায়।

iii) ট্রাইপেনোসোমা লিউসি (**Trypanosoma lewisi**) ঃ ইহারা মানুষের ক্ষতি করে না। ইহারা একধরণের ইঁদুরকে আক্রান্ত করে, কিন্তু ইঁদুর রোগে আক্রান্ত হয় না। **Pyrexia** রোগাক্রান্ত পিওর রক্ত হইতে ট্রাইপেনোসোমা লিউসি আবিষ্কার করেন।

vi) ট্রাইপেনোসোমা কংগোলেন্স (**Trypanosama Congolense**) এই পরজীবি গৃহপালিত পশুকে আক্রমণ করে।

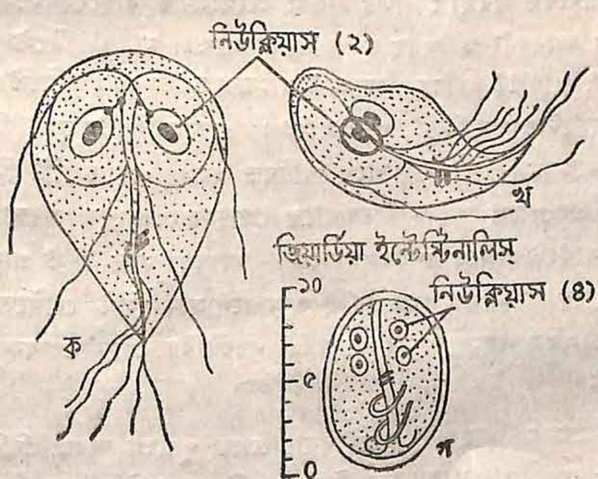
জিয়ারডিয়া ইনটেসটিনালিস
Giardia intestinalis (Lambl, 1859) Alexeieff, 1914

জিয়ারডিয়া আমাশয় রোগের কারণ। ইহা একধরণের আণুবীক্ষণিক ফ্লাজেলাযুক্ত আদ্যপ্রাণী, মানুষের অন্ত্রে বাস করে। '**Leeuwenhoek**' 1681 খৃষ্টাব্দে নিজের মল পরীক্ষা করিয়া এই রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন।

প্রাণীজগতে অবস্থান ঃ মানুষের ডিওডেনামে বসবাসকারী একধরণের ফ্লাজেলাযুক্ত আদ্যপ্রাণী, তবে অন্ত্রের সমস্ত অংশেই দেখা যায়। পৃথিবীর সর্বত্র জিয়ারডিয়া দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হয়। ক্রাণ্ডীয় অঞ্চলে ও ক্রাণ্ডীয় অঞ্চলের নিকটবর্তী দেশসমূহে জিয়াডিয়ার প্রভাববেশী।

পর্ব : ফাইটোমাষ্টিগোফোরা
শ্রেণী : জুম্যাষ্টিগোফোরা
বর্গ : ডিপ্লোমোনাডিডা
গণ : জিয়ারডিয়া
প্রজাতি : জিয়ারডিয়া ইনটেসটিনালিস

গঠন ঃ আদ্যপ্রাণীটিকে দেখিতে একটি হাতলবিহীন টেনিস ব্যাটের মতো, সামনের অংশ চওড়া ও পশ্চাত অংশ ক্রমশঃ সরু হইয়া যায়। পৃষ্ঠভাগ উত্তল এবং অংকীয়ভাগ অবতল। অংকীয়ভাগে একটি কাপের মতো অংশ আছে। **এই কাপের মতো অংশ** দ্বারা জিয়ারডিয়া মানুষের আন্ত্রিক কোষের অবতল পৃষ্ঠভাগের সহিত নিজেকে সংযুক্ত করিয়া রাখে। জিয়ারডিয়া লম্বায় সাধারণতঃ 10 হইতে 18 মাইক্রন এবং চওড়ায় 17 মাইক্রন হয়।



চিত্র-35 জিয়ারডিয়া ইনটেসটিনালিস

ক) পৃষ্ঠীয় ভাগ খ) পার্শ্বীয় ভাগ গ) সিস্টের বিভাজন

জিয়ারডিয়ার দেহকোষটি দ্বিপার্শ্বীয় ভাবে প্রতিসম। জিয়ারডিয়ার দুইটি অ্যাক্সোস্টাইল, দুইটি নিউক্লিয়াস ও আটটি ফ্লাজেলা থাকে। দেহের অগ্রভাগে পাশাপাশি দুইটি নিউক্লিয়াস অবস্থান করে। দেহের মধ্যে কালো বর্ণের একটি ক্যারিওসোম থাকে। অ্যাক্সোস্টাইল দুইটি সরু দণ্ডের ন্যায়, দুইটি নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী স্থানে লম্বালম্বি অবস্থান করে এবং সম্মুখে বেলেফেরোপ্লাস্ট পর্যন্ত অগ্রসর হয়। চারিজোড়া ফ্লাজেলার মধ্যে একজোড়া অগ্রভাগে, একজোড়া পশ্চাতভাগে, একজোড়া মধ্যভাগে ও একজোড়া শেষপ্রান্তে অবস্থান করে। অগ্রস্থ ফ্লাজেলাদ্বয় বেলেফেরোপ্লাস্ট হইতে উৎপন্ন হইয়া একে অপরকে অতিক্রম করিয়া সম্মুখভাগ হইতে উন্মুক্ত হয়। মধ্যজোড়া ফ্লাজেলা বেলেফেরোপ্লাস্ট হইতে বাহির হইয়া অ্যাক্সোস্টাইল বরাবর অতিক্রম করে। অপর দুইজোড়া ফ্লাজেলা অ্যাক্সোস্টাইল হইতে বাহির হইয়া আসে।

জিয়োরডিয়া অন্ত্রের কলার কোন ক্ষতি সাধন করে না। ইহারা যখন অন্ত্রের গহ্বরে বাস করে, অন্ত্রের প্রাচীর গাত্র হইতে মিউকাস নিঃসরণে সাহায্য করে, এই মিউকাসকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

আবরণীবদ্ধ অবস্থা : জিয়ারডিয়া রোগাক্রান্ত মানুষের মলে অসংখ্য সিস্ট বা আবরণীবদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। সিস্টের আকৃতি ডিম্বাকার, প্রায় **12** মাইক্রন লম্বা ও 7 মাইক্রন চওড়া হয়। সিস্টের প্রাচীর হইতে সাইটোপ্লাজম কিছুটা পৃথক থাকে। প্রথমে সিস্টের দুইটি নিউক্লিয়াস থাকে, পরে চারিটি নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এই চারিটি নিউক্লিয়াস সিস্টের একপ্রান্তে অথবা উভয়প্রান্তে জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। সিস্টের সাইটোপ্লাজমে ফ্লাজেলা থাকে। মানুষের মলে সিস্ট প্রায় দশদিন বাঁচিয়া থাকে। অনেক সময় মাছি ও আরশোলার সিস্ট দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল পতংগ অনেক সময় এই পরজীবির গৌন পোষক হিসাবে কাজ করে।

জীবনচক্র ঃ মানুষের অন্ত্রে জিয়ারডিয়ার পূর্ণাংগ অবস্থা দ্বিবিভাজনে পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে। ডিওডিনামে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জিয়ারডিয়া আবরণীবদ্ধ হয়। আবরণীবদ্ধতার সময় পরজীবি দেহের বাহিরে একটি শক্ত আবরণী তৈরী করে। এই আবরণীবদ্ধ অবস্থায় সিস্টের মধ্যে কোষটি দুইভাগে বিভক্ত হয়। খাদ্য ও পানীয়ের সংগে সিস্ট অন্য মানুষের দেহে

প্রবেশ করে। মানুষের খাদ্যনালীতে প্রবেশ করিবার আধঘণ্টার মধ্যে সিস্ট হইতে দুইটি পূর্ণাংগ জিয়ারডিয়ার সৃষ্টি হয়।

বিকারতত্ত্ব ঃ

জিয়োরডিয়া ইনটেসটিনালিস অন্ত্রের কলাকে ধ্বংস করে না। সাধারণতঃ ইহা তেমন কোন ক্ষতিকারক নয়, তবে আন্ত্রিক গণ্ডগোল দেখা যায়। ডিওডেনামের মধ্যে অসংখ্য অপত্য জিয়ারডিয়া থাকে। এমনকি একজন সুস্থ মানুষের দেহে অসংখ্য জিয়ারডিয়া পাওয়া যায়। অনেক সময় আমাশয় রোগীর মলে জিয়োরডিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে জিয়ারডার প্রভাবে আমাশয় হইয়াছে। শিশুরাসাধারণতঃ এই পরজীবির আক্রমনে রক্তাপ্লতা ও পরিপাকহীনতায় (indigestion) ভোগে। তবে বর্তমানে ডাক্তারদের মধ্যে জিয়ারডিয়াকে খুব ক্ষতিকারক পরজীবি হিসাবে চিহ্নিত করিবার প্রবণতা দেখা যায়।

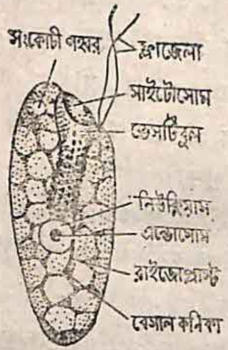
কয়েকটি ফ্লাজেলাযুক্ত প্রাণীর পরিচিতি ঃ

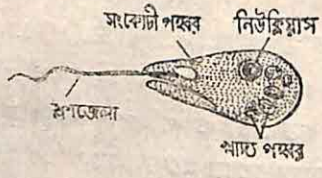
(i) **কপরোমোনাস (Copromonas) ঃ** কপরোমোনাস কপরোজোয়িক প্রথায় পুষ্টিসাধন করে। ব্যাঙ, শূকর, মানুষের মলে কপরোমোনাস পাওয়া যায়। দেহটি ন্যাসপাতির মতো, দেহে রঞ্জক কণিকা থাকে। ইউগ্লিনার মত কপরোমোনাসের অগ্রভাগে একটি গালেট থাকে। ইহাদের কোষে অক্ষিবিন্দু থাকে না। কপরোমোনাস প্রধানতঃ ব্যাকটিরিয়াকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। ইহারা লম্বালম্বি **দ্বিবিভাজন** পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে। মিওসিস প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস বিভাজিত হইয়া জননকোষ তৈরী করে। জননকোষ মিলিত হইয়া যৌনপদ্ধতিতে জাইগোট সৃষ্টি করে।

(ii) **ক্রিপটোমোনাস ঃ (Cryptomonas) ঃ** মিঠা জলে ও সামুদ্রিক জলে ইহারা বাস করে। এই আদ্যপ্রাণীর গালেট, একটি নিউক্লিয়াস ও দুইটি ফ্লাজেলা থাকে। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে দুইটি সবুজ বা বাদামীবর্ণের রঞ্জক কণিকা থাকে, ইহারা হোলোফাইটিক্ প্রথায় পুষ্টিসাধন করে।

(iii) **কাইলোমোনাস ঃ (Chilomonas) ঃ** কাইলোমোনাস মিঠা জলে বাসকরে। দেহের বাহিরে কিউটিকল থাকে, দেহটি চ্যাপ্টা, ডিম্বাকৃতি এবং প্রায় 35 মাইক্রন লম্বা হয়। দেহকোষে রঞ্জক কণিকা থাকে না।

দেহে গালেট থাকে ও অগ্রপ্রান্তে একজোড়া ফ্লাজেলা থাকে। অন্তঃপ্লাজমে একাধিক গহ্বরযুক্ত হয়। অন্তঃপ্লাজমে একটি গোলাকার নিউক্লিয়াস, সংকোচী গহ্বর থাকে। এই আদ্যপ্রাণীটি পরিবেশ হইতে স্যাপ্রোজয়িক প্রথায় পুষ্টিসাধন করে। ইহারা লম্বালম্বি দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে।





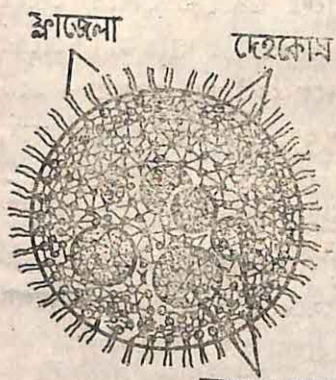
চিত্র-36 কাইলোমোনাস প্যারামিশিয়াম   কপরোমোনাস সাবটিলিস

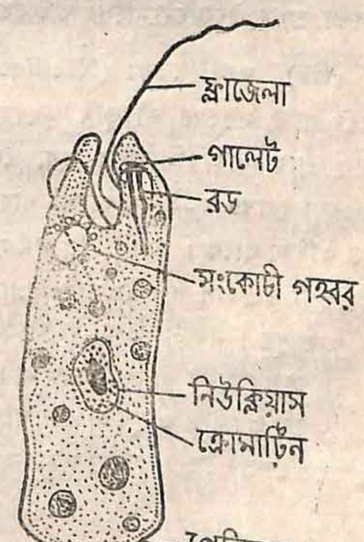
iv) ভলভক্স (Volvox) ঃ ভলভক্স ফাইটোম্যাষ্টিগোফোরিয়া শ্রেণীর ভলভোসিডা বর্গের অন্তর্ভূক্ত। ইহারা একত্রে কলোনী গঠন করিয়া বাস করে, কলোনীর অন্তর্গত সকল প্রাণী পরস্পর সাইটোপ্লাজম পটিদ্বারা যুক্ত থাকে। সাধারণতঃ কলোনীগুলি সবুজ বর্ণের হয়, ফাঁপা গোলাকার এবং ব্যাস অর্ধমিলিমিটার হইতে কয়েক মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। প্রতিটি জীবের দুইটি ফ্লাজেলা, দুই বা ততোধিক সংকোচী গহ্বর, একটি নিউক্লিয়াস, কাপের মতো ক্লোরোপ্লাস্ট ও লাল অক্ষিবিন্দু থাকে। ইহাদের কোন গালেট থাকে না। ভলভক্স কলোনী ঘুর্ণন পদ্ধতিতে জলে চলাফেরা করে। উদ্ভিদের মতো ক্লোরোপ্লাস্টের উপস্থিতিতে শর্করা খাদ্য তৈয়ারী করে। কলোনীর পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত ভলভক্সের দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে কলোনী বৃদ্ধিলাভ করে। সাধারণতঃ বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কলোনীর পশ্চাতভাগে অবস্থিত জননকোষ গঠন করিয়া নূতন অপত্য ভলভক্স কলোনী গঠন করে। অনেকসময় অযৌন জনন পদ্ধতিতে ভলভক্স কোষ বিভাজিত হইয়া নূতন অপত্য কলোনী গঠন করিয়া বড় মাতৃ কলোনীর গহ্বরে অবস্থান করে। পরে মাতৃ কলোনী বিনষ্ট হইলে

অপত্য কলোনী যুক্ত হয় ও পরিণতি লাভ ককে। যৌনজননের সময় এক বিশেষ ধরণের পুংকোষ অ্যানথেরেডিয়া ও স্ত্রীকোষ আরকিগোনিয়া যথাক্রমে দ্বিফ্লাজেলাযুক্ত অসংখ্য মাইক্রোগ্যামেট বা শুক্রাণু এবং ফ্লাজেলাবিহীন একটি বড় ম্যাক্রোগ্যামেট তৈয়ারী করে। এই পুং ও স্ত্রী জননকোষের মিলনে উৎপন্ন জাইগোট হইতে নতুন অপত্য কলোনীর সৃষ্টি হয়।

(v) ক্রিশঅ্যামিবা : **(Chrysomoeba)**: ইহা একটি আণুবীক্ষণিক জলজ জীব, ইহার বাহিরে নিদ্দিষ্ট কিউটিকল্ থাকে না, দেহের সাইটোপ্লাজমে একটি নিউক্লিয়স, দুই বা ততোধিক সংকোচী গহ্বর, একটি ফ্লাজেলা ও দুইটি রঞ্জক কণিকা থাকে। সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে দেহকোষে খাদ্য তৈয়ারী হয়। অ্যামিবার মত কঠিন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে।

(vi) পেরানিমা (Peranema) : পেরানিমা সাধারণতঃ বদ্ধ জলাশয়ে বাস করে। দেহত্বকের বাহিরে পেলিকল্ থাকে, ইউগ্লিনার মত স্থান পরিবর্তন করে। দেহের অগ্রভাগ সরু ও পশ্চাতভাগ চওড়া, ইহার দেহের রক্তকণিকা, অক্ষিবিন্দু থাকে না। গালেটের ভিতরের প্রাচীরের গাত্রে দুইটি অসমান ফ্লাজেলা থাকে।





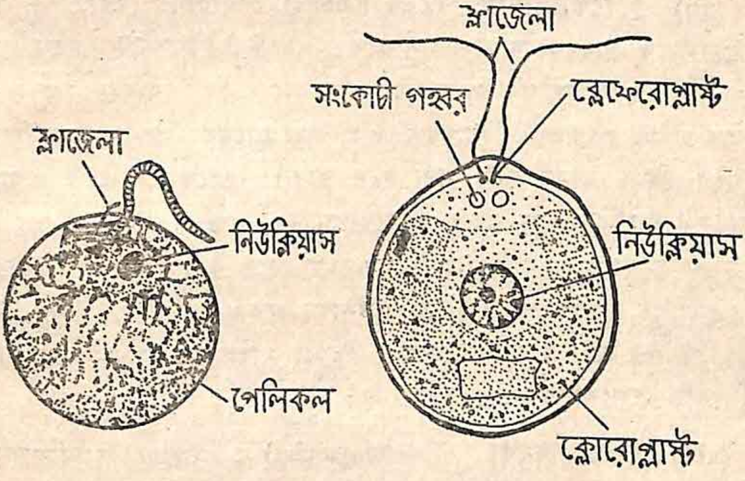
চিত্র-37 ভলভক্স. পেরানিমা

vii) **ক্ল্যামাইডোমোনাস (Chlamydomonas)** : ইহা ফাইটো-মোনাডিনা বর্গের অন্তর্ভূক্ত প্রাণী। ইহারা এককোষী, আনুবীক্ষনিক, বদ্ধ জলাশয়ে বাস করে। দেহটি ডিম্বাকৃতি, লম্বা ও চ্যাপটা হয়। দেহের সম্মুখ ভাগ হইতে একজোড়া ফ্লাজেলা বাহির হয়, ফ্লাজেলা বেলেফেরোপ্লাস্ট হইতে উৎপন্ন হয়। দেহকোষের পশ্চাদ্‌প্রান্তে একটি কাপের মতো অংশে অসংখ্য ক্লোরোফিল কণিকা থাকে, দেহকোষের অন্তঃপ্লাজমে একটি কেন্দ্রস্থ নিউক্লিয়াস থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের পশ্চাতপ্রান্তে পাইরিনয়েড থাকে। দেহের অগ্রস্থ প্রান্তে একটি অক্ষিবিন্দু ও দুইটি সংকোচী গহ্বর থাকে। দেহের একেবারে অগ্রপ্রান্তে দুইটি লম্বা ফ্লাজেলা থাকে। সমগ্র দেহের বাহিরে সেলুলোজ আবরণী থাকে। সঞ্চিত শর্করা খাদ্য, তৈলবিন্দু কোষমধ্যে থাকে।

উদ্ভিদের মতো ইহারা সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাদ্য তৈয়ারী করে, ও জল হইতে প্রয়োজনীয় পদার্থ দেহকোষ দ্বারা শোষণ করে। অযৌনজনন পদ্ধতিতে সেলুলোজ প্রাচীরের মধ্যে দ্বিবিভাজনে পদ্ধতিতে দুইটি অপত্যের সৃষ্টি হয়, পরে সেলুলোজ প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া অপত্য দুইটি মুক্ত হয়। পরে অনুকূল পরিবেশে জাইগোট হইতে বহুবিভাজনে পদ্ধতিতে অসংখ্য অপত্য ক্ল্যামাইডোমোনাসের সৃষ্টি হয়।

(viii) **নকটিলিউকা (Noctiluca)** : নকটিলিউকা সামুদ্রিক স্বাধীন-জীবী প্রাণী, সমুদ্রের তীরভূমি অঞ্চলে ইহাদের উপস্থিতি বেশী। দেহের ব্যাস প্রায় একমিলিমিটার হয়, দেহে কোষপ্রাচীর থাকে না। দেহের মধ্যরেখা বরাবর একটি বড় গালেট থাকে। দেহে একটি ছোট ফ্লাজেলা ও একটি বড় কর্ষিকা থাকে। সাইটোপ্লাজম সাধারণত পরিধির দিকে অবস্থান করে, অন্তঃস্থ নিউক্লিয়াস পরিধির সাইটোপ্লাজমের সহিত সূক্ষ্ম **সাইটোপ্লাজমপটি** দ্বারা যুক্ত। নকটিলিউকা হোলোজয়িক প্রথায় পুষ্টিসাধন করে। ইহাদের কোনও ক্লোরোপ্লাস্ট কণিকা থাকে না। ইহারা আদ্যপ্রাণী, রটিফার ও ছোট ছোট জলজ শুককীট ও মূককীটকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে স্পোর তৈরী করিয়া জনন কার্য সামাধান করে।

কয়েকটি ফ্লাজেলাযুক্ত প্রাণী



চিত্র-38 নকটিলিউকা ক্ল্যামাইডোমোনাস

যৌনজনন পদ্ধতিতে সমগোত্রীয় জননকোষের মিলনে জাইগোট সৃষ্টি হয়। নকটিলিউকা আলোকদান করে অর্থাৎ আলোকপ্রভব, রাতের বেলায় সমুদ্রের জলে ইহারা বিভিন্ন বর্ণের আলোক বিচ্ছুরিত করে। দেহে প্রোটিনজাত লুসিফেরিন পদার্থের জারণে আলোক উৎপন্ন হয়, এই জারণে লুসিফারেজ উৎসেচক সাহায্য করে।

(ix) ম্যাসটিগ অ্যামিবা (Mastigamoeba) ঃ ইহার দেহকোষটি অ্যামিবার মতো, অনেকগুলি ক্ষণপদ দেহ হইতে বাহির হয়। ইহা ব্যতীত দেহ হইতে একটি লম্বা ফ্লাজেলা বাহির হয়। ক্ষণপদ দ্বারা অ্যামিবার মতো হোলোজয়িক প্রথায় পুষ্টিসাধন করে।

(x) বোডো (Bodo) ঃ বোডো সাধারণতঃ বদ্ধজলাশয়ে বাস করে, এবং বর্জ্যপদার্থ হইতে পুষ্টিসাধন করে। দেহের অগ্রপ্রান্ত সরু ও দেহটি ডিম্বাকার হয়। দেহের অগ্রপ্রান্ত হইতে একজোড়া ফ্লাজেলা বাহির হয়। ছোট ফ্লাজেলা সামনের দিকে ও বড় ফ্লাজেলা পশ্চাৎদিকে যায়। দেহের মধ্যভাগে একটি নিউক্লিয়াস ও একটি প্যারাবেসাল কণিকা থাকে।

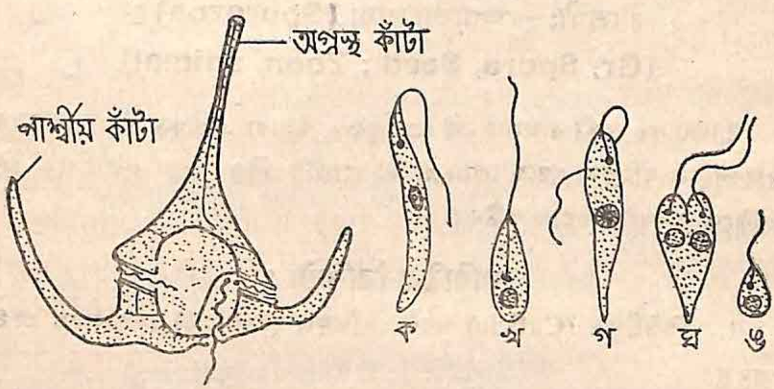
(xi) অয়কোমোনাস (Oikomonas) ঃ ইহারা সাধারণতঃ ভিজামাটি ও পরিষ্কার জলে বাস করে। দেহকোষটি ছোট, গোলাকার ও দেহকোষের ব্যাস 4 হইতে 5 মাইক্রণ হয়। দেহের একপ্রান্তে একটি ফ্লাজেলা থাকে।

(xii) ট্রাইকোমোনাস (Trichomonas) বেশীরভাগ মেরুদণ্ডী প্রাণীর খাদ্যনালীতে ট্রাইকোমোনাস বাস করে। দেহটি 5 হইতে 20 মাইক্রন লম্বা হয়, অপেক্ষাকৃত ডিম্বাকৃতি বা ন্যাসপাতি আকারের হয়। দেহের সম্মুখভাগ হইতে চারিটি ফ্লাজেলা বাহির হয়। একটি লম্বা ফ্লাজেলা পশ্চাৎভাগের দিকে অগ্রসর হইয়া আনডুলেটিং পর্দা গঠন করে। দেহকোষটি একটি অন্তঃস্থ অ্যাক্সোস্টাইল দ্বারা দৃঢ় হয়। কোরোপ্লাস্টের পশ্চাতে একটি ডিম্বাকৃতি নিউক্লিয়াস থাকে। সাইটোপ্লাজমে অসংখ্য রঞ্জক কণিকা থাকে। ইহারা স্যাপ্রোজয়িক প্রথায় শোষন করিয়া পুষ্টিসাধন করে। তবে, ইহারা ব্যাকটি-রিয়া, ইষ্ট অন্য কঠিন খাদ্য গ্রহণ করে। ইহারা সাধারণতঃ লম্বভাবে দ্বিবিভা-জন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে।

(xiii) ট্রাইকোনিমফা (Trichonympha) ঃ ইহারা আরশোলা, উইপোকা ইত্যাদির পৌষ্টিক নালীতে বাস করে। পোষকের দেহে মিথোজীবি প্রাণী হিসেবে কাজ করে। ইহারা মানুষকে আক্রমণ করে না, কিন্তু মানুষের ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। দেহের ব্যাস প্রায় 50 হইতে 300 মাইক্রন হয়। দেহের অগ্রভাগ সরু ও স্থঁচালো, ইহাকে রস্ট্রাম বলে। রস্ট্রাম অংশে ফ্লাজেলা থাকে না। দেহের মধ্যভাগ ঘণ্টাকৃতি এবং অসংখ্য ফ্লাজেলা দ্বারা দেহ আবৃত থাকে। দেহের পশ্চাৎভাগ ফ্লাজেলাবিহীন এবং শক্ত বহিঃপ্লাজম দ্বারা আবৃত। দেহকোষের মধ্যভাগে একটি নিউক্লিয়স থাকে। দেহকোষে একটি প্যারাবেসাল কনিকা ও অ্যাক্সোস্টাইল স্থত্র থাকে।

(xiv) সেরাটিয়াম (Ceratium) ঃ এই গণের অন্তর্গত বেশীরভাগ প্রজাতি সামুদ্রিক, কিছু মিঠা জলের অধিবাসী। দেহকোষের বাহিরে সেলুলোজ নির্মিত শক্ত আবরণী থাকে। দেহের বহিভাগে ছোট ছোট প্লেট থাকে, প্লেটে কাঁটা ও ছোট ছিদ্র থাকে। দেহের মধ্যভাগে একটি খাঁজ দ্বারা অগ্র ও পশ্চাৎ অংশে বিভক্ত। অগ্রভাগকে এপিকন ও পশ্চাৎভাগকে বাইপোকন বলে। দেহকোষে একটি লম্বা ফ্লাজেলা থাকে যাহা চলনে সাহায্য করে। দেহে দুইটি ফ্লাজেলা সমকোনে অবস্থিত থাকায় দেহটি সর্পিলভাবে যাতায়াত করিতে পারে। দেহের মধ্যভাগে একটি নিউক্লিওলাস বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে। বেশীরভাগ প্রজাতি রঞ্জক কণিকার উপস্থিতিতে উদ্ভিদের ন্যায় খাদ্য তৈয়ারী করিতে পারে। কয়েকটি প্রজাতি অ্যামিবার মতো

ক্ষণপদ দ্বারা সংগ্রহ করে। অনেক সময় সাইটোপ্লাজম অক্ষিবিন্দু দেখা যায়। ইহারা দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে জননকার্য সমাধান করে।



চিত্র-39 সেরাটিয়াম ক-ঙ লিসম্যানিয়া ডেনোভানি

(xx) লিসম্যানিয়া (**Leis*h*mania**) : লিসম্যানিয়া গনের প্রজাতি গুলি পরজীবি প্রাণী। মানুষ, কুকুর, ঘোড়া, ইত্যাদি প্রাণীতে রোগের সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে কালাজ্বরের জন্য দায়ী লিসম্যানিয়া ডোনোভানি (**Leishmania donovani**)। মানুষের ক্ষেত্রে তিনটি প্রজাতি প্রধানতঃ ক্ষতি করে। যেমন— L. dnovani, L. tropica, L.brasiliensis.। ভারতবর্ষ, চীন, আফ্রিকা, দক্ষিণ ইউরোপে L. donovani'র প্রভাবে কালাজ্বর হয়। ইহাদের দুইটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন ফ্লাজেলাযুক্ত ও ফ্লাজেলাবিহীন। ফ্লাজেলাবিহীন অবস্থা মানুষের দেহে পাওয়া যায়।

ইহারা কুকুরের রেটিকিউলো এণ্ডোথেলিয়াম কোষের মধ্যে বাস করে। যে সকল অংগে রেটিকিউলো এণ্ডোথেলিয়াল কোষ আছে প্রধানতঃ সেই সকল অংগে ইহাদের পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণতঃ নিউট্রোফিল ও মোনোসাইট শ্বেতকনিকা দ্বারা বাহিত হয়। ইহাদের দেহ 2 হইতে 4 মাইক্রন লম্বা হয়। দেহে একমাইক্রন ব্যাস বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে। দেহকোষে ব্লেফেরোপ্লাষ্ট, অ্যাক্সোনিম থাকে। পতংগের মধ্যে ফ্লাজেলাযুক্ত লেপটোমোনাড দশা 5 হইতে 10 মাইক্রন লম্বা ও 2 হইতে 3 মাইক্রন চওড়া হয়। পূর্ণাংগ লেপটোমোনাড 15 হইতে 20 মাইক্রন লম্বা হয়। এই দশায় একটি লম্বা ফ্লাজেলা থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ শ্রেণীঃ—স্পোরোজোয়া (Sporozoa) ॥

(Gr, Spora, Seed ; Zoon, animal)

2,000 এর বেশী প্রজাতি এই শ্রেণীভূক্ত। ইহারা এত ক্ষুদ্র এবং ইহাদের পারস্পরিক ঘনিষ্টতা সম্বন্ধে কোন ধারনা থাকায় কিছু কিছু প্রজাতিকে এই শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত করাও কঠিন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ

1. **কিউটিক্‌ল (Cuticle)** অথবা পেলিক্‌ল **(Pellicle)** দ্বারা সমগ্র দেহ আবৃত।

2. একটিই মাত্র নিউক্লিয়াস; **মেগানিউক্লিয়াস (Meganucleus)** অনুপস্থিত।

3. চলনের জন্য ইহাদের কোন বিশেষ অঙ্গাংশ নাই।

4. পরজীবীতার জন্য খাদ্যগহ্বর অনুপস্থিত।

5. দেহের বহিরাবরনীর শোষনের দ্বারাই পুষ্টি সংঘটিত হয়।

6. অযৌন জনন বহু বিভাজনের দ্বারা এবং যৌন জনন স্পোর সৃষ্টির অনুসরণে **সিনগ্যামীর (Syngamy)** দ্বারা সম্পন্ন হয়।

7. বেশ কিছু ক্ষেত্রে জীবনচক্র দুইটি পোষকের মাধ্যমে অযৌন ও যৌন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়।

8. সম্পূর্ণরূপে পরজীবী; **অন্তঃকোষীয় (cystozoic)** অথবা অন্তঃ-কোষীয় কলার মধ্যে (histozoic) অথবা গহ্বরে (coelozoic) অধঃপতিত অবস্থায় বাস করে।

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর লোহিত রক্ত কণিকার অন্তঃকোষীয় পরজীবী ও ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী প্লাসমোডিয়াম হইল স্পোরোজোয়া শ্রেণীর অন্যতম গন (Genus)।

প্লাসমোডিয়াম (Plasmodium)

॥ ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু, গঠন ও জীবনচক্র ॥

ম্যালেরিয়া জীবাণু প্লাসমোডিয়াম মানুষ ও অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীতে ম্যালেরিয়া রোগের সৃষ্টি করে। মানুষের বহু প্রকার রোগের মধ্যে এই রোগ

অন্যতম। শুধু অন্যতমই নয়, মারাত্মক ও বটে। ভারতবর্ষ ও আমেরিকার দক্ষিন পূর্ব রাজ্যগুলিতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। 1943 খৃষ্টাব্দে রাসেলের রিপোর্ট অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের 30 কোটি মানুষ ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও প্রতি বৎসর প্রায় কয়েক লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে এই রোগের প্রকোপে।

মানবদেহে নিম্নলিখিত চারিটি বিভিন্ন প্রজাতির প্লাসমেডিয়াম ম্যালেরিয়া রোগ ঘটায়ঃ

(i) প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স (P. Vivax)
(Grassi and Felet ti, 1890)

(ii) প্লাসমোডিয়াম ফল্‌সিপেরাম (P. falciparum)
(Welch, 1897)

(iii) প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি (P. malariae)
(Laveran, 1881)

(iu) প্লাসমোডিয়াম ওভেল (P. Ovale).
(StePhens, 1922)

প্রাণীরাজ্যে প্লাসমোডিয়ামের অবস্থান নিম্নরূপ।

পর্বঃ এপিকমপ্লেক্স
শ্রেণীঃ স্পোরোজোয়া
উপশ্রেণীঃ ককসিডিয়া
বর্গঃ ইউককসিডিয়া
গনঃ প্লাসমোডিয়াম **(Plasmodium).**

1885 খৃষ্টাব্দে মার্চিয়াফাভা ও সেলি **(Marchiafava and celli, 1815)** প্লাসমোডিয়াম গনের সৃষ্টি করেন। এই গনের অন্তর্ভুক্ত সকল পরজীবী আদ্যপ্রাণী মানুষের এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীর লোহিত কনিকায় বাস করে এবং বিভিন্ন প্রকার ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি মরে। তাই এই গনের পরজীবী আদ্যপ্রাণী গুলিকে **ম্যালেরিয়া পরজীবী (Malarial Parasite)** বলে।

ভৌগলিক বিস্তার (Geographical distribution)

ম্যালেরিয়া পরজীবী **40° S** হইতে **63° N** এ অবস্থিত সকল দেশেই পাওয়া যায়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলই ইহাদের আদি বাসভূমি। মানবদেহে সৃষ্ট রোগের চারিটি প্রজাতির মধ্যে **প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের** প্রাদুর্ভাব

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই খুব বেশী। প্লাসমোডিয়াম ফল্‌সিপেরাম গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। নাতিশীতষ্ণ অঞ্চলেই প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি এবং প্লাসমোডিয়াম ওভেলর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

বাসস্থান (Habitat)

মানবদেহে প্লাসমোডিয়াম পরজীবি রূপে প্রধানত: যকৃতের কাষে ও রক্তের লোহিত কনিকায় অবস্থান করে। যকৃৎ কোষে উহারা বারবার বিভাজিত হইয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় এবং নূতন যকৃৎ কোষ আক্রমন করে। এইখানে পরিস্ফুটন দশা সমাপ্ত করিয়া লোহিত কনিকায় প্রবেশ করেও উহাদের মধ্যে অন্তঃপরজীবি হিসাবে বাস করে। এরপর মশকীর দেহে স্থানান্তরিত হয়। মশকীর দেহে এই পরজীবীরা পুনঃ পুনঃ বিভাজনের দ্বারা অন্ত্র হইতে ক্রমশঃ লালাগ্রন্থিতে আসিয়া প্রবেশ করে ও মানুষের দেহে পুনরায় সংক্রামিত হইবার অপেক্ষায় থাকে।

প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের জীবন ইতিহাস (Life history of Plasmodium vivax)

প্লাসমোডিয়ামের জীবনচক্র জটিল। দুইটি পৃথক পোষকের মাধ্যমে প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স তাহার জীবনচক্র সমাধা করে। এই পরজীবি দ্বারা সৃষ্ট ম্যালেরিয়া রোগের নাম **বিনাইন টার্সিয়ান (Benign tertian)** অথবা **ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়া**।

জীবন চক্র (Life Cycle) ঃ

অযৌন ও **যৌন** উভয় পদ্ধতিতেই প্লাসমোডিয়াম প্রজনন ঘটায়। **প্রথম পোষক মানুষে** অযৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার হয়। প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স মানুষের দেহের অভ্যন্তরে যকৃৎ ও লোহিত কনিকায় বাস করিয়া এই স্থানে অযৌন জনন সম্পন্ন করে। এই বিভাজন প্রক্রিয়াকে সাইজোগনি (Schizogony) বলে। যৌনচক্র ঘটে **স্ত্রী এনোফিলিস্ মশকীর** দেহে। এই চক্রের প্রারম্ভে পুং ও স্ত্রী গ্যামেটোসাইট মানুষের রক্তে পরিস্ফুটিত হয়। মশকীর দেহে পৌছাইলে এই গ্যামেটোসাইটগুলি পুনরায় বিভাজিত হয় ও জনন কোষানুর (Gametocyte) সৃষ্টি করে। পুং ও স্ত্রী জননকোষের

** ভারতে ম্যালেরিয়া পরজীবীর অন্তবর্তী পোষক হিসাবে যে সকল প্রজাতির অ্যানোফিলিস মশকী দায়ী তাহাদের মধ্যে A. Stopersoni, A. maculatus A. fluialltis এবং A. Culcifacies উল্লেখযোগ্য।

মিলনের ফলে সৃষ্ট জাইগোট স্পোরোগোনি (**Sporogony**) পদ্ধতিতে স্পোর সৃষ্টি করে। স্পোরগুলি বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হইয়া স্পোরোজয়েট (**Sporozoit**) সৃষ্টি করে। মশকীর দেহে যৌন জনন সম্পন্ন হয় বলিয়া মশকীকে **নির্দিষ্ট** পোষক (**Definitive host**) বা প্রাথমিক পোষক বলে।

সুতরাং প্লাসমোডিয়ামের জীবনচক্র নিম্নলিখিত পর্যায়ে বিভক্ত :

a. প্রি-এরিথ্রোসাইটিক (**Pre-erylhrocytic**) বা এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক (**Exo erythrocytic**) চক্র—অযৌনচক্র, মানুষের যকৃৎ কোষে সংঘটিত হয়।

d. এরিথ্রোসাইটিক (**Erythrocytic**) চক্র—আর একটি অযৌন চক্র, মানুষের রক্তের লোহিত কনিকার অভ্যন্তরে ঘটে।

c. যৌন চক্র (**Sexual Cycle**) স্ত্রী এনোফিলিসের অন্ত্রে সংঘটিত হয়।

অযৌন প্রজনন

মানুষের দেহে (মনুষ্যচক্র) :—

মনুষ্যচক্র নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট দশার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। যখন পরিনত স্পোরোজয়েট বহনকারী স্ত্রী এনোফিলিস মশা দংশন প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে উহার লালার সহিত ঐ স্পোরোজয়েটগুলি মানুষের রক্তে নিক্ষেপ করে তখন হইতেই প্লাসমোডিয়ামের জীবন ইতিহাসে মনুষ্যচক্র হয়।

a. প্রি-এরিথ্রোসাইটিক ও এক্সোএরিথ্রোসাইটিক চক্র :

(সাইজোগনি) দংশনের মাধ্যমে মশকীর লালার সহিত যুক্ত স্পোরোজয়েটগুলি মানুষের রক্তে আসিয়া পড়ে।

স্পোরোজয়েট্স (**Sporozoits**) সাধারন অনুবীক্ষণযন্ত্রে স্পোরোজয়েট গুলি দেখিতে কাস্তের ন্যায়। ইহারা $10\mu—15\mu$ লম্বা, মধ্যস্থান সামান্য স্ফীত এবং দুই পার্শ্ব মাকুর ন্যায় সরু। স্ফীত অংশে ডিম্বাকৃতি নিউক্লিয়াস দেখা যায়। ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে স্পোরোজয়েটের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ : (Garnham et. al, 196o).

1. স্থূল পর্দা দ্বারা স্পোরোজয়েটের দেহ আবৃত।

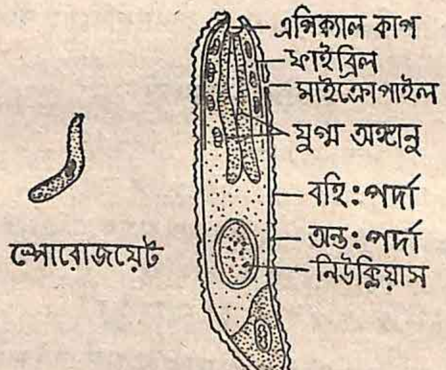
2. অগ্রপান্তের শীর্ষদেশ পেয়ালার ন্যায় একটু চাপা এবং তিনটি আংটির ন্যায় খাঁজ যুক্ত।

3. কতকগুলি ফাঁপা **সঙ্কোচনশীল অনুসূত্র (Contractile fibril)** দ্বারা এই পেয়ালার অংশটি যুক্ত।

4. অগ্রদেশে দীর্ঘায়িত ইবং স্ফীত একজোড়া যুগ্ম অঙ্গানু বিদ্যমান। সম্ভবতঃ ইহারা প্রোটিওলাইটিক এনজাইম নিঃসৃত করিয়া স্পোরোজয়েটকে কলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সহায়তা করে।

5. স্পোরোজয়েটের সারা দেহে অনেক কুন্তলী পাকানো টিউবের মত যন্ত্র **(convoluted tubule)** দেখা যায়, কিন্তু ইহাদের কার্য্য এখন ও জানা যায় নাই।

6. ভেসিকুলার **(Vesicular)** নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রস্থলেই **নিউক্লিওলাস (Nucleolus)** এবং সাইটোপ্লাজমে প্রচুর মাইটোকনড্রিয়া দেখা যায়।



চিত্র-40 a) সাধারন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে এবং b) ইলেকট্রন অনুবীক্ষন যন্ত্রে স্পোরোজয়েটের বৈশিষ্ট্য।

স্পোরোজয়েট গুলি মানুষের রক্তে ভাসিতে থাকে। তারপর শিরা রক্তের মধ্যে বাহিত হইয়া অর্ধঘন্টার মধ্যেই যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষে পৌছায়। এই কোষে প্রবেশ করিয়া ইহারা অন্তঃকোষীয় পরজীবীরূপে বাস করিতে শুরু করে। যকৃৎ কোষে স্পোরোজয়েটগুলির আকৃতির পরিবর্তন ঘটে এবং 8-9 দিনের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সাইজণ্টে **(Schizont)** এ পরিনত হয়। পূর্ণাঙ্গ সাইজণ্টের পরিধির মাপ 42 μ এবং ইহার মধ্যে প্রায় 12,000 মেরোজয়েট **(Merozoite)** সাইজগনি পদ্ধতিতি উৎপন্ন হয়।

সাইজণ্ট বিদীর্ণ হইলে ক্রিপ্টো-মেরোজয়েট (**crypto-merozoite**) গুলি মুক্ত হয়। প্রতিটি মেরোজয়েটে ক্রোমাটিন খণ্ড ও সামান্য সাইটোপ্লাজম থাকে।

প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি যকৃৎ কোষে একটি চক্রের মাধ্যমে আট দিনে সম্পাদিত হয়। উৎপন্ন মেরোজয়েটগুলি রক্তস্রোতে বাহিত হইয়া লোহিত কনিকাকে আক্রমন করে অথবা পুনরায় নূতন যকৃৎকোষ-গুলিকে আক্রমন করে ও আবার সাইজোগনি প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। যকৃৎ কোষের এই **এক্সোএরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি (Exo-erythrocytic Schizogony)** নামে অভিহিত।

পরিনতি পর্যায়কাল (Incudation Period)

পরজীবির পোষকদেহে প্রবেশের সময় হইতে রোগলক্ষন প্রকাশের মধ্যবর্তীকালই পরিনতি পর্যায়কাল নামে অভিহিত। এই সময়কাল 14 দিনের মত।

b. এরিথ্রোসাইটিক চক্রঃ (সাইজোগনি)

লোহিত রক্তকনিকায় মেরোজয়েটের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই এই চক্র শুরু হয়। রক্তকোষ মধ্যে মেরোজয়েট খাদ্যগ্রহণ করিয়া **ট্রোফোজয়েট (Trophozoit)** দশায় পরিণত হয়। লোহিত রক্তকনিকা হইতে খাদ্যগ্রহণ করিয়া ট্রোফোজয়েট গুলির দেহের বৃদ্ধি ঘটে। ইহার ভিতর পরজীবির দেহে একটি গহ্বর বা ভ্যাকুওলের (**Vacuole**) সৃষ্টি হয়। এই ভ্যাকুওলের বৃদ্ধির ফলে সাইটোপ্লাজম পরজীবী দেহকোষের পরিধি বরাবর সরিয়া যায় এবং নিউক্লিয়াসও কেন্দ্র হইতে পরিধিতে সরিয়া আসে। ট্রোফো-জয়েটের এই দশাকে **সিগ্‌নেট রিং (Signet ring** বলে।

* লিস্‌ম্যান রঞ্জকের দ্বারা রঞ্জিত করিলে ট্রোফোজয়েটকে লোহিত রক্ত কোষের মধ্যে একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির আংটির ন্যায় দেখিতে হয়। রিংয়ের ব্যাস 2·5μ থেকে 3μ পর্যন্ত হয়। নীলাভরংয়ের সাইটোপ্লাজমের একপার্শ্ব স্থূল এবং অন্যপার্শ্ব পাতলা ও সরু। একটি বড় গহ্বরকে বেষ্টন করিয়া থাকে। লাল রংয়ের নিউক্লিয়াসটি সাইটোপ্লাজমের পাতলা ও সরু অংশেই অবস্থিত। প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সে একটিই রিং দেখা যায়। কিন্তু প্লাসমোডিয়াম ফলসিপেরামে দুইটি পর্য্যন্ত রিং পৃথক ভাবে লোহিত কনিকায় দেখা যাইতে পারে, অর্থাৎ এই প্রজাতি একাধিক সংখ্যায় একটী লোহিত কনিকায় প্রবেশ করিয়া থাকে।

প্রায় 10 ঘণ্টা বৃদ্ধি ঘটার পরে পরজীবি কোষের সাইটোপ্লাজমে একধরনের পিঙ্গলবর্ণের রঞ্জক পদার্থ জমা হইতে থাকে। এই দানা গুলিকে হিমো-

জয়েন দানা (**haemozoin granules**) বলে। এই সময় লোহিত কনিকার আকার দ্বিগুন হয় এবং ইহার আকৃতি পরিবর্তিত হয়। পরজীবীর সকল ক্ষণপদ অভিক্ষেপ লুপ্ত হয় ও গোল আকার প্রাপ্ত হয় এবং ভ্যাকুওল ও লুপ্ত হয়। এই সময় হিমোগ্লোবিন **ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার** দরুন লোহিত কনিকা কিছুটা বিবর্ণ হইয়া যায় এবং লোহিত কনিকার যে স্থানে পরজীবী থাকে না সেই স্থানের সাইটোপ্লাজমে কিছু দানা দেখা যায়। এই দানাগুলিকে সুফনার্স ডট্‌স **(Schuffneri's dots) বলে। 36 হইতে 40 ঘণ্টার পর ট্রফোজয়েট পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ইলেকট্রন অনুবীক্ষন যন্ত্রে

ট্রোফোজয়েটের বৈশিষ্ট্য (লোহিত রক্ত কনিকার মধ্যে অবস্থিত।) **নিম্নরূপঃ (Rudzinsk et. al, 1965)**

1. দুইটি আবরনী দ্বারা আবৃত। ইহাদের **প্লাজমেলেমা (Plasmalemma)** বলে।



চিত্র-41 ইলেকট্রন অণুবীক্ষন যন্ত্রে ট্রোফোজয়েটের বৈশিষ্ট্য।

2. সাইটোপ্লাজমে ঘন দানাদার বস্তু দেখা যায় এবং সম্ভবতঃ ইহ রাইবোনিউক্লিও প্রোটিন সমৃদ্ধ।

3. নিউক্লিয়াসটি বড় এবং নিউক্লিও পর্দায় রাইবোজোম দানা দেখা যায়।

4. এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকা বিভিন্ন আকারের থলির ন্যায়।

5. দানাদার মাইটোকনড্রিয়া দ্বিস্তর যুক্ত।

** প্লাসমোডিয়াম ফল্‌সিপেরামে এই দ নাগুলি থাকে না।

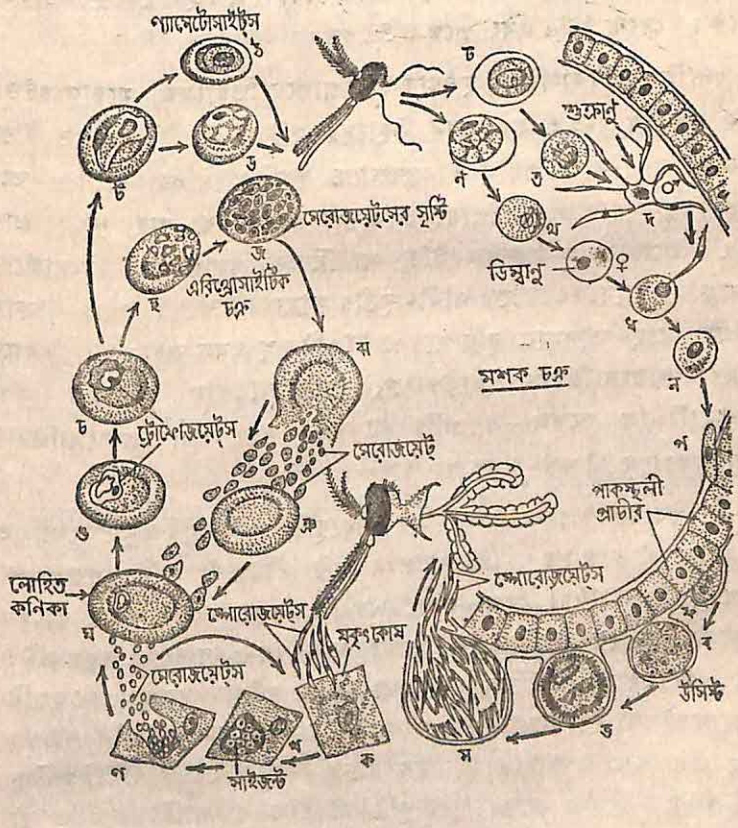
6. গলগিবডি কতকগুলি ক্ষুদ্র নালিকা দ্বারা তৈয়ারী। ইহারা এক সারিতে অবস্থান করে।

7. সাইটোপ্লাজমে দ্বিপর্দ আবৃত অনেক গহ্বর দেখা যায়। ইহাদের কার্য এখনও জানা যায় নাই।

8. একটি দ্বিস্তর যুক্ত কেন্দ্রাভিসারি অঙ্গানু প্লাসমোলেমার সহিত যুক্ত দেখা যায়।

9. পিনোসাইটিক গহ্বরগুলি খাদ্যগহ্বরে পরিনত।

10. হিমোজয়েন দানা খাদ্যগহ্বরে দেখা যায়।



চিত্র-42 প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের জীবনচক্র

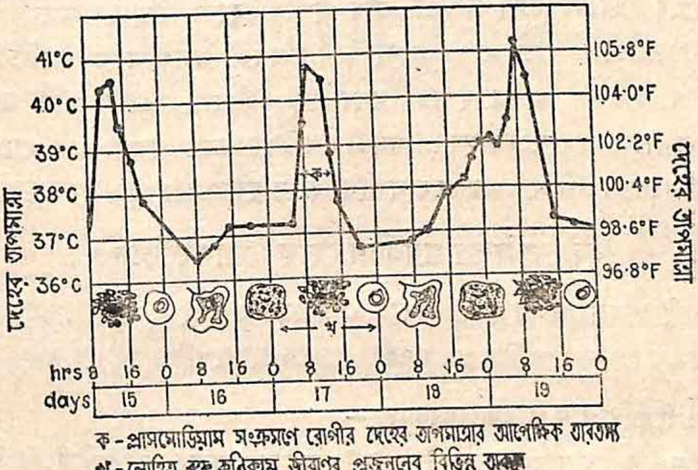
পূর্ণতা প্রাপ্ত ট্রোফোজয়েট লোহিত কনিকার প্রায় সবটা অবস্থান করে এবং সাইজণ্টে পরিনত হয়। এই সাইজণ্ট সাইজোগনি প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়। পরবর্ত্তী **6—8** ঘণ্টার মধ্যে ইহার নিউক্লিয়াস বিভাজন সম্পূর্ণ হয় এবং **12—24** টি, গড়ে **16** টি অপত্য জীব সৃষ্টি করে। এইগুলিকে মেরোজয়েটবলে। এই মেরোজয়েটগুলি ফুলের পাপড়ির ন্যায় দুইটি স্তবকে সাজানো থাকে এবং ইহাদের কেন্দ্রস্থলে হিমোজয়েন দানা জমা হয়। ইহাকেই **রোজেট (Rosette)** দানা বলে। ইহার কিছুক্ষন পরেই লোহিত রক্তকনিকা সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হইয়া বিদীর্ণ হয় এবং মেরোজয়েটগুলি মুক্ত হয়।

মেরোজয়েটের (Merozoit) আকৃতি ডিম্বাকার; ইহার কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস থাকে। দৈর্ঘ্যে **$1{\cdot}5\mu$** এবং প্রস্থে **$0{\cdot}5\mu$** হয়।

লোহিত কনিকা বিদির্ণ হওয়ার ফলে প্লাসমোডিয়ামের মেরোজয়েটগুলি যখন রক্তরসে নির্গত হয় তখন উহাদের সহিত পরজীবী উদ্ভুত **টক্সিন (Toxin)** বা বিষাক্ত পদার্থ ও রক্তস্রোতে আসিয়া মিলিয়া থাকে। তবে কিছু কিছু মেরোজয়েট পোষকের রক্তের শ্বেতকনিকা দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। উপরোক্ত ক্ষতিকারক **টক্সিন** বা বিষাক্ত পদার্থ এবং হিমোজয়েন দানাগুলি পোষকের রক্তের শারীর বৃত্তীয় সাম্য নষ্ট করে। ফলে আক্রান্ত রোগীর দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ও কাঁপুনি সহ প্রবল জ্বর হয়। এখানে উল্লেখ্য **প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স, প্লাসমোডিয়াম** ম্যালেরি এবং **প্লাসমোডিয়াম ওভেল**—এ প্রতি 48 ঘণ্টা অন্তর এবং **প্লাসমোডিয়াম** ফল্‌সিপেরামে 72 ঘণ্টা অন্তর জ্বর আসে।

লোহিত রক্তকোষে সাইজোগনির পুনরাবৃত্তির ফলে আরও নূতন লোহিত রক্তকনিকা আক্রান্ত হয়। এই আক্রমন বেশী দীর্ঘস্থায়ী হইলে রক্তশূন্যতা রোগ বা অ্যানিমিয়া দেখা দেয়, এমনকি, মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। পরজীবীর জীবনের পরিসমাপ্তি তখনই ঘটে যখন পোষকের মৃত্যু ঘটে। তাই বংশরক্ষার তাগিদে পোষকের মৃত্যু ঘটিবার পরেই কতকগুলি মেরোজয়েট লোহিত রক্তকনিকায় প্রবেশ করিয়া আকৃতির পরিবর্তন ঘটায়। কোন এক অজ্ঞাত কারনে লোহিত রক্তকনিকা আক্রমনকারী কিছু কিছু মেরোজয়েট অযৌন চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটাইতে না পারিয়া পুং ও স্ত্রী গ্যামেটোসাইট **(Gametocyte)**—এ রূপান্তরিত হয়। উল্লেখযোগ্য

যে, সকল সংক্রামিত লোহিত রক্তকনিকায় অপরিনত গ্যামেটোসাইট থাকে, তাহারা রক্তস্রোতে ভাসিয়া বেড়ায় না, প্লীহা, মজ্জায় ও রক্তনালীতে গিয়া



চিত্র-43 **R. B. C.** তে প্লাসমোডিয়ামের বিভিন্ন দশার সংগে দেহতাপের সম্পর্ক

উপস্থিত হয়। 96 ঘন্টার মধ্যে ইহারা পূর্ণতা লাভ করে। ইহারা সাইজণ্টের তুলনায় আকারে বড় হয়।

দুই ধরনের গ্যামেটোসাইট সৃষ্টি হয়—**পুং বা মাইক্রো (Micro) গ্যামেটোসাইট** এবং **স্ত্রী বা ম্যাক্রো (Macro) গ্যামেটোসাইট**। পুং ও স্ত্রী গ্যামেটোসাইট নিম্নলিখিত উপায়ে চেনা যায়।

পুং বা মাইক্রো (Micro) গ্যামেটোসাইটঃ—

আকারে ছোট (9-10μ); নিউক্লিয়াস বড় এবং পার্শ্বদেশে পরিব্যাপ্ত। ইহার সাইটোপ্লাজম রঞ্জকে হালকা নীল রং হয়।

স্ত্রী বা ম্যাক্রো (Macro) গ্যামেটোসাইটঃ—

আকারে একটু বড় (**10-12**μ); নিউক্লিয়াস ক্ষুদ্র, ঘন এবং প্রান্তসীমায় অবস্থিত। ইহার সাইটোপ্লাজম রঞ্জকে গাঢ় নীল হয়।

মশকীর দেহে স্থানান্তরিত

স্পোরোজয়েট মানুষের শরীরে প্রবেশ করিবার 16 দিন পর প্রান্তীয় রক্তে গ্যামেটোসাইটগুলি পাওয়া যায়। এই অবস্থায় যদি মশক রক্ত শোষনের মাধ্যমে ইহাদের গ্রহণ না করে তাহা হইলে ইহারা মানুষের রক্তে 7 দিনের বেশী বাঁচিতে পারে না। এনোফিলিস মশকী রোগাক্রান্ত ব্যাক্তির রক্ত শোষণ করিলে বিভিন্ন দশার ম্যালেরিয়া জীবানু রক্তের সঙ্গে মশকীর পাকস্থলীতে স্থানান্তরিত হয়। মশকীর পরিপাকতন্ত্রের হজমী রসে গ্যামটো-সাইট ভিন্ন পরজীবির অন্যান্য দশাগুলি ধ্বংস হইয়া যায়।

যৌনপ্রজনন মশকীর দেহে (মশকীচক্র) ঃ

যদিও ম্যালেরিয়ার পরজীবীর যৌনচক্র শুরু হয় মনুষ্যপোষকে কিন্তু প্রকৃত যৌনজনন সম্পদিত হয় মশকী পোষকে স্থানান্তরিত হইবার পর।

গ্যামেটোগনি (Gametogony)—

রক্তকনিকার মধ্যে গ্যামেটোসাইটের ক্রমান্বয়ে চলন ও প্রসারনের দরুন লোহিত রক্তকনিকার দেওয়াল বিদির্ন হয় এবং গ্যামেটোসাইট মুক্ত হয়। মশকীটির মধ্য অন্ত্র বা পাকস্থলীতে পুং গ্যামেটোসাইট ও স্ত্রী গ্যামেটোসাইট যথাক্রমে পুং ও স্ত্রী **গ্যামেট (Gamete)**—এ রূপান্তরিত হয়। প্রতিটি পুং গ্যামেটোসাইট হইতে 4-8 টি সুত্রাকার **মাইক্রোগ্যামেট** বা **পুং জননকোষ** উৎপন্ন হয়। এই পদ্বতিকে **এক্স-ফ্লাজেলেশন (Ex-Flagellation)** বলে মায়েসিস পদ্বতিতে পুংজনন কোষ উৎপন্ন হয় এবং ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্দ্ধেক হয় ($2n \rightarrow n$)।

স্ত্রী গ্যামেটোসাইটের গ্যামেটে রূপান্তরিত হইতে অপেক্ষাকৃত কম পরিবর্ত্তন হয়। একটি ম্যাক্রোগ্যামেটোসাইট হইতে একটিমাত্র স্ত্রী জনন কোষ উৎপন্ন হয়। ইহার ও নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় মায়োসিস পদ্ধতিভে অর্থাৎ, সৃষ্ট গ্যামেটে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয় ($2n—n$)। মায়োসিস বিভাজনের দ্বারা স্ত্রী জননকোকোষ পোলারবডি উৎপন্ন করিয়া পরিণত হয়। এইভাবে এক একটি ম্যাক্রোগ্যামেট বা ডিম্ব গঠিত হয়।

নিষেক (Fertilization) পরিণত স্ত্রী জননকোষের প্রান্তসীমায় একটি স্থান সামান্য ফুলিয়া ওঠে ইহাই **নিষেক শঙ্কু (fertilization Cone)**। এই স্থান পুংজনন কোষকে আকৃষ্ট করে এবং একটি মাত্র সুত্রবৎ পুং জননকোষ

স্ত্রী জনন কোষের স্ফীত অংশে সংলগ্ন হয় এবং স্ত্রী জনন কোষের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে। পুং ও স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াসের নিষেকের ফলে জাইগোট উৎপন্ন হয়। দুইটি গ্যামেট নিউক্লিয়াসের **(n+n)** মিলনের ফলে পুনরায় **(2n)** বা ডিপ্লোয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা ফিরিয়া আসে। দুইটি অসম আকৃতির গ্যামেটের এই ধরনের মিলনকে অ্যান-আইসোগ্যামি **(Anisogamy)** বলে। মশকের রক্ত শোষনের কুড়ি মিনিট হইতে দুই ঘণ্টার মধ্যে নিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়।

উকাইনেটি (Ookinete)—পরবর্ত্তী **24** ঘণ্টায় জাইগোট দীর্ঘাকৃতি লাভ করে। ইহার দুই প্রান্ত ছুঁচালো হয় ও শীঘ্রই ইহা চঞ্চল ও গতিশীল হইয়া ওঠে। পরে ইহা মশকীর পাকস্থলীর প্রাচীর ভেদ করিয়া অগ্রসর হয় ও পাকস্থলীর বহির্গাত্রে আসিয়া পৌছায়। এই অবস্থায় জাইগোটকে **ভর্মি-কিউল (Vermicule)** বা **উকাইনেটি (Ookinete)** বলে।

ইলেকট্রন অনুবীক্ষনযন্ত্রে উকাইনেটির বৈশিষ্ট্যঃ

(Garnham et. al, 1962)

1. পেলিকল্ বা আবরণী—**দুইটি,** বহিঃ আবরণী কুঞ্চিত কিন্তু অন্তঃ আবরণীটি মসৃন।

2. অন্তঃআবরণীর ঠিক নিম্নে **55-65** টি প্রান্তিক ফাঁপা **অনুসূত্র (micro-tubules)** দেখা যায়। ইহারা সক্রিয় চলনে সাহায্য করে।

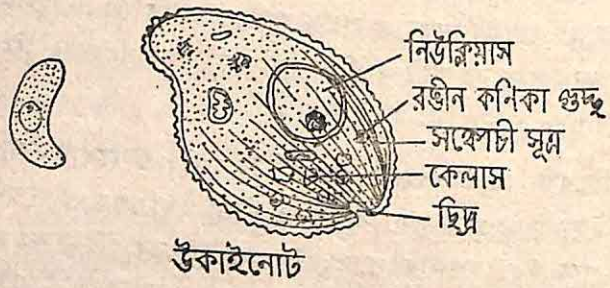
3. সম্মুখভাগে ছিদ্রের ন্যায় **সাইটোস্টোম** থাকে। ইহা হইতে প্রোটিওলাইটিক পদার্থ নিঃসৃত হয়।

4. নিউক্লিওলাস সম্বলিত দানাদার নিউক্লিয়াস থাকে।

5. সাইটোপ্লাজমে মাইটোকনড্রিয়া, লাইসোজোম, কেলাসদানা প্রভৃতি দেখা যায়।

কি প্রকারে উকাইনেটি মশকের মধ্যে অন্ত্র প্রকার ভেদ করিয়া উহার বহিস্পার্শে আসিয়া অবস্থান করে সে বিষয়ে **গার্ণহাম** এবং অন্যান্য বিশদ বিবরন দেন। উকাইনেটি প্রথমে **পেরিট্রফিক পর্দার (Peritrophic membrane)** সংস্পর্শে আসে। এরপর এই বাধা অতিক্রম করিয়া শ্লেষ্মাকোষের ব্রাশবর্ডারের সংস্পর্শে আসে। ব্রাশবর্ডারকে ঠেলিয়া পোষকের আন্ত্রিককোষের কোষ পর্দার সংস্পর্শে আসে। এইখানে উকাইনেটির

সাইটোস্টোম নিঃসৃত প্রোটিওলাইটিক উৎসেচক পোষকের (মশকীর) কোষপর্দা দ্রবীভূত করে এবং ইহা কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এইভাবে পরিযান করিয়া অবশেষে উকাইনেটি পোষক কোষের বহিঃসীমা ও বেসমেণ্ট পর্দার মধ্যবর্তী অঞ্চলে উপনীত হয়।

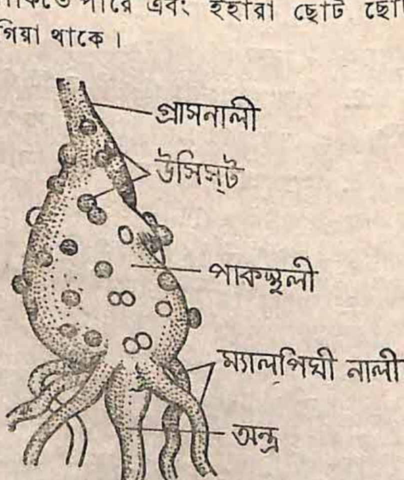


চিত্র-44 উকাইনেটির বৈশিষ্ট্য

উসিস্ট (Oocyst)—এইখানে উপনীত হইবার পর উকাইনেটির দেহটিকে আবরণীবিদ্ধ করে। এই অবস্থায় ইহাকে **উসিস্ট** বা **স্পোরণ্ট (Sporont)** বলে। উসিস্টটি গোলাকার এবং ইহার ব্যাস 6μ হইতে 60μ পর্যন্ত হয়। মশকীর দেহ হইতে পুষ্টি সংগ্রহ করে এবং দেহের বৃদ্ধি ঘটে। সংক্রামিত একটি মশকীতে 50-500 টি উসিস্ট থাকিতে পারে এবং ইহারা ছোট ছোট গুটির ন্যায় পাকস্থলীর দেওয়ালে লাগিয়া থাকে।

স্পোরোগোনি (SPorogony)—

অন্তঃপর প্রতিটি উসিস্টে অযৌন জনন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইহার নিউক্লিয়াস পুনঃ পুনঃ বিভাজিত হয় এবং প্রতিটি নিউক্লিয়াস সাইটাপ্লাজম দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কাস্তের আকৃতির বহুসংখ্যক স্পোরোজয়েট **(Sporozoit)** গঠন করে। এই বিভাজন প্রক্রিয়াকে স্পোরোগোনি বলে। একটি স্পোরণ্ট



চিত্র-45 মশকীর খাদ্যনালীতে উসিস্টের অবস্থান

বহুবিভাজনের ফলে প্রায় দশসহস্র স্পোরোজয়েট সৃষ্টি করিতে পারে। উল্লেখযোগ্য, যে প্লাসমোডিয়ামের জীবনীতে মাধ্যমিক **স্পারোব্লোস্ট দশা (Sporoblast stage)** নাই। জাইগোট হইতে সরাসরি স্পোরোজয়েট গঠিত হয়। ইহারা মশকী কর্তৃক রক্তশোষণের 10-13 দিনের মধ্যে পরিণতি লাভ করে। মশকীর দেহে এই চক্র সম্পূর্ণ হইতে 2-4 সপ্তাহ সময় লাগে। পূর্ণতা-প্রাপ্ত উসিস্ট বিদির্ণ হইলে স্পোরোজয়েটগুলি হিমোসিলে **(haemocoel)**—এ নিক্ষিপ্ত হয় এবং রক্তসংবহনের মাধ্যমে ডিম্বাশয় ব্যাতিরেকে মশকীর দেহের সকল অংগে ছড়াইয়া পড়ে, ক্রমে লালাগ্রন্থিতে উপনীত হয় এবং লালা নালীতে ইহারা ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া অবস্থান করে। একটি সংক্রামিত মশকীতে প্রায় 2,00,000 টি স্পোরোজয়েট থাকিতে পারে। এই অবস্থায় সংক্রামিত মশা যখন মানুষের রক্ত শোষণ করে তখনই স্পোরোজয়েটগুলি মানুষের দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ম্যালেরিয়া পরজীবীর মশক চক্র সম্পন্ন করিতে 10 দিন সময় লাগে। মশকীর লালার সহিত স্পোরোজয়েটগুলি মানুষের রক্তে আসিয়া পড়ে এবং যকৃৎ কোষে উপনীত হয়। আবার পরজীবীর অযৌন চক্র এখানে শুরু হয় এবং এই ভাবে ম্যালেরিয়া পরজীবির জীবনচক্র সম্পন্ন হয়।

বিভিন্ন প্রকার ম্যালেরিয়া, জীবানুর গঠন ও পার্থক্য ঃ মানবদেহে নিম্নলিখিত চারিপ্রকার ম্যালেরিয়া বিভিন্ন প্রজাতির প্লাসমোডিয়ামের দ্বারা সৃষ্ট হয়।

i) বিনাইন টার্সিয়ান (Benign Tertian) অথবা **ভাইভ্যাক্স (Vivax)** ম্যালেরিয়া—প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগ। প্রতি 48 ঘণ্টা অন্তর (অর্থাৎ প্রতি তৃতীয় দিনে) কাঁপুনি সহ প্রবল জ্বর হয় এবং রোগের পুনরাক্রমন (relapse) হয়। মৃত্যুর সংখ্যা কম।

ii) ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট টার্সিয়ান (Malignant Tertian)—প্লাসমোডিয়াম ফল্‌সিপেরাম পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগ। প্রতি 36 বা 48 ঘণ্টা অন্তর জ্বর আসে। মৃত্যুহার খুব বেশী।

iii) কোয়ার্টান (quratan) ম্যালেরিয়া—প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগ এবং প্রতি 72 ঘণ্টা অন্তর (অর্থাৎ প্রতি চতুর্থ দিনে) কাঁপুনি সহ প্রবল জ্বর আসে।

iv) ওভেল অথবা মাইল্ড টার্সিয়ান (Ovale or mild tertian) ম্যালেরিয়া—ইহা প্লাসমোডিয়াম ওভেল পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগ। প্রতি দুই দিন পরপর অর্থাৎ 48 ঘণ্টা অন্তর জ্বর আসে। এই রোগের প্রবনতা খুবই কম।

মানবদেহে বিভিন্ন প্রকার ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবীদেরে (বিভিন্ন প্রজাতির প্লাসমোডিয়ামের) গঠনগত ও জীবনচক্রের পার্থক্য।

জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায় ও গঠন	প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স। (P. Vivax)	প্লাসমোডিয়াম ফল্‌সিপেরাম (P. Falciparum)	প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি (P. Malariae)	প্লাসমোডিয়াম ওভেল। P. (Ovale)
1. এক্সোএরিথ্রোসাইটিক চক্রের সময়কাল	8 দিন	5 দিন	14—15 দিন	9 দিন
2. এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির সময়কাল	48 ঘণ্টা	48 ঘণ্টা	72 ঘণ্টা	48 ঘণ্টা
3. প্রতিটি সাইজন্ট হইতে সৃষ্ট মেটাক্রিপ্টোজয়েটের সংখ্যা	10,000	30,000	15,000	15,000
4. পরিনতি পর্যায়কাল	14 দিন	12 দিন	30 দিন	10—14 দিন
5. পরিনত টোফোজয়েট	বড়, অ্যামিবয়েড	ঘন বিন্যস্ত, কনিকা একটি গুচ্ছে পরিণত হয়।	ফিতার ন্যায়।	কিছুটা অ্যামিবয়েড
6. ট্রফোজয়েট রিংফর্ম	আকার 2.5μ, একটি নিউক্লিয়াস। সাইটোপ্লাজম ঘন।	আকার $1.25—1.5\mu$, অনেক সময় দুইটি নিউক্লিয়াস দেখা যায়। সাইটোপ্লাজম পাতলা।	প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের ন্যায়	প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের ন্যায়।

7. পরিনত সাইজণ্ট (লোহিত কনিকায়)	আকার 9-10μ অর্থাৎ সমগ্র লোহিত কনিকাকে ভর্তি করিয়া রাখে।	আকার 4.5-5μ, লোহিত কনিকায় 2/3 অংশ ব্যাপিয়া থাকে।	আকার 6.5 7μ. প্রায় সমগ্র লোহিত কনিকাকে ভরিয়া রাখে	আকার 6.2μ, লোহিত কনিকার 3/4 অংশ ভরিয়া রাখে।
8. মেরোজয়েট	12-24টি। অনিয়মতভাবে গুচ্ছের ন্যায়।	18-24 ; গুচ্ছাকারে অবস্থান করে।	6-12, কেন্দ্রীয় কনিকা গুচ্ছের চারিপার্শ্বে চক্রাকারে বিন্যস্ত।	6-12 ; অনিয়মিত ভাবে বিন্যস্ত।
9. হিমোজয়েন দানা	পীতাভ ধূসর বহু দানাদার	কালো অথবা উজ্জ্বল-বাদামী একটি খণ্ড।	উজ্জ্বল বাদামী মোটা দানা।	উজ্জ্বল, অল্প মোটা দানা
10. আক্রান্ত লোহিত কনিকা	বড় হয়, বিবর্ণ স্যুফনার্স ডট্স প্রচুর থাকে।	বড় হয় না, লালচে বেগুনি রং হয়। মাউরার দানা থাকে।	বড় হয় না, স্যুফনার্স ডট্স অনুপস্থিত	সামান্য বড় হয়, স্যুফনার্স ডট্স প্রথম দিকে দেখা যায়।
11. গ্যামেটোসাইট	গোলাকার	অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি	গোলাকার বা ডিম্বাকার	ডিম্বাকার
12. যৌনচক্রের সময়-কাল (25°c তাপমাত্রায়)	10 দিন	10—12 দিন	25—24 দিন	16 দিন

উপরোক্ত চারিটি প্রজাতির **প্লাসমোডিয়াম** মানুষের চারিপ্রকার ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়। জীবন চক্র প্রায় একই প্রকার হইলেও মনুষ্যচক্রে পার্থক্যগুলি বেশী প্রতীয়মান।

ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ (Symptoms of Malaria fever)

পরজীবীর পোষকদেহে সংক্রমনের বেশ কয়েকদিন পর রোগের লক্ষণগুলি দেখা যায়। পরজীবীর পরিণতি পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে রোগীর প্রচণ্ড কম্প দিয়া জ্বর আসা, দেহের প্রচণ্ড তাপবৃদ্ধি (106°F) এবং শেষে ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া যাওয়া প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ। পূর্বেই বলা হইয়াছে লোহিত রক্ত কনিকা কাটিয়া যাইয়া প্রোটিন, গ্লোবিন ও অন্যান্য পদার্থ কোষ বাহির হইয়া যাইবার জন্যই কাঁপুনির পর জ্বর আসে।

রক্ত শূন্যতা, এই রোগের অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ক্রমাগত লোহিত রক্তকনিকাগুলি পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হইবার ফলে লোহিত রক্তকোষগুলি ধ্বংস হয়। তাছাড়া পরজীবী **হিমোলাইসিন (haemolysin)** নামে **এ্যান্টিবডি (antibody)** নিঃসরন করে এবং ইহার ফলে স্বাভাবিক লোহিত রক্তকোষ সমূহের বিনাশ ঘটে।

ম্যালেরিয়া রোগের এই সব উপসর্গ দেখিয়া সহজেই অন্যরোগ হইতে পৃথক করা যায়। তাছাড়া ম্যালেরিয়ার সঙ্গে স্পীল্ন (Spleen) বা প্লীহার ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক আছে। প্লীহার অস্বাভাবিক আকার (স্পীল্নোমেগালী) দেখিয়া ম্যালেরিয়া আক্রমন টের পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া রোগের উপশম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্লীহার আকৃতি দ্রুত স্বাভাবিক হইয়া আসে।

ম্যালেরিয়া রোগ দমন (Control of Malaria) ঃ ম্যালেরিয়া রোগ দমনের নানাবিধ পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ—

1.) **ভেক্টর (Vector)** অর্থাৎ এনোফিলিস মশকীর নির্মূলীকরণ।

2.) প্রোফাইল্যাক্সিস অর্থাৎ সংক্রমন প্রতিরোধ করা।

3) থেরাপি অর্থাৎ ঔষধের সাহায্যে আক্রমন প্রতিরোধ।

1.) ভেক্টর অর্থাৎ এনোফিলিস মশীকর নির্মূলীকরন—মশার পূর্ণাঙ্গ **(adalt)** এবং শূক **(larva)** দশাকে দমন করিতে পারিলে সংক্রমন হইতে পরিপূর্ণভাবে রেহাই পাওয়া যায়। তাহার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়। পূর্ণাঙ্গ মশা হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত নিয়মিত ডি.ডি.টি.(**D.D.T.**) স্প্রে করান দরকার। সালফার ডাই-অক্সাইডের বাষ্পস্নান (**Fumigation**) পরিণত মশক নিধন করিতে খুবই কার্যক্ষম। যেহেতু মশা বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে, সেইহেতু আবদ্ধ জলাধার গুলিতে নিয়মিত জল স্রোতের ব্যবস্থা করিলে মশা দূরীকরণে সহজেই সুফল পাওয়া যায়। প্রজনন ক্ষেত্রে মশার লার্ভা ও পিউপা

(Pupa) বিনাশ করিবার জন্য থানা, ডোবা ও পুকুরে কেরোসিন তেল, শূকঘ্ন তৈল (Larvicidal oil), জলে ডি ডি.টি গুলিয়া ছড়ান, প্যারিসে গ্রীন ছড়ান প্রভৃতি বিশেষ ফলদায়ক।

জৈবিক নিয়ন্ত্রণ (Biological Control)—এ মশক লার্ভা নিধনের বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে। অনেক মাছ মশার শূককে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ঐ সকল মাছ, যেমন গোল্ডফিস্, তিলাপিয়া, প্রভৃতি। অধিক সংখ্যক এই মৎস্য চাষ মশকলার্ভা নিধনের জৈবিক নিয়ন্ত্রনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লইতে পারে।

2. **প্রোফাইল্যাক্সিস অর্থাৎ সংক্রামন প্রতিরোধ করা**—মশার কামড় ও মশার উপদ্রব থেকে পরিত্রান পাইবার জন্য **আলট্রাসোনিক মশক বিতারক (ultrasonic mosquito repellant)** নামক একপ্রকার যন্ত্র আবিস্কৃত হইয়াছে। তাছাড়া ধূনো, ধোঁয়া দিয়েও মশা তাড়ান যায়।

সাধারণতঃ রাত্রেই মশার প্রাদুর্ভাব বেশী। সুতরাং মশার কামড় হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর একপ্রকার সহজ উপায় **মশারী (Mosquito net)** ব্যবহার। তাছাড়া কিছু কিছু রাসায়নিক **বিতাড়ক দ্রব্য (odomos)** আছে যাহা দেহে মাখিলে মশা কামড়ায় না। অবশ্য এই সব বিতাড়কদ্রব্যের কার্যকারিতা ক্ষণস্থায়ী।

ম্যালেরিয়া হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য নিয়মিত অথবা কয়েকদিন অন্তর ঔষধ সেবনও প্রয়োজন। এই সব অ্যান্টি ম্যালেরিয়া ড্রাগের ভিতর **কুইনাইন, পালুড্রিন** এবং **ডারাপ্রিম** এ সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাইতেছে।

3. **থেরাপি অর্থাৎ ঔষধের সাহায্যে আক্রমন প্রতিরোধ**—বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা ম্যালেরিয়া পরজীবীর বিভিন্ন পরিস্ফুটনের দশাকে বিনাশ করাই একমাত্র পন্থা। **সিঙ্কোনা (Cinchona)** গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত কুইনাইন ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ক্লোরোকুইন, প্রাইমাকুইন, টেট্রাসাইক্লিন প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে বিভিন্ন ধরনের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করা যায়।

ম্যালেরিয়া আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Brief historical account of Malaria)—

'ম্যালেরিয়া' শব্দটি **Italian** শব্দ, **mala** অর্থাৎ bad এবং **aria** অর্থাৎ

air হইতে উদ্ভব। অতীতে এই রোগ সম্বন্ধে অন্যরকম ধারনা ছিল। 1880 খৃষ্টাব্দে চার্লস ল্যাভার্ণ (**charles-Laveran, a frenceh army physician in Algeria**) নামক একজন ফরাসী মিলিটারি • চিকিৎসক মানুষের রক্তে প্রথম এই পরজীবীর (প্লাসমোডিয়াম) সন্ধান পান। গল্‌জি (**Golgi**), 1885 খৃষ্টাব্দে লক্ষ্য করেন যে এই পরজীবী সবসময় ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর লোহিত কণিকায় পাওয়া যায় এবং পরীক্ষালব্ধভাবে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি আবিষ্কার করেন। 1892 খৃষ্টাব্দে একজন জার্মান ডাক্তার, রিচার্ড পিফার (**Richbrd Pfeiffer**) প্রস্তাব রাখেন যে পরজীবী প্লাসমোডিয়াম মানুষের দেহে রক্ত চোষক পতঙ্গের দ্বারা সংক্রামিত হয়। 1898 খৃষ্টাব্দে স্যার রোনাল্ড রস (**Sir Ronald Ross**) পরজীবীর মশকচক্র আবিষ্কারে সমর্থ হন। ইহার জন্য 1902 খৃষ্টাব্দে চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। অবশ্য ঐ একই সালে (1899) গ্রেসি ও (**Grassi**) সম্পূর্ণভাবে ম্যালেরিয়া পরজীবীর (**P. vivax**) জীবনচক্রের (মানুষ ও মশকীর দেহে) বিবরণ দেন।

তাহারপর সর্ট (**Shortt 1948**) খৃষ্টাব্দে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি আবিষ্কার করেন। 1962 খৃষ্টাব্দে **গার্নহাম, বার্ড এবং বেকার Garnham, Bird, and Baker,)** ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে ম্যালেরিয়া পরজীবীর স্পোরোজোয়েট এবং উকাইনেটির বৈশিষ্ট্যগুলির বিবরন দেন।

মনোসিস্টিস (Monocystis)

গঠন ও জীবনচক্র ঃ

কিছু কিছু স্পোরোজোয়া শ্রেণীর প্রাণী আছে যাহারা একটিমাত্র পোষকে পরজীবী হিসাবে বাস করে। ইউগ্রিগেরিনিডা বর্গের অন্তর্গত **মনোসিস্টিস** (Gr., Monos, single+kystis, bladder) এই ধরনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহারা অমেরুদণ্ডী প্রাণী কেঁচোর **শুক্রসংক্রান্ত থলির (Seminal vesicle)** মধ্যে বাস করে। পোষকের দেহে ইহারা স্বাধীনভাবে সঞ্চরনশীল এবং সংখ্যায় প্রচুর হইলেও পোষকের ক্ষতির পরিমান ততটা নয় তাহার কারন পোষকের সব শুক্রথলি এই পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

প্রানিরাজ্যে মনোসিস্টিসের অবস্থান নিম্নরূপ।

পর্ব ঃ এপিকমপ্লেক্সা

শ্রেণী ঃ স্পোরোজোয়া

উপশ্রেণী : গ্রিগেরিনিয়া
বর্গ : ইউগ্রিগেরিনিডা
গণ : মনোসিস্টিস

এই গণের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ভারতবর্ষে মনোসিস্টিস বেদারদি (M. beddardi), মনোসিস্টিস ফেরেটিমি (M. Pheretmi), মনোসিস্টিস লোইদি (M. lloidi) এবং মনোসিস্টিস বেঙ্গালেনসিস্, (M. bengalensis)—এই প্রজাতিগুলি সচরাচর দেখা যায়। নিম্নোক্ত বর্ননায় কোন প্রজাতিকে আলাদাভাবে দেওয়া হইল না।

স্বভাব ও বসতি :

আণুবীক্ষণিক, এককোষী অন্তপরজীবী মনোসিস্টিস কেঁচোর শুক্রসংক্রান্ত থলির মধ্যে বাস করে। ইহাদের জীবনচক্রের বিভিন্ন দশা এই শুক্রসংক্রান্ত থলির মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়।

গঠন (Structure) :

পরজীবীর পূর্ণাঙ্গ দশাকে **ট্রোফোজয়েট (Trophozoit)** বলে। অপরিনত ট্রোফোজয়েট অনেকটা গোলাকৃতি অথবা ডিম্বাকৃতি। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ দশায় দেহটি লম্বাকৃতি (প্রায় 500μ)। ইহার সম্মুখ ভাগ চওড়া এবং পিছনের দিক সরু। সঞ্চরন কালে বিভিন্ন প্রজাতির আকার ও আয়তনের বেশ পরিবর্তন ঘটে। **পেলিকল (Pellicle)**—দেহের বাইরের আবরণী। বিভিন্নভাবে এই মসৃন, মোটা কিউটিকলের পরিবর্তন ঘটে।

সাইটোপ্লাজম (**cytoplasm**)—পেলিকলের অভ্যন্তরে সাইটোপ্লাজম দুইটি অংশে বিভক্ত। বাহিরের স্বচ্ছ অংশ **কর্টেক্স (cortex)** অথবা এক্টোপ্লাজম (**Ectoplasm**) এবং ভিতরের অংশ সূক্ষ্ম দানাদার মেডুলা (**Medulla**) অথবা এণ্ডোপ্লাজম এক্টোপ্লাজম আবার বহিঃস্থ স্বচ্ছ সারকোসাইট (**Sarcocyte**) এবং



চিত্র-46 মনোসিস্টিসের বহিরাকৃতি

অন্তঃস্থ মাইয়োসাইট (Myocyte) ও মাইওনিম (Myoneme) নামক সংকোচনশীল সূত্রাকার সাইটোপ্লাজম লইয়া গঠিত। মাইওনিমের সংকোচন ও প্রসারনের ফলে মনোসিস্টিস নড়াচড়া করিতে পারে। এণ্ডোপ্লাজম আরও তরল প্রকৃতির। ইহাতে প্যারা গ্লাইকোজেন (**Para glycogen**) রূপে কার্বোহাইড্রেট এবং অন্যান্য সঞ্চিত খাদ্যবস্তু সূক্ষ্মদানারূপে বিদ্যমান। তাই ইহা দানাদার। দেহের স্ফীত প্রান্তে এণ্ডোপ্লাজমের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ভেসিকুলার আকৃতির **নিউক্লিয়াস** বিদ্যমান। পরজীবীতা জনিত পরিবর্তনের জন্য দেহে খাদ্য বা সংকোচনশীল গহ্বর, ক্ষনপদ বা সিলিয়া, কিম্বা ফ্লাজেলা থাকে না। ইলেকট্রন অণুবীক্ষনযন্ত্রের সহায়তায় মনোসিস্টিসের দেহে গলগিবডিস্ ও মাইটোকনড্রিয়ার উপস্থিতি দেখা যায়।

চলন (locomotion)—মনোসিস্টিসের বিশেষ কোন গমনঙ্গ নাই। মাইওনিমের সংকোচন ও প্রসারনের ফলে দেহের কোনও অংশ পর্যায়ক্রমে সরু এবং মোটা হয় এবং ইহার ফলে ইহারা প্রয়োজনানুযায়ী নড়াচড়া করিতে পারে। এই প্রকার চলনকে **গ্রেগারাইন চলন (Gragarine movement)** বলে।

পুষ্টি (Nutrition)—

স্যাপ্রোজোয়িক পুষ্টি। মনোসিস্টিসের সমগ্র দেহ দিয়াই উপযোগী তরলখাদ্য শোষিত হয়।

যখন মনোসিস্টিস কেঁচোর শুক্রসংক্রান্ত থলির মধ্যে বাস করে তখন দেহ হইতে নানাপ্রকার উৎসেচক নিঃসৃত হয়। ইহাদের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই পরিবেষ্টিত প্রোটোপ্লাজম দ্রব্যে ও শোধন উপযোগী পদার্থে পরিণত হয়। প্যারাগ্লাইকোজেন রূপে সঞ্চিত খাদ্যবস্তু এণ্ডোপ্লাজমে জমা হয়।

শ্বসন (Respiration)

ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমেই মনোসিস্টিয়ের শ্বসন হয়। যেহেতু পরজীবী কেঁচোর শুক্রসংক্রান্ত থলির মধ্যে বাস করে সেইখানে বাহিরে বাতাসের অক্সিজেন প্রবেশ করিতে পারে না। তাই এটাই সম্ভাব্য যে দেহস্থিত কার্বোহাইড্রের কোহল সন্ধানের ফলে যে সামান্য অক্সিজেন নির্গত হয় উহা দ্বারাই তাহার শ্বাসকার্য চলে। অন্য মতে কেঁচোর শুক্রসংক্রান্ত থলিতে রক্তের

মাধ্যমে যে অক্সিজেন আসে তাহার কিছুটা পরিমান ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মনোসিষ্টিসের দেহে যায় এবং প্রয়োজন মেটায়। শ্বাসকার্যের ফলে উৎপন্ন কার্বনডাইঅক্সাইড ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের বাহিরে যায় এবং শেষ পর্যন্ত পোষকের রক্তের মাধ্যমে অপসারিত হয়।

রেচন (Excretion)

বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ তরল অবস্থায় ব্যাপনক্রিয়ায় পেলিকল্ মাধ্যমে আসে এবং তাহা পোষকের রক্তের মাধ্যমে অপসারিত হয়।

জনন ও জীবনবৃত্তান্ত (Reproduction and lifecycle)—মনোসিস্টিসের বংশবিস্তার সম্পন্ন হয় **যৌনজনন** দ্বারা এবং এই প্রক্রিয়া অনুসৃত হয় **অযৌন-জননের** মাধ্যমে। যদিও দুইটি প্রক্রিয়াই নিরপেক্ষভাবে সমাধিত হয়।

যৌনজননের সময় দুইটি পূর্ণাঙ্গ ট্রোফোজয়েট (**গ্যামেটোসাইট** অথবা গ্যামাণ্টস) নিকটবর্তী হইয়া পাশাপাশি লম্বালম্বিভাবে অবস্থান করে এবং ক্রমশঃ গোলাকার হয়। এই অবস্থায় প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত রস যুগলবদ্ধ প্রাণীকোষ দুইটিকে ঘিরিয়া দ্বিপ্রাচীর বিশিষ্ট আবরণী সৃষ্টি করে। ইহাই **গ্যামেটোসিস্ট (Gamctocyst)** নামে অভিহিত।

প্রত্যেক গ্যামেটোসাইটের নিউক্লিয়াস পুনঃ পুনঃ বিভক্ত হইয়া বহুসংখ্যক অপত্য নিউক্লিয়াস গঠন করে। এই অপত্য নিউক্লিয়াসগুলি ক্রমশঃ গ্যামেটোসাইটের সাইটোপ্লাজমের পরিধির দিকে সরিয়া যায় এবং সারিবদ্ধ-ভাবে পরপর বিন্যস্ত হয়। অতঃপর প্রতিটি নিউক্লিয়াস তাহার চারিপার্শ্বের কিছুটা সাইটোপ্লাজম লইয়া এক একটি কোষ সৃষ্টি করে। ইহাদের **জনন কোষ** বা **গ্যামেট (Gamete)** বলে। প্রতিটি গ্যামেটোসাইটে জননকোষের সংখ্যা সমান ও একই আকৃতি বিশিষ্ট হয়।

জননকোষ গঠিত হইবার পরে ইহারা গ্যামেটোসাইটের মধ্যে চঞ্চলভাবে নড়াচড়া করিতে থাকে ফলে গ্যামেটোসাইট দুইটির মধ্যপ্রাচীর লুপ্ত হয়। তখনই একটি গ্যামেটোসাইটের জননকোষগুলি অপর গ্যামেটোসাইটের জননকোষগুলির সহিত জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হয়। দুইটি গ্যামেটের মিলনের ফলে সৃষ্ট হয় জাইগোট।

প্রত্যেক জাইগোট ইহার চারিদিকে শক্ত আবরণ তৈয়ারী করে। এই আবরণকে জাইগোসিস্ট **(zygocyst)** বলে। জাইগোটের এই অবস্থা

স্পোরোণ্ট (**Sporont**) বা স্পোরোব্লাস্ট (**Sporoblast**) নামে অভিহিত। সিস্ট বদ্ধ জাইগোট নৌকার মত দেখিতে হয়। ইহাদের **স্পিউডোনেভিসেলা** (**Pseuponavecella**) বলে। জাইগোসিস্টের অভ্যন্তরে প্রতিটি জাইগোট পরপর পর্যায়ক্রমে তিনবার বিভক্ত হইয়া আটটি (৪টি) কাস্তে আকৃতির স্পোরোজয়েট (**Sprozoit**) সৃষ্টি করে।



চিত্র নং 47 মনোসিস্টিসের জীবনচক্র

এই তিনবার বিভাজনের মধ্যে একবার মায়োটিক বিভাজন ঘটে। ফলে অপত্য নিউক্লিয়াসগুলি হ্যাপলয়েড হয়। একই কেঁচোর শুক্রসংক্রান্ত থলির মধ্যে স্পোরোজয়েট উপরোক্ত প্রকারে উৎপন্ন হইলেও মনোসিস্টিসের জীবনচক্র সম্পূর্ণ হয় না। আর একটি কেঁচোর প্রয়োজন হয় ইহাদের জীবনচক্রে।

সংক্রামিত কেঁচোর মৃত্যুর পর স্পোরণ্টগুলি মাটিতে মুক্ত হয়। আবার যদি সংক্রামিত কেঁচোকে কোন পাখি খায়, তখন সেই পাখির পাকস্থলীতে রসেরবিক্রিয়া প্রতিরোধ করিয়া স্পোরোণ্টগুলি অক্ষত অবস্থায় পায়ুপথে বাহিরে আসে ও মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়। স্পোরোণ্টগুলি মাটিতে মিশিবার পর কোনো কেঁচো এই মাটি খাদ্যরূপে গ্রহণ করিলে স্পোরণ্টগুলি

নূতন কেঁচোর পৌষ্টিকনালীতে প্রবেশ করে। এখানে কেঁচোর পাচকরসের বিক্রিয়ায় স্পোরোণ্টের আবরণ জীর্ণ হয় এবং স্পোরোজয়েটগুলি মুক্ত হয় ক্রমশঃ পাকস্থলী হইতে লম্বাকৃতি স্পোরোজয়েটগুলি কেঁচোর শুক্রসংক্রান্ত-গুলিতে পথ করিয়া নেয় এবং সেখানে খাদ্য গ্রহণ করিয়া ট্রোফোজয়েটে পরিণত হয়। উল্লেখযোগ্য, এই ট্রোফোজয়েটগুলি ও হ্যাপলয়েড (n)। এইভাবে মনোসিস্টিসের জীবনচক্র সম্পন্ন হয়।

পরজীবিতা জনিত পরিবর্তন ও জনুঃক্রম (Changes due to pariasitism and alternation of generation)।

পরজীবির অন্তঃপরজীবিরূপে বাসকালে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। অন্তঃপরজীবী অবস্থার প্রথম দিকেই পরজীবির শারীরবৃত্তীয় অভি-যোজনের প্রয়োজন। যদিও আরও সুবিধাজনক অবস্থায় পরজীবীর বহিরাকৃতির বৃহৎ পরিবর্তন ঘটে। উল্লেখযোগ্য, এই শ্রেণীর প্রাণীদের নির্দিষ্ট কোন গমনাঙ্গ নাই এবং খাদ্যগহ্বরও অনুপস্থিত থাকে।

স্পোরোজোয়া শ্রেণীর কিছু প্রাণীর (উদাহরণ-**মনোসিস্টিস, আইমেরিয়া**) জীবনচক্র একটিমাত্র পোষকেই সম্পূর্ণ হয়। যদিও কিছুটা অংশ পোষকের বাহিরে সম্পাদিত হয়। ইহাদের তাই **মনোজেনেটিক (monogenetic)** বলে। অপরপক্ষে কিছু প্রাণীর (উদাহরণ-প্লাসমোডিয়াম) জীবনচক্র দুইটি পোষকের মধ্যে সম্পাদিত হয়। তাই ইহাদের **ডাইজেনেটিক (digenetic)** জীবনচক্র বলে। যৌন এবং অযৌন জনন দুইটি ভিন্ন পোষকের মধ্যে ঘটে বলিয়া এই প্রক্রিয়াকে জনুঃক্রম (alternation of generations) বলে। দুইটি ভিন্ন পোষক, মেরুদণ্ডীও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে ইহাদের জীবনচক্র সম্পন্ন হয়।

স্পোরোজোয়া শ্রেণীর কয়েকটি প্রাণীর বহিরাকৃতি ঃ

(i) গ্রিগারিণা (Gregarina) ঃ এই গণের অন্তর্গত প্রজাতিগুলি সাধারণতঃ আরশোলা, ফড়িং, কাঁকড়া, কাঁকড়াবিছা ও অন্যান্য সন্ধিপদ প্রাণীর অন্ত্রে পাওয়া যায়। আন্ত্রিককোষের অণুকোষারন্ধ্রে ইহাদের অপরিণত অবস্থা থাকে, পরবর্তীপর্যায়ে খাদ্যনালীতে মুক্ত হয়। ইহারা

পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় প্রায় 2·5 মাইক্রন লম্বা হয়। দেহটি তিনটি অংশে বিভক্ত হয়। যথা—এপিমেরাইট, প্রোটোমেরাইট ও ডিউটোমেরাইট। ডিউটো-মেরাইট ও অর্থাৎ শেষ অংশে একটি নিউক্লিয়াস থাকে। এপিমেরাইটে অবস্থিত কাঁটার সাহায্যে ইহারা অন্ত্রের প্রাচীরে নিজেদের আটকাইয়া রাখে। মায়োনিম স্ত্রের সংকোচনের ফলে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা স্থান পরিবর্তন করে। অনেকসময় পরজীবিগুলি একটি আর একটির পশ্চাতে লাগিয়া শৃঙ্খলের ন্যায় আকার গঠন করে। শৃঙ্খলের প্রথম জীবটিকে **প্রাইমাইট** এবং পরবর্তী জীবকে ম্যাটেলাইট বলে। পরজীবি শর্করা, পেপটোন ইত্যাদি পোষোকের দেহ হইতে শোষণ করিয়া নিজদেহে গ্লাইকোজেন হিসাবে সঞ্চিত রাখে।

(ii) আইমেরিয়া (Eimeria) ঃ আইমেরিয়া গণের প্রজাতিগুলি বিভিন্ন মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পৌষ্টিকনালীর কোষমধ্যবর্তী অঞ্চলে থাকে। আইমেরিয়া টেনেলার মুরগীর অন্ত্রের, আইমেরিয়া মাইটিস পাখীর ইলিয়াম অংশের এবং আইমেরিয়া স্টিডি খরগোসের যকৃতনালীর ক্ষতিসাধন করে। ইহার দেহটি ছোট, একটি গোলাকার ছোট নিউক্লিয়াস থাকে। অযৌন জনন পদ্ধতিতে মেরোজয়েট গঠন করিয়া যকৃত ও যকৃতনালীর আবরণী কলাকে ধ্বংস করে। কিছু মেরোজয়েট পুং ও স্ত্রী জননকোষে রূপান্তরিত হয়। এই জননকোষের মিলনে উৎপন্ন জাইগোট খরগোসের মলের সহিত আবরণীবদ্ধ অবস্থায় দেহের বাহিরে আসে। আবার খাদ্যের সহিত আবরণী বদ্ধ জাইগোট নতুন খরগোসের খাদ্যনালীতে প্রবেশ করে এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পরিনত হইয়া অন্ত্রের আবরণীকলাকে আক্রমন করে।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রেণী ঃ—অলিগোহাইমেনোফোরিয়া

বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই শ্রেণী। ইহাদের জীবনব্যাপী সিলিয়াদ্বারা দেহ আচ্ছাদিত। এই সিলিয়া দ্বারাই ইহারা খাদ্য সংগ্রহ ও চলনকার্য্য সম্পন্ন করে। প্রায় 2,500 হাজার প্রজাতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ—

1. নির্দিষ্ট আকৃতির জটিল প্রোটোজোয়া।
2. সমগ্র দেহটি দৃঢ় অথচ নমনীয় পেলিকল্ (**Pell'cle**) দ্বারা আবৃত।
3. সিলিয়ার সাহায্যে চলন ; সারাজীবনব্যাপী এই সিলিয়া থাকে।
4. অল্প কিছু পরজীবী ব্যতীতে সবারই নির্দিষ্ট মুখছিদ্র (**cytostome**) এবং গ্যালেট (**gullet**) বর্তমান।
5. দেহের পশ্চাদ অংশে অবস্থিত **সাইটোপাইজ (cytopyge)** অস্থায়ী ; ইহার মাধ্যমে খাদ্যের অপাচ্য বর্জ অংশ বাহিরে পরিত্যক্ত হয়।
6. এক বা একাধিক **সংকোচনশীল** গহ্বর (**Contraetile vacuole**) বর্তমান।
7. সাধারনতঃ নিউক্লিয়াসের সংখ্যা দুইটি, আকারে একটি বড়, মেগানিউক্লিয়াস (**Meganucleus**), অপরটি আকারে ছোট, মাইক্রো-নিউক্লিয়াস (**Micronueleus**)
8. হেটেরোট্রাফিক (**Heterotroph'c**) পুষ্টি দেখা যায়।
9. দুধরনের জনন (অযৌন ও যৌন) দেখা যায় ; যৌনজননে কনজুগেশান (Conjugation) অথবা অটোগ্যামী (autogamy) অথবা সাইটোগ্যামী (**cytogamy**) জড়িত।

সিলিয়াটা শ্রেণীভূক্ত প্রাণীদের মধ্যে মিঠাজলে বসবাসকারী, স্বাধীনজীবী, সিলিয়াযুক্ত প্রাণী প্যারামিসিয়াম (**Paramoecium**) ই সবচেয়ে বেশী পরিচিত এবং সহজপ্রাপ্য।

প্যারামিসিয়াম (Paramoceium)

গঠন, জনন ও জৈবনিক কার্য

এই পর্বের প্রাণীর খাদ্যগ্রহন ও চলনের জন্য একপ্রকার বিশেষচুলের মতো অঙ্গ থাকে তাহাকে সিলিয়া বলে। ইহাছাড়া এই প্রাণীর দুইটি নিউক্লিয়াস থাকে। ইহাদের **দ্বিভিজন** বা **বাইনেরি ফিশান (Binnary fission)** এবং যৌনজনন পদ্ধতি দেখা যায়। এই পর্বের সাধারণ উদাহরণ প্যারামিসিয়াম **(Paramoecium)**।

প্রানীরাজ্যে প্যারামিসিয়ামের অবস্থান নিম্নরুপ।

পর্ব : সিলিওফোরা
শ্রেণী : অলিগোহাইমেনোফোরিয়া
বর্গ : হাইমেনোস্টোমাটিডা
গণ : প্যারামিসিয়াম

স্বভাব ও বসতি :—

প্যারামিসিয়াম সাধারনতঃ মিঠাজলের পুকুর, ঝিল নদী, প্রভৃতি জলাশয়ে দেখা যায়। ইহা আবার বিশেষভাবে বদ্ধজলে অর্থাৎ জৈব পদার্থ, পচা জৈব পদার্থ পূর্ণ জলে বাস করে। ইহা ব্যাকটেরিয়া এবং ছোটছোট প্রোটোজোয়া খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহাকে খালি চোখে সাদা ফুটকির (white spots) ন্যায় দেখায়।

প্যারামিসিয়াম এর প্রায় 10 রকমের প্রজাতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকের আকার, আকৃতি, আয়তন ভিন্ন। এই প্রজাতির মধ্যে **প্যারামিসিয়াম কডাটাম্ (P. Caudatum), প্যারামিসিয়াম অরেলিয়া (P. aurelia), প্যারামিসিয়াম বার্সেরিয়া (P. bursaria),** প্রভৃতি সাধারন উদাহরন। এইখানে প্যারামিসিয়াম কডাটাম্ **(P. Caudatum)** এর সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

গঠন (Structure)

আয়তন (Size)—প্যারামাসিয়াম কডাটাম 180-300 মাইক্রণ লম্বা হয়।

আকার (Shape)—খালি চোখে ইহাকে সাদা ফুটকির মত এবং অনুবীক্ষণিক যন্ত্রের নীচে ইহাকে লম্বা চটির মত **(Slipper shaped)** দেখায়। এই

কারণে ইহাকে **স্লিপার অ্যানিমেলকিউল (slipper animalcule)** বলে। ইহার দেহটি পাতলা সরু এবং সামনের প্রান্ত ভোতা এবং পিছনের প্রান্ত চওড়া হয়।

দেহটি পৃষ্ঠভাগ এবং অঙ্কীয় ভাগে বিভক্ত। অঙ্কীয় দেশ মসৃন এবং পৃষ্ঠ দেশ উত্তল হয়। ইহার দেহ একটি স্পষ্ট, শক্ত, স্থিতিস্থাপক বহিঃআবরণী পেলিকল্ (Pellicle) দ্বারা আবৃত। পেলিকল্ এর উপরিভাগ মসৃন হয় না। ইহার পেলিকলে অনেকগুলি ষড়ভূজাকৃতি প্লেট থাকে। প্লেটগুলির মধ্যস্থানে একটি করিয়া ছিদ্র থাকে, এই ছিদ্রপথে সিলিয়া (cilia) বাহির হইয়া আসে। প্রতিটি সিলিয়া **বেসাল্ গ্রানুয়ালস্ (basal granules)** হইতে উৎপন্ন হয়। বেসাল্ গ্রানুয়ালস্ গুলি একটি অপরটির সহিত একপ্রকার সুতো দ্বারা যুক্ত থাকে, এই সুতোকে নিউরোনিম্ (neuroneme) বলে। প্রতি সিলিয়া একটি সরু তন্তু দ্বারা তৈরী হয়। এই তন্তুকে অ্যাক্সোনিম (axoneme) বলে। অ্যাক্সোনিম একটি প্রোটোপ্লাজমের খোলস (Protoplasm-sheath) দ্বারা আবৃত থাকে। সিলিয়াকে অনুপ্রস্থ ব্যবচ্ছেদ করিয়া ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে দেখিলে দেখা যায় যে বৃত্তাকারে সজ্জিত 9টি ও কেন্দ্রে 2টি **ফিলামেণ্ট (filament)** ইংরাজী '8' অক্ষরের ন্যায় সজ্জিত থাকে। সিলিয়া সাধারণতঃ অনুদৈর্ঘ্য ভাবে সজ্জিত থাকে। কিন্তু অন্যপ্রান্তে সর্পিল (spirally) ভাবে সজ্জিত থাকে।

পেলিকল্ এর নীচে প্রোটোপ্লাজম দুইভাগে বিভক্ত কর্‌টেক্স (Cortex) এবং মেডুলা (Medulla)। এই কর্‌টেক্স কে **বহিঃপ্লাজম** ও বলে এবং ইহাতে স্বচ্ছ দানাবিহীন মাকুর ন্যায় (Spindle shaped) পদার্থ থাকে। এই পদার্থকে ট্রাইকোসিস্টস্ (Trichocysts) বলে। প্রতিটি ট্রাইকোসিস্ট্ 4 মাইক্রণ লম্বা এবং 2 মাইক্রণ চওড়া হয়। এলিস্ (Elies, 1769) এ প্রথম ট্রাইকোসিস্ট আবিষ্কার করেন। ট্রাইকোসিস্ট সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে এবং ইহাদের বদ্ধ দিক বহিঃপ্লাজমের ভিতরের দিকে থাকে। ইহা পেলিকল্ এর উপরিভাগে একটি ছিদ্র দ্বারা যুক্ত হয়। জেকাস (Jakus), হল্ (Hall) এর মতে ট্রাইকোসিস্ট এর মধ্যে একটি **শাফট (Shaft)** থাকে এবং এই শাফটের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ হয় ইহাকে স্পাইক বা বারব্ (barb) বলে। এই স্পাইক একটি টুপি দ্বারা ঢাকা থাকে। জল শোষণের ফলে শাফট্ এর ভিতরকার পদার্থ ফুলিয়া উঠে এবং তাহার পর এক সময়

কাটিয়া যায়। এই সময় একটি লম্বা সূচাকার সুতোর মত অংশ দেহের উপরিভাগে বাহির হইয়া আসে। ট্রাইকোসিস্ট এর কার্যবিধি বিশদভাবে জানা যায় নাই। বৈজ্ঞানিকের মতে ট্রাইকোসিস্ট দ্বারা প্যারামিসিয়াম্ আত্মরক্ষা করে। কিন্তু বর্তমানের বৈজ্ঞানিকের মতে ইহা একপ্রকার আঠালো বস্তু। প্যারামিসিয়ামের খাদ্য গ্রহণের সময় বস্তুর সহিত আটকাইয়া থাকিতে সহায়তা করে।

গালেট (**gullet**) অপেক্ষাকৃত বড় সিলিয়া দ্বারা বেষ্টিত থাকে। গ্যালেট এর মধ্যে দুইটি সিলিয়ার মত ছোট বস্তু দেখা যায় ইহাকে **পিনিকুলাস্** বলে। এই পিনিকুলাস দুইটির প্রতিটি, চারিটি সিলিয়া দ্বারা তৈয়ারী।

মেডালা অংশকে অন্তঃপ্লাজম বলে এবং ইহা অপেক্ষাকৃত দানাদার। এই অন্তঃপ্লাজম এর মধ্যস্থানে নিউক্লিয়াস থাকে। দেহ একটি বড় নিউক্লিয়াস বা **ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস** এবং একটি ছোট গোলাকার নিউক্লিয়াস বা **ম্যাইক্রোনিউক্লিয়াস** লইয়া গঠিত। ম্যাইক্রোনিউক্লিয়াসটি ম্যাক্রোনিউক্লিয়াসটির খাঁজের মধ্যে থাকে। ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস শুধু সাধারণ জৈবিক কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে কিন্তু ম্যাইক্রোনিউক্লিয়াস জননকার্যের সহিত জড়িত বা সংশ্লিষ্ট থাকে।

প্যারামিসিয়ামের দেহের উভয় প্রান্তে একটি করিয়া তারকার ন্যায় সংকোচী গহ্বর (**Contractile vaeuote**) থাকে। এই সংকোচী গহ্বর একটি বড় কেন্দ্রীয় গহ্বর ও উহা হইতে উৎপন্ন 5 হইতে 10টি অরীয়নালী দ্বারা গঠিত। প্রতিটি অরীয়নালী আবার তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা— বহিঃ মধ্য ও অন্তনালী। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, বাহিরের অংশ বদ্ধ এবং জালকের ন্যায় নালিকা দ্বারা আবৃত। এই নালিকা কে **নেফ্রিডিয়াল টিউবুলুস** বলে। মধ্য অংশকে অ্যামপুলা বলে। অ্যামপুলা বর্জ্য তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ হইলে ফুলিয়া



চিত্র 48 প্যারামিশিয়াম কডেটাম

গোলাকার আকার ধারণ করে। ভিতরের অংশকে অন্তর্মুখীনালী বলে। ইহা মধ্য গহ্বরের মধ্যে মুক্ত হয়। এই মধ্যগহ্বর আবার পরবর্ত্তীকালে বহিঃমুখী নালী দ্বারা বাহিরে যুক্ত হয়। প্রাণীর পৃষ্ঠদেশের পেলিকল এর উপর এই বহিঃমুখীনালীর একটি স্থায়ী ছিদ্র থাকে উহা দ্বারা বহিঃমুখী নালী বাহিরে মুক্ত হয়।

প্যারামিসিয়ামের দেহের ভিতর অনেক অসঙ্কোচী খাদ্য গহ্বর থাকে। এই খাদ্য গহ্বর প্রবাহিত সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। গৃহীত খাদ্যের প্রকৃতির উপর খাদ্য গহ্বরগুলির আকার আয়তন বিভিন্ন হয়। তবে মোটামুটি প্রতি খাদ্য গহ্বরের আকার প্রায় গোল হয়।

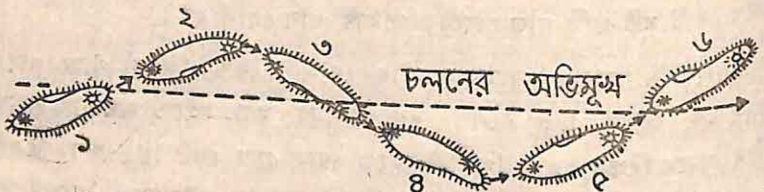
প্যারামিসিয়ামের দেহের অঙ্কীয় দেশে একটি তির্যক খাঁজ থাকে তাহাকে ওরাল গ্রুভ বলে। ইহা দেহের মধ্য হইতে অগ্রপ্রান্ত পর্য্যন্ত তির্যকভাবে বিস্তৃত হয়। পিছনের দিকে ওরাল গ্রুভ একটি ছিদ্র দ্বারা একটি ফানেলের ন্যায় খাঁজের মধ্যে যুক্ত হয়। এই খাঁজকে গালেট্ বা সাইটোফেরেক্স বলে এবং ছিদ্রটিকে সাইটোজোম্ বলে। দেহের পিছনের দিকে একটি নির্দিষ্ট পায়ু ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রকে আবার সাটোপেজ ও বলে। সাইটোপেজ-এর মধ্য দিয়ে অপাচ্য খাদ্যবস্তু বাহির হইয়া যায়।

চলন (Locomotion) ঃ প্যারামিসিয়ামের চলন দুই প্রকার। ইহার দেহের বহিঃআবরনী বা পেলিকল অত্যন্ত নমনীয় এবং স্থিতিস্থাপক। ফলে, ইহার দেহটিকে যে কোন ভাবেই ঘুরাইয়া, প্যাঁচাইয়া, বাঁকাইয়া চলিতে পারে। ফলে জলজ উদ্ভিদের মধ্য দিয়া পথ করিয়া সহজেই ইহারা আগাইয়া যায়। আবার, ইহারা সিলিয়াগুলিকে পদ-এর ন্যায় ব্যবহার করিয়া কোন প্রতিবন্ধকের উপর দিয়া গুঁড়ি মারিয়া চলিয়া যায়।

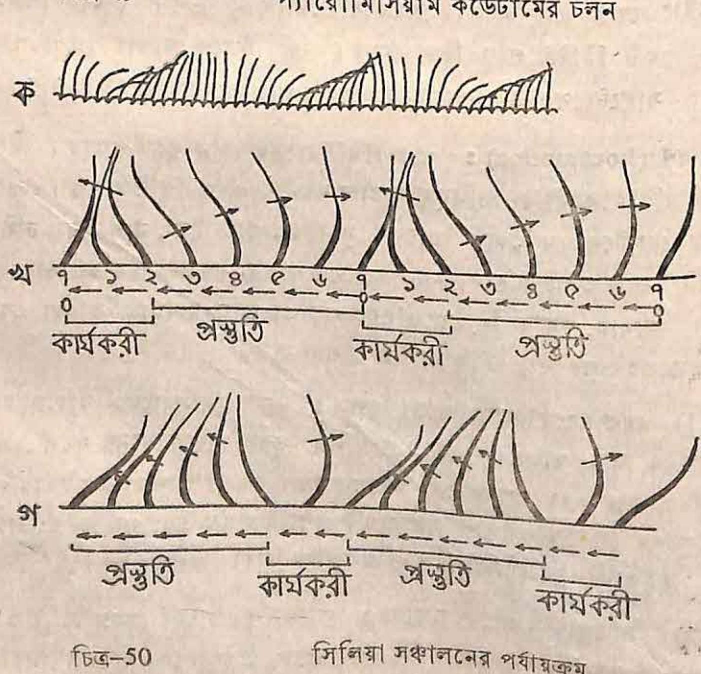
(1) **দেহ সংকোচনের দ্বারা চলন ঃ** প্যারামিসিয়ামের বহিঃপ্লাজমে মায়োনিম তন্তু থাকে। এই ম্যায়েনিম তন্তুর সংকোচনের ফলে দেহটি সংকুচিত হয় এবং সম্মুখভাগে অগ্রসর হয়। আবার অগ্রসর হইবার পর পেলিকলের স্থিতিস্থাপকতার জন্য দেহটি প্রসারিত হয় এবং পূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইভাবে দেহকে সংকুচিত ও প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হয়।

(2) **সিলিয়ার সাহায্যে সন্তরন ঃ** প্যারামিসিয়ামের দেহকৃতি সাঁতার কাটিবার উপযোগী। সাঁতার কাটিয়া অগ্রপশ্চাৎ উভয়দিকে যাইতে পারে।

দেহের সিলিয়াগুলি নৌকার দাঁড়ের মত। ইহারা একত্রে বাঁকিয়া দেহের অগ্রপশ্চাৎভাগে জল ঠেলিয়া দেয়, ফলে সমগ্র দেহ সম্মুখদিকে আগাইয়া যায়। পরমুহূর্তেই আবার সিলিয়াগুলিকে টানিয়া সম্মুখে লইয়া যায় ও পূর্ববৎ দাঁড়ের ন্যায় পিছন দিকে নামাইয়া দেয়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সমস্ত সিলিয়াগুলি সুসংহতভাবে একই সাথে ও একই গতিতে সঞ্চালিত হয়। প্রতি মিনিটে প্রায় 30-40 মি. মি. পথ অতিক্রম করে। যদি একদিকের সিলিয়ার সঞ্চালন অপরদিকের অপেক্ষা বেশী হয়, তবে ইহার গতিপথ বাঁকিয়া যায়। অপরপক্ষে, যদি সিলিয়াগুলির সঞ্চালন বিপরীতমুখী হয়, তবে প্যারামিসিয়াম পিছাইতে শুরু করে।



চিত্র-49 প্যারোমিসিয়াম কডেটামের চলন



চিত্র-50 সিলিয়া সঞ্চালনের পর্যায়ক্রম

পুষ্টি (Nutrition) ঃ

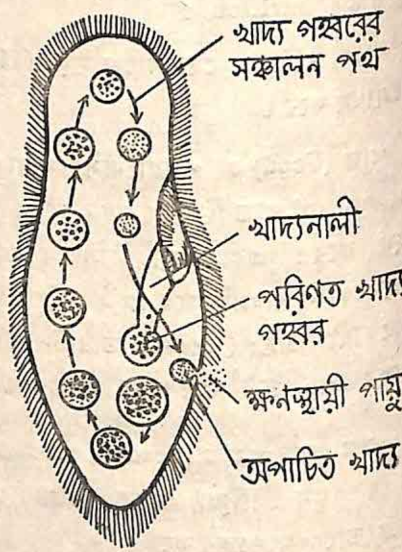
প্যারামিসিয়াম হোলোজোইক্ (**Holozoic**) পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহন ও পুষ্টিসাধন করে।

খাদ্য (Food) ঃ প্যারামিসিয়াম সাধারনত জীবিত ছোট ছোট প্রাণী (**organism**) খাদ্য হিসাবে গ্রহন করে। প্রধানতঃ ব্যাকটেরিয়া জাতীয় খাদ্য গ্রহন করে। একটি প্যারমিসিয়াম **24** ঘণ্টায় **2** হইতে **5** লক্ষ্য ব্যাকটেরিয়ামকোলি খাদ্যহিসাবে গ্রহন করিতে পারে। ইহা ছোট ছোট আদ্যপ্রাণী, এককোষী উদ্ভিদ (শেওলা, ডায়াটম, ইষ্ট ইত্যাদি) এবং প্রাণীর ও উদ্ভিদ দেহের ছোট ছোট অংশ খাদ্য হিসাবে গ্রহন করে।

খাদ্য গ্রহন পদ্ধতি (Feeding mechanism) ঃ ওরালগ্রুভ (**oral grove**) কে যে সকল সিলিয়া আবৃত করিয়া রাখে, সেই সকল সিলিয়া খাদ্যগ্রহনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

খাদ্যগ্রহণের সময় এই সিলিয়াগুলি দেহের অন্যস্থানের সিলিয়াগুলি হইতে বেশী দ্রুত স্পন্দিত হয় ফলে ওরাল গ্রুভ এর দিকে একটি জলস্রোতের সৃষ্টি হয়। এই জলস্রোত খাদ্যদ্রব্য বহনকরে পরিশেষে এই খাদ্যদ্রব্য পূর্ণ জলস্রোত ওরালগ্রুভ এর মধ্য দিয়া **গ্যালেট্** (**gullet**) এর মধ্যে পৌছায়। গ্যালেট্বে পৌছাইবার পর, প্যারামিসিয়াম জীবিত খাদ্যদ্রব্যগুলিকে **ট্রাইকোসিস্ট (Trichocyst)** হইতে নিঃসৃত রস দ্বারা অসাড় করিয়া ফেলে। **Mast (1947)** এর মতে জলস্রোতের সকল বস্তুই গালেট্ এর মধ্যে প্রবেশ করে না, কিছু বস্তু ওরাল গ্রুভ এ প্রবেশের পূর্বে বাহির হইয়া যায়। যে পথ দিয়া খাদ্যহিসাবে গৃহীত বস্তু সিলিয়ার স্পন্দনে ওরাল গ্রুভ এর মধ্যে প্রবেশ করে তাহাকে **সিলেকশান্ পাথ্ (Selection Path)** বলে। আর যে পথ দিয়া অপ্রয়োজনীয় বস্তু বাহিরে চলিয়া আসে তাহাকে **রিজেক্শান্ পাথ্ (Rejection Path)** বলে।

খাদ্য গহ্বর গঠন (Formatiom of food Vacuole) ঃ খাদ্যবস্তুগুলি সাইটোফ্যারেঙ্কস (**cytopharynx**) বা গালেট্ এর তলদেশে আসিয়া জমা হয়। গালেট্বের মধ্যকারস্পন্দনের ফলে খাদ্যবস্তু বলের মতো আকার ধারন করে। অবশেষে এই খাদ্যবস্তু কিছুটা জল সংগ্রহ করিয়া সাইটোসোমের মধ্যে (**cytosomes**) অন্তঃপ্লাজমে প্রবেশ করে এবং খাদ্যগহ্বর সৃষ্টি করে।



চিত্র-51 প্যারামিসিয়াম কডেটামের খাদ্যের চলন পদ্ধতি

একটি খাদ্যগহ্বর সৃষ্টি হইতে 1-5 মিনিট পর্যান্ত সময় লাগে। খাদ্য সরবরাহ এবং খাদ্যগ্রহণের উপরও খাদ্য গহ্বর সৃষ্টিনির্ভর করে।

খাদ্যগহ্বরে গমনের পথ ঃ— খাদ্যগহ্বর অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পথে সংবাহিত হয়। সুনির্দিষ্ট পথে সংবহনকে **সাইক্লোসিস (Cyclosis)** বলে। সংবহনের সময় খাদ্য-গহ্বর প্রথমে পশ্চাদ দিকে অগ্রসর হয় এবং পরে ঘুরিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হয়। সাইটোপ্লাজমের অগ্রপ্রান্তে পেঁাছায়। অগ্রপ্রান্তে পৌছাইবার পর উহা আবার ঘুরিয়া পশ্চাদদিকে অগ্রসর হয় এবং দেহকোষের মাঝামাঝি আসিয়া পৌছায় এবং ইহার পর সংবহন সম্পূর্ণ হয়। এই সময় খাদ্যগহ্বরের বর্ণ ক্রমশঃ সবুজ হইতে হলুদ হয়।

পরিপাক ও শোষন ঃ—খাদ্য পরিপাক ও শোষণ সাইক্লোসিস (Cyclosis) পদ্ধতির সময় হইয়া থাকে। খাদ্য পরিপাক ও শোষণ প্যারামিসিয়ামের ক্ষেত্রে অ্যামিবার মত হয়।

সাইটোপ্লাজম হইতে নিঃসৃত কতকগুলি জারকরস দ্বারা খাদ্যগহ্বরের খাদ্যবস্তু প্রথমে তরলে পরিণত হয়। খাদ্যগহ্বরের মধ্যে তরল প্রথমে আম্লিক হয় (**PH 1.4** হইতে **3.4**) তখন জীবন্ত খাদ্যবস্তু গহ্বরের মধ্যে মারা যায় এর পরে খাদ্যগহ্বরে তরল ক্ষারীয় হয়। তখন খাদ্যবস্তু পরিপাক হয়। সাইটোপ্লাজম কতৃক িঃসৃত একপ্রকার অ্যাসিড সম্ভবতঃ হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড দ্বারা খাদ্যগহ্বর আম্লিক হয়। কিন্তু **Mast (1942)** এর মতানুসারে খাদ্যগহ্বরের তরলের অম্লতা বৃদ্ধি সাইটোপ্লাজমের নিঃসরনের ফলে হয় না। সম্ভবতঃ জীবন্ত খাদ্যবস্তুর শ্বসনে উদ্ভূত কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং

পচনজনিত রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে ঘটিয়া থাকে। জীবন্ত খাদ্যের মৃত্যু আবার অক্সিজেনের অভাবে ঘটিয়া থাকে। সাইটোপ্লাজম কর্তৃক কোনরূপ জারকরস বা অ্যাসিডের জন্য ঘটে না।

ইহার পর পাচিত খাদ্যবস্তু ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে শোষিত হয়। পাচিত খাদ্যবস্তু সাইক্লোসিস পদ্ধতির সময় দেহের বিভিন্ন অংশে শোষিত হয়।

বহিঃকরণ : (Egestion) ঃ অপাচ্য খাদ্যবস্তু সাইটোপেজের মধ্য দিয়া দেহের বাহিরে চলিয়া আসে। এই সাইটোপেজ দেহের অঙ্কীয় পশ্চাদ দেশে সৃষ্টি হয়। ইহা একটি নির্দিষ্ট স্থানে সৃষ্টি হয়। ইহাদের শুধুমাত্র অপাচ্য বস্তু নিষ্কাশনের সময় দেখা যায়।

শ্বসণ (Respiration)

ব্যাপন প্রক্রিয়ায় জলে দ্রবীভূত O_2 অর্ধভেদ্য পেলিকল্ এর মধ্য দিয়া দেহকোষের মধ্যে পৌছায় এবং উহা প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে জারণে ব্যবহৃত হয়। জারণের ফলে উদ্ভুত কার্বনডাই-অক্সাইড দেহের বাহিরে চলিয়া আসে। **Gresbergen** এবং **Reynaerts—Debont-(1952)** মতে **P-caudatam** সাইটোক্রোম অক্সিডেজের সাহায্যে শ্বসনকার্য সম্পন্ন করে। **Kalmus, Howland** এবং **Bernstein** মতানুসারে একটি প্যারামিসিয়াম প্রতি ঘণ্টায় 26° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় 0·0052—0·00019 সিসি O_2 ব্যাবহার করে।

জলসাম্য ও রেচন ঃ

দুইটি সংকোচী গহ্বরই জলসাম্যতা রক্ষাকার্যে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি সংকোচী গহ্বর একটি কেন্দ্রীয় গহ্বর এবং উহা হইতে উৎপন্ন 6 হইতে 11 টি অরীয়নালী দ্বারা গঠিত। এই অরীয় নালী গুলি অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। জলসাম্যের সময় অরীয়নালী দেহকোষের অতিরিক্ত জল ও নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে এবং তাহার পর ঐ জল ও বর্জ্যপদার্থ কেন্দ্রীয় গহ্বরে নিক্ষেপ করে। কিছুক্ষণ পরে কেন্দ্রীয় গহ্বর ফুলিয়া উঠে এবং বিরাট আকার ধারন করে। অবশেষে সংকোচী গহ্বর ফাটিয়া যায় ও অভ্যন্তরস্থ বস্তু পেলিকলের ছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাহিরে আসে। একই সঙ্গে দুইটি গহ্বর সঙ্কুচিত হয় না। দুইটি গহ্বরের সংকোচন 10-20 সেকেণ্ডের অন্তর অন্তর হয়। কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক অরীয় নালী গুলিকে গঠনশীল নালী হিসাবে বিবেচনা করেন। তাহাদের

মতানুসারে মধ্যগহ্বরের সংকোচনের পর, সকল গঠনশীল নালী গুলি খুব কাছাকাছি চলিয়া আসে এবং তাহাদের ভিতরের প্রান্তগুলি মিশিয়া গিয়া একটি নূতন মধ্যগহ্বরের সৃষ্টি করে। নূতন মধ্য গহ্বর সৃষ্টির পর, ইহার চারিপাশ হইতে নূতন গঠনশীল নালী ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হইতে থাকে।

জনন ও জীবনবৃত্তান্ত (Reproduction and lite cycle) ঃ

প্যারামিসিয়াম অযৌন এবং যৌন জনন প্রক্রিয়ায় বংশ বিস্তার করে।

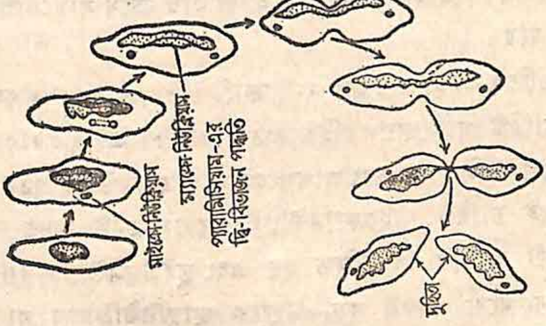
অযৌন জনন ঃ—অনুকূল পরিস্থিতিতে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অনুপ্রস্থ দ্বিবিভাজন **(Transverse binnary fission)** প্রক্রিয়ায় বংশ বিস্তার করে। এই পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত খাদ্য ও জল থাকে। এই সময় প্রথমে **মাইক্রোনিউক্লিয়াস** মাইটোসিস্ পদ্ধতিতে দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হয় এবং **ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস,** অ্যামাইটোসিস্ পদ্ধতিতে দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হয়। বিভক্ত হইবার পর, একটি মাইক্রো এবং ম্যাক্রো-নিউক্লিয়াস প্যারামিসিয়ায় দেহকোষের অগ্রভাগে চলিয়া যায়। অপর জোড়া নিউক্লিয়াস দেহের পশ্চাদ ভাগে চলিয়া যায়। এই সময় দেহের মধ্যস্থানে একটি অনুপ্রস্থ খাঁজের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে ক্রমে দেহকোষটি অনুপ্রস্থ ভাবে দুইটি ভাগে বিভক্ত হয় এবং দুইটি অপত্য প্যারামিসিয়ামের সৃষ্টি করে। অগ্রপ্রান্তের অপত্য প্যারামিসিয়ামকে **প্রোটার (Proter)** এবং পশ্চাদদিকের **অপিস্থি (Opisthe)** বলে। ইহার পর অপত্য প্যারামিসিয়াম দুইটি তাহাদের শেষ অংশ পুনঃউদ্ধার করিয়া পূর্ণাঙ্গ প্যারামিসিয়ামে পরিণত হয়।

পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এবং খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া সমগ্র পদ্ধতিটি 30-120 মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়। **প্যারামেসিয়াম কডেটাম্** 24 ঘণ্টায় 2-3 বার বিভাজিত হয়। **প্যারামেশিয়াম অরুলিয়া** 5 বার বিভাজিত হয়। ইহা ধারনা করা হয় যে একটি প্যারামিসিয়াম হইতে এক মাসের মধ্যে 265 লক্ষ্য অপত্য প্যারামিসিয়াম সৃষ্টি হয়, অবশ্য সবগুলি বাঁচে না।

যৌনজনন ঃ—পর পর কতকগুলি জন্তুর দ্বি-বিভাজনের পর, প্যারামি-সিয়াম এর যৌনজনন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস পুনরায় সংগঠিত হয়, অর্থাৎ যৌনজনন প্রক্রিয়ায় ইহারা বংশ কিস্তার করে। যৌনজনন নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ঘটিয়া থাকে।

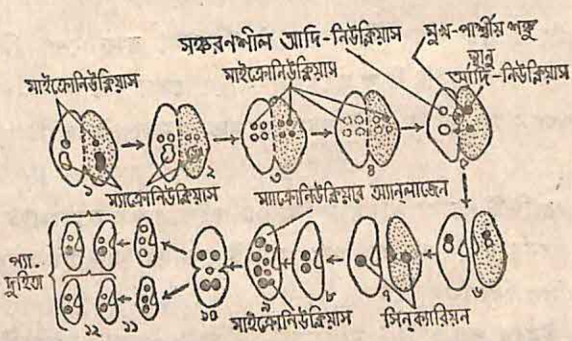
1. **কনজুগেশন্ ঃ** মাইক্রোনিউক্লিয়ার পদার্থ বিনিময়ের জন্য একই

প্রজাতির দুইটি প্যারমিসিয়ামের, (যাহা ভিন্ন জেনেটিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন) (mating types) অস্থায়ী মিলনের ফলে উভয় প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। এই মিলনকে কনজুগেশন্ (Cojugation) বলে।



চিত্র-52 প্যারামিসিয়াম কডেটামের দ্বিভাজন

1876 খৃষ্টাব্দে **Butschli** এবং 1889 খৃষ্টাব্দে **Maupas** প্রথম এই পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষনা করেন।



চিত্র-53 প্যারামিসিয়াম কডেটামের সংশ্লেষ পদ্ধতিতে জনন

পদ্ধতি : কনজুগেশন্ এর সময় দুইটি প্যারমিসিয়াম খুব কাছাকাছি চলিয়া আসে এবং তাহারা ওরাল্ সারফেসে (oral sarface) এর নিকট একসঙ্গে মিলিত হয়। ইহার পর ওরাল গ্রুভ (oral grove) বা গালেট্ নষ্ট হইয়া যায় এবং একটি প্রোটোপ্লাজমের সংযোগরক্ষাকারী সেতু তৈয়ারী

হয়। এই অবস্থায় তাহারা সন্তরণক্ষম হয়। তখন ইহাদের প্রত্যেককে সংশ্লেষী বা কনজুগেন্ট (**Conjugant**) বলা হয়। কনজুগেশনের সময় তাহাদের নিউক্লিয়াসের নিম্নলিখিত পরিবর্তন হয়।

(i) ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় ক্রমে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়।

(ii) প্রতিটি কনজ্যুগাণ্ট এর মাইক্রোনিউক্লিয়াস পরস্পর দুইবার বিভক্ত হয় এবং চারিটি মাইক্রোনিউক্লিই গঠন করে। এই দুইবার বিভাজনের মধ্যে একবার মিওসিস হয় এবং হ্যাপলয়েড মাইক্রোনিউক্লিই গঠন করে।

(iii) এই চারিটি মাইক্রোনিউক্লিইর মধ্যে তিনটি অদৃশ্য হইয়া যায়। অবশিষ্ট একটি আবার বিভাজিত হয় এবং দুইটি নিউক্লিই (**nucli**) গঠন করে। ইহার মধ্যে একটি বড়, উহাকে **স্থানুনিউক্লিয়াস** বা স্টেশনারি নিউক্লিয়াস (**Stationary nucleus**) এবং অপরটি ছোট, উহাকে **সঞ্চরণশীল** (**migratory**) নিউক্লিয়াস বা মাইগ্রোটোরী নিউক্লিয়াস বলে।

(iv) ইহার পর একটি কনজ্যুগাণ্ট এর সঞ্চরণশীল নিউক্লিয়াস প্রোটোপ্লাজম সেতুর মধ্য দিয়া অপর কনজ্যুগাণ্ট এর মধ্যে প্রবেশ করে এবং স্থানু নিউক্লিয়াসের নিকট আসে।

(v) ইহার পর সন্তরণশীল প্রোনিউক্লিয়াস, স্থানু প্রো নিউক্লিয়াসের সহিত যুক্ত হয় ফলে একটি **ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়।**

(vi) এখন জাইগোট নিউক্লিয়স সমেত কনজুগেণ্ট দুইটি পৃথক হইয়া যায়।

(vii) প্রতিটি প্যারামিসিয়াম বিচ্ছিন্ন হইবার পর জাইগোট নিউক্লিয়াসটি পরপর তিনবার বিভক্ত হয় এবং আটটি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। প্রথমে মিওসিস বিভাজন ঘটে।

(viii) ইহার পর চারিটি মাইক্রোনিউক্লিয়াস এর মধ্যে তিনটি নষ্ট হইয়া যায়।

(ix) ইহার পর অবশিষ্ট মাইক্রোনিউক্লিয়াস বিভক্ত হয় এবং সাইটোপ্লাজম সংগে সংগে বিভক্ত হয় ফলে দুইটি প্যারামিসিয়ামের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি প্যারামিসিয়ামের দুইটি ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস এবং একটি মাইক্রোনিউক্লিয়াস থাকে।

(x) ইহার পর আবার মাইক্রোনিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের

বিভাজনের ফলে মোট চারিটি প্যারামিসিয়ামের সৃষ্টি হয়। এই প্রতি প্যারামিসিয়ামে একটি ম্যাক্রো ও একটি মাইক্রোনিউক্লিয়াস থাকে।

(xi) অতএব কনজুগেশান পদ্ধতিতে একটি প্যারামিসিয়াম হইতে চারিটি অপত্য প্যারামিসিয়ামের সৃষ্টি হয়।

কনজুগেশান দুইপ্রকার হয়—

(1) অ্যানআইসোগ্যামি : যখন আকৃতিগত ভাবে ভিন্ন দুইটি প্যারামিসিয়াম একসঙ্গে মিলিত হয়, তাহাকে অ্যানআইসোগ্যামি বলে।

(2) আইসোগ্যামি : আকৃতিগত ভাবে সমান দুইটি প্যারামিসিয়ামের মিলনকে আইসোগ্যামি বলে।

কনজুগেশেনের শর্ত :

কনজুগেশন একটি জটিল জৈব প্রক্রিয়া। এই জৈবপ্রক্রিয়া নিম্নলিখিত শর্তগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই শর্ত প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন ধরণের হয়।

(i) কনজুগেশান অনুকূল পরিস্থিতিতে ঘটে না। **Maupas** এর মতে উপবাসের সময় বা খাদ্য সরবরাহ কম হইলে এই কনজুগেশান ঘটে। কিছু কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে ব্যাকটিরিয়া জাতীয় খাদ্য এবং কিছু রাসয়ণিক পদার্থ কনজুগেশান ঘটাইবার জন্য প্ররোচিত করে।

(ii) **Kimbell** এর মতানুযায়ী প্যারামিসিয়াম কতকগুলি রাসায়ণিক পদার্থ নিঃসৃত করিয়া কনজুগেশনকে সাহায্য করে।

(iii) প্যারামিসিয়াম কডাটামএর ক্ষেত্রে, কনজুগেশন শেষ রাত্রি বা প্রত্যুষে আরম্ভ হয় এবং অপরাহ্ন পর্য্যন্ত চলে।

(iv) কনজুগেশনের পূর্বে প্যারামিসিয়াম খাদ্য গ্রহণ করা বন্ধ করে ফলে ভিতরের খাদ্যগহ্বর দেখিতে পাওয়া যায় না।

কনজুগেশনের তাৎপর্য্য :

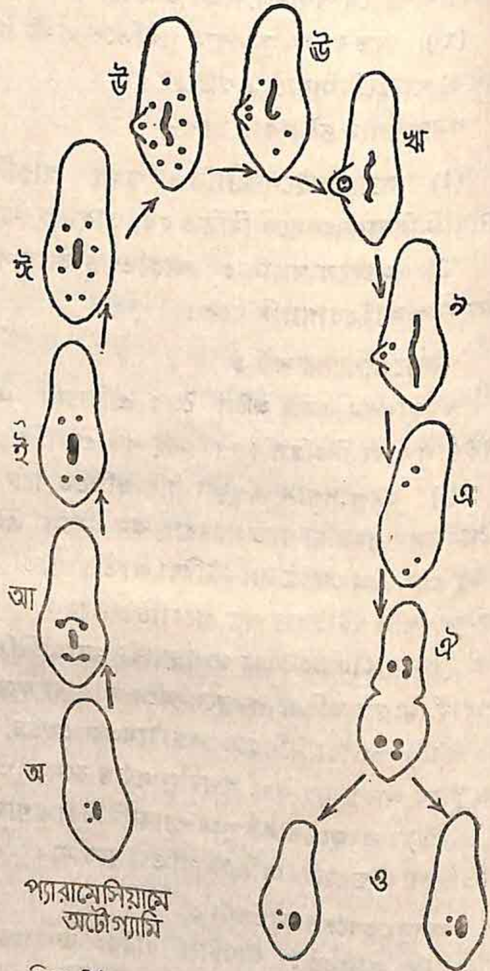
(1) **সঞ্জিবন :** দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমাগত দ্বিবিভাজন চলার ফলে প্যারামিসিয়ামের কর্ম-দক্ষতা, বিপাকীয় ক্রিয়া ভীষণভাবে কমিয়া যায় ফলে ইহারা আকারে ছোট হয় এবং নষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কনজুগেশন পদ্ধতি প্যারমিসিয়ামকে এই পরিণতি হইতে রক্ষা করে এবং প্যারামিসিয়াম নতুন নিউক্লিয়াসের মিলনে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চয় করে ও পুনর্জীবন লাভ করে।

(2) **নিউক্লিয় বস্তুর পুনর্বিন্যাস :** কনজুগেশানের সময় দুইটি বিপরীত নিউক্লিয়াসের মিলনে নতুন শক্তি ও নতুন গুণের সমাবেশ ঘটে। অনেকদিন

ধরিয়া জননের ফলে মেগা-নিউক্লিয়াস সমস্ত বিপাকীয় কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। এই প্রকার জননে নতুন মেগানিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয় ও বিপাকীয় কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা অর্জন করে।

(3) অটোগ্যামি ঃ অটোগ্যামির ক্ষেত্রে কনজুগেশানের মতো মাইক্রোনিউক্লিয়াস পদার্থের বিনিময় হয়, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে দুইটি প্যারামিসিয়ামের প্রয়োজন হয় না। এই পদ্ধতিতে একটি প্যারামিসিয়াম হইতে অপত্য প্যারামিসিয়ামের সৃষ্টি হয়। Diller 1934, 1936 সালে প্যারামিসিয়াম অরেলিয়ার মধ্যে অটোগ্যামি লক্ষ্য করেন। প্যারামিসিয়াম অরেলিয়াতে একটি ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস ও দুইটি মাইক্রো নিউক্লিয়াস থাকে।

(i) মাইক্রোনিউক্লিয়াস দুইটি পরপর দুইবার বিভাজিত হইয়া আটটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠন



চিত্র-54 প্যারামিসিয়ামের অটোগ্যামি পদ্ধতিতে জনন। অ-উ-বিভিন্ন নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন ; ঋ-নিউক্লিয়াসের মিলন এ-চারটি ম্যাইক্রোনিউক্লিয়াসের সৃষ্টি ; ঐ দুইটি মেগা-নিউক্লিয়সে পরিবর্তন এবং বাকী দুইটির পুনঃ-বিভাজন ; ও-কোষ দেহে বিভাজন, প্রতি কোষে একটি মাইক্রো ও দুইটি মেগানিউক্লিয়াসের প্রবেশ।

করে।

(ii) এইসময় ম্যাক্রোনিউক্লিয়াসটি খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় ও পরে সাইটোপ্লাজমে অদৃশ্য হইয়া যায়।

(iii) ইহার পর আটটি মাইক্রোনিউক্লিয়াসের মধ্যে ছয়টি বিনষ্ট হইয়া যায়, অবশিষ্ট দুইটিকে জনন নিউক্লিয়াস বলে।

(iv) এই জনন নিউক্লিয়াস বা প্রোনিউক্লিয়াস দুইটি দেহকোষের মধ্যে একটি ফোলা শঙ্কুর মতো অংশে প্রবেশ করে।

(v) শংকুর মতো ফোলা অংশে দুইটি প্রোনিউক্লিয়াস পরস্পর মিলিত হইয়া ডিপ্লয়েড জাইগোট গঠন করে, জাইগোট নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোমের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়।

(vi) ইহার পর জাইগোট নিউক্লিয়াস পরপর দুইবার বিভক্ত হইয়া চারিটি নিউক্লিয়াস গঠন করে।

(vii) এই চারিটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে দুইটি ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস ও দুইটি মাইক্রোনিউক্লিয়াসে পরিণত হয়।

(viii) ইহার পর মাইক্রোনিউক্লিয়াস ও দেহকোষ বিভক্ত হইয়া দুইটি অপত্য প্যারামিসিয়ামের সৃষ্টি হয়।

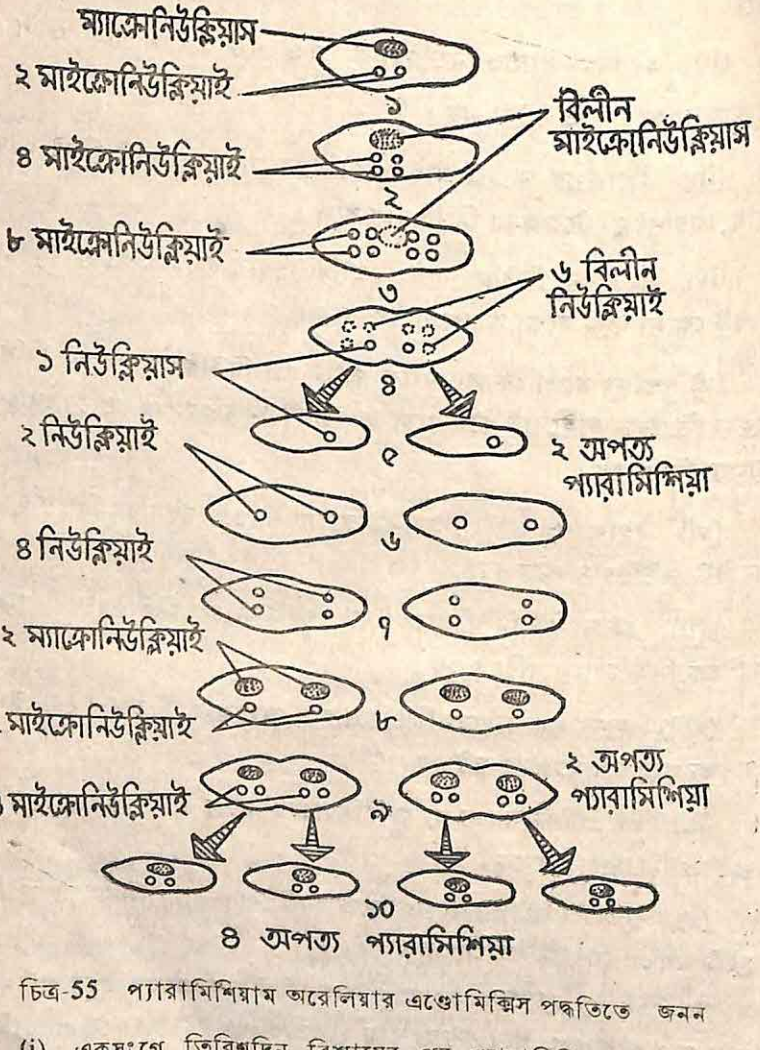
(ix) এই প্রতিটি অপত্য প্যারামিসিয়ামের মধ্যে একটি ম্যাক্রো ও দুইটি মাইক্রোনিউক্লিয়াস থাকে।

(x) সুতরাং অটোগ্যমি পদ্ধতিতে একটি মাতৃ প্যারামিসিয়াম হইতে দুইটি অপত্য প্যারামিসিয়ামের সৃষ্টি হয়।

Sonneborn (1950) এর মতে প্যারামিসিয়াম প্রথমে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে এবং পরে পর্য্যাপ্ত খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইবার ফলে প্যারামিসিয়াম অরেলিয়া অটোগ্যামি পদ্ধতিতে জননকার্য করে।

(4) **এণ্ডোমিক্সিস ঃ** এই পদ্ধতিতে নিউক্লিয় বস্তুর পুর্ণবিন্যাস ঘটে। প্যারামিসিয়াম অরেলিয়ার ক্ষেত্রে এণ্ডোমিক্সিস ঘটিয়া থাকে।

এণ্ডোমিক্সিসের সময় নিউক্লিয়াস ও দেহকোষের নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন হয়।



চিত্র-55 প্যারামিশিয়াম অরেলিয়ার এণ্ডোমিক্সিস পদ্ধতিতে জনন

(i) একসংগে তিরিশদিন বিশ্রামের পর প্যারামিসিয়াম অরেলিয়ার দেহকোষের মধ্যকার ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস ভাঙিয়া যায় এবং সাইটোপ্লাজমের অদৃশ্য হইয়া যায়।

(ii) মাইক্রোনিউক্লিয়াস দুইটি পরপর দুইবার বিভাজিত হইয়া আটটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে।

(iii) আটটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে ছয়টি নিউক্লিয়াস বিনষ্ট হইয়া যায়।

(iv) ইহার পর, দেহকোষটির দ্বি-বিভাজন হয় ফলে দুইটি অপত্যের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি অপত্য প্যারামিসিয়ামের মধ্যে একটি করিয়া মাইক্রোনিউক্লিয়াস থাকে।

(v) অতঃপর প্রতিটি অপত্যের মাইক্রোনিউক্লিয়াসটি খুব শীঘ্রই পরপর দুইবার বিভাজিত হইয়া চারিটি অপত্য নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে।

(vi) চারিটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে দুইটি ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস ও দুইটি মাইক্রোনিউক্লিয়াস পরিণত হয়।

(vii) দুইটি মাইক্রোনিউক্লিয়াস পুনরায় কিভাজিত হয়।

(viii) ইহার পর দেহকোষটি বিভক্ত হয়, ফলে দুইটি অপত্য প্যারামিসিয়ামের সৃষ্টি হয়, প্রতিটিতে একটি ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস ও দুইটি মাইক্রোনিউক্লিয়াস থাকে।

(ix) অতএব এণ্ডোমিক্সিসের ক্ষেত্রে একটি মাতৃ প্যারামিসিয়াম হইতে মোট চারিটি প্যারামিসিয়ামের সৃষ্টি হয়।

(5) **সাইটোগ্যামি ঃ** এই প্রক্রিয়ার ফলে কোন মাইক্রোনিউক্লিয়ার পদার্থের বিনিময় হয় না। **Wichterman 1940** সালে প্রথম প্যারামিসিয়াম কডাটামের মধ্যে সাইটোগ্যামি পদ্ধতি লক্ষ্য করেন।

এই পদ্ধতির সময় দুইটি ছোট প্যারামিসিয়াম কনজুগেশানের মতো উহারা অস্থায়ীভাবে মিলিত হয়। এইবার কনজুগেশানের মতো মাইক্রোনিউক্লিয়াস তিনবার বিভক্ত হয় কিন্তু উভয় প্যারামিসিয়াম দ্বারা সৃষ্ট অপত্য মাইক্রোনিউক্লিয়াসের কোনরূপ মিলন হয় না। প্রত্যেকটি প্যারামিসিয়ামের মধ্যে দুইটি জনন নিউক্লিয়াস পরস্পর মিলিত হয় এবং অটোগ্যামির মতো ডিপ্লয়েড জাইগোট সৃষ্টি করে। পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ হইতে প্রায় তের ঘণ্টা সময় লাগে।

Sonneborn (1941) এর মতে প্যারামিসিয়াম অরেলিয়ার ক্ষেত্রে সাইটোগ্যামি তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে।

(6) **হেমিক্সিস ঃ Diller 1936** সালে প্যারামিসিয়াম অরেলিয়ার মধ্যে এক নূতন রকমের নিউক্লিয়াস পদার্থের বিনিময় লক্ষ্য করেন। এই পদ্ধতি কনজুগেশান, অটোগ্যামি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, ইহাকে হেমিক্সিস বলে। একটিমাত্র দেহকোষেই ঘটিয়া থাকে এই সময় মাইক্রোনিউক্লিয়াস কোন অংশ গ্রহণ করে না এবং ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস দুই বা অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত

হইয়া সাইটোপ্লাজমে অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহার পর অবশিষ্ট ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস এবং মাইক্রোনিউক্লিয়াস সাধারণ কোষবিভাজনের মতো আচরণ করে। Diller ধারণা করেন যে অবশিষ্ট ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস বর্জ্যপদার্থ সংগ্রহ করে ও শুদ্ধিকরনে সাহায্য করে। অতএব তাঁহার মতে এই পদ্ধতিতে জননের কোন ব্যাপার ঘটে না।

ভর্টিসেলা (Vorticella)

ভর্টিসেলার গঠন, জনন ও অন্যান্য জৈবনিক কার্য্য

প্যারামিসিয়ামের ন্যায় ভর্টিসেলাও একটি সিলিয়াযুক্ত এককোষী বা আদ্যপ্রাণী। তবে সিলিয়ার ব্যাপ্তি শুধুমাত্র মুখপ্রান্তে সীমিত। ইহারা **বেল অ্যানিমেল কিউল (bell animal cule)** নামেই বেশী পরিচিত। প্রায় দুইশত প্রজাতি ভুক্ত ভর্টিসেলা আছে। ইহারা একভাবে জীবনধারণ করিলেও একে অন্যের খুব কাছাকাছি বাস করে। কিন্তু ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত গন **কারচে্শিয়াম (Curchesium)** উপনিবেশে বাস করে।

প্রাণীরাজ্যে ভর্টিসেলার অবস্থান নিম্নরূপ

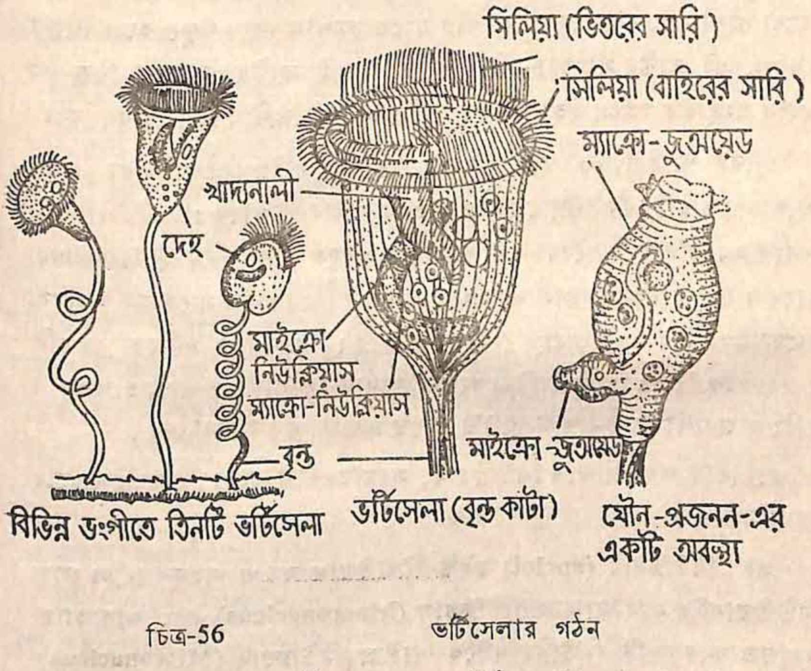
পর্ব : সিলিওফোরা
শ্রেণী : অলিগোহাইমেনোফোরিয়া
বর্গ : পেরিট্রিকিডা
গণ : ভর্টিসেলা

স্বভাব ও বসতি :

পুকুর ও খানাডোবা প্রভৃতির মিঠাজলে ভর্টিসেলা বাস করে। সাধারনতঃ স্থির জলে, যেখানে পচনশীল জৈবপদার্থের প্রাচুর্য, সেইস্থানে ইহাদের বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। প্যারমিসিয়ামের ন্যায় ইহারা স্বাধীনভাবে সঞ্চরনশীল নয়। ইহারা একইস্থানে স্থায় হইয়া বাস করে। ইহারা প্রধানতঃ ব্যাকটিরিয়াকে খাদ্যহিসাবে গ্রহণ করে।

গঠন (Structure) : সবুজ অথবা নীলরঙের ভর্টিসেলার দেহটি উলটানো ঘন্টার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, [56 নং চিত্র]। ঘণ্টার হাতলের ন্যায় বৃন্তটি লম্বা, তবে পাকানো অবস্থায় ও দেখা যায় ও পাক খাওয়ানো অবস্থায় থাকে। এই বৃন্তের প্রান্তভাগের সাহায্যে ইহারা জলে

নিমজ্জিত বা জলজ কোন উদ্ভিদ অথবা অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে পাকাইয়া আটকাইয়া থাকে। উল্লেখ্য যে, ইহা অত্যন্ত সংকোচনশীল। বৃন্তে সিলিয়া বা এণ্ডোপ্লাজম থাকে না। ইহার আভ্যন্তরিক সঙ্কোচনশীল তন্তুগুলি প্রোটোপ্লাজম আবরনীবদ্ধ বৃন্তের কেন্দ্র বরাবর পাকাইয়া প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহাকে কেন্দ্রিয় সূত্র **(Axial filament)** বা স্পাসমোনিমি **(Spasmoneme)** বলে।



চিত্র-56 ভর্টিসেলার গঠন

সমস্ত প্রজাতির মধ্যে ভর্টিসেলা ক্যাম্পানিউলা **(Vorticella Campanuilla)** আকারে বৃহত্তম। ইহার ঘণ্টাকৃতি দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় 157 μ এবং প্রস্থ 99 μ এবং বৃন্তের মাপ 53 μ থেকে 4150 μ পর্যন্ত হয়। সমগ্র দেহটি একটি কিউটিকলের আবরণী দ্বারা আবৃত।

ঘণ্টাকৃতি দেহাগ্রের প্রোটোপ্লাজম অন্তঃ ও বহিঃপ্লাজমে বিভক্ত। ইহার মুক্তপ্রান্তের বহিরাংশ পরিধি বরাবর অপেক্ষাকৃত স্থূলাকার ইহাকেই কলার **(Collar)** বলে। ঘণ্টার সাইটোপ্লাজম অংশ ঘণ্টার ভিতর হইতে ইহার বাহিরে গোলাকারে উচু হইয়া ঢাকনার মত থাকে তাই ইহাকে

পেরিস্টোমিয়াল ঢাকনা (Peristomial disc) বলে। এই ঢাকনার চারপাশে থাকে প্রচুর সিলিয়া এবং ইহার ও ঘণ্টার কানার অন্তবর্তীস্থানেও প্রচুর সিলিয়া সজ্জিত থাকে। ঘণ্টার কিনারা ও ঢাকনার মধ্যবর্তী অংশে একটি সরু নালার ন্যায় খাঁজ আছে ইহাকে **পেরিস্টোমিয়াম নালী** বলে। ঢাকনার একপ্রান্তে একটি অবতল অংশের কেন্দ্রে ছিদ্রের ন্যায় একটি যুক্ত অংশকে **ভেস্টিবিউল (Vestibule)** বলে। এই ভেস্টিবিউলের সহিত একটি সূক্ষ্ম সঙ্কীর্ণ নালী **(সাইটোফ্যারিঙ্কস)** যুক্ত। ইহা দেহের এণ্ডোপ্লাজমের মধ্যে প্রসারিত, সেখানে গোলাকার সংকোচনশীল গহ্বর উন্মুক্ত হয়। উল্লেখ-যোগ্য, এই প্রাণীর সংকোচনশীল গহ্বর কখনই ফাটিয়া যায় না কিন্তু এই গহ্বর সংকুচিত হইলে ইহার অন্তস্থ জলীয় পদার্থ ভেস্টিবিউলে প্রবেশ করে।

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, দেহের বহিঃপ্লাজমের উপর একটি অপেক্ষাকৃত কঠিণ **কিউটিকল (Cuticle)** এর আবরণী থাকে। এই আবরণীর তলায় লম্বালম্বি বা অনুদৈর্ঘভাবে সাজান তন্তুসদৃশ মায়োনিম **(Myoneme)** থাকে। এই মায়োনিমগুলি খুব সংকোচনশীল। এইগুলির সংকোচন অনুদৈর্ঘ্য মায়োনিমগুলির সমগ্র দেহের দৈর্ঘ্য হ্রাস করে। বক্রভাবে সজ্জিত তন্তুগুলি ঢাকনাটিকে ভিতর দিকে টানিয়া আনে আবার গোলাকারে সজ্জিত তন্তুগুলি পরিঃ খাদ্যনালী (ঢাকনার উপরে)'র অন্তস্থ চলাচল বন্ধ করিয়া দেয়।

দানাদার অন্তঃ প্লাজমে নিউক্লিয়াই, সঙ্কোচনশীল গহ্বর এবং খাদ্যগহ্বর দেখা যায়।

(a) নিউক্লিয়াই (nuclei) দুইটি নিউক্লিয়াস বড় ও অশ্বক্ষুরাকৃতির ন্যায় নিউক্লিয়াসটির নাম **ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস (Macronucleus)** এবং কাছাকাছি অবস্থিত করে ছোট নিউক্লিয়াসটিকে মাইক্রোনিউক্লিয়াস **(Micronucleus)** বলে।

(b) সংকোচনশীল গহ্বর (Controctile) ঃ ,ভেস্টিবিউল সংলগ্ন সূক্ষ্ম পর্দা ঘেরা একটি স্থায়ী অন্তস্থান দেখা যায়। ইহাই সংকোচনশীল ভ্যাকুওল বা গহ্বর, পূর্ণস্ফীত অবস্থায় 7μ পর্যন্ত হয়। দেহের জলসাম্য বজায় রাখাই ইহার কাজ। **ইউগ্লিনার (Euglena) ঃ** মত ইহারাও প্রতিবার সংকোচনের সময় ইহার মধ্যস্থিত তরল পদার্থ ইহার সংলগ্ন একটি সঞ্চয় থলিতে যুক্ত হয়। সঞ্চয়থলি হইতে এই পদার্থ, একটি স্থায়ী সংযোগ পথের মাধ্যমে ভেস্টিবিউলে যায় এবং তথা হইতে বাহিরে যুক্ত হয়। কয়েকটি প্রজাতির ভর্টিসেলাতে

দুইটি সংকোচনশীল গহ্বর থাকে।

(c) খাদ্যগহ্বর (Food vacuole) : অন্তঃপ্লাজমে অনেক বিভিন্ন আয়তনের গোলাকার খাদ্যগহ্বর দেখা যায়।

চলন (Locomotion) :

সাধারনতঃ সিলিয়া খুব সক্রিয় হয় এবং বৃন্তের প্রসারন খুব দ্রুত ঘটে। এই বৃন্ত ঘড়ির স্প্রিং এর মত পাকাইতে ও খুলিতে সক্ষম। ফলে ইহা ভর্টিসেলাকে দেহ সঞ্চালনে সাহায্য করে।

পুষ্টি (Nutrition) :

প্যারামিসিয়ামের ন্যায় ইহাদেরও **হোলোজয়িক (Holozoic)** পুষ্টি দেখা যায়। ঘণ্টাকৃতি দেহের সম্মুখভাগে গোলাকারে সজ্জিত সিলিয়াগুলির ক্রমাগত ধারাবাহিক সঞ্চালন হইতে দেখা যায়। ফলে, ভেস্টিবিউল অভিমুখী জলস্রোতের সৃষ্টি হয়। খাদ্যকনাগুলি জলে ভাসমান অবস্থায় থাকে। খাদ্যকনাগুলি কিছুপরিমান জল লইয়া সাইটোফ্যারিঙ্কসের মাধ্যমে অন্তঃপ্লাজমে প্রবেশ করে। এই সাইটোফ্যারিঙ্কের প্রান্তে একের পর এক খাদ্যগহ্বরের সৃষ্টি হয়। খাদ্যগহ্বরগুলি এণ্ডোপ্লাজমে অনির্দিষ্টভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। অতিরিক্ত পাচিতখাদ্য গ্লাইকোজেন কনিকারূপে অন্তঃপ্লাজমে জমা হয়।

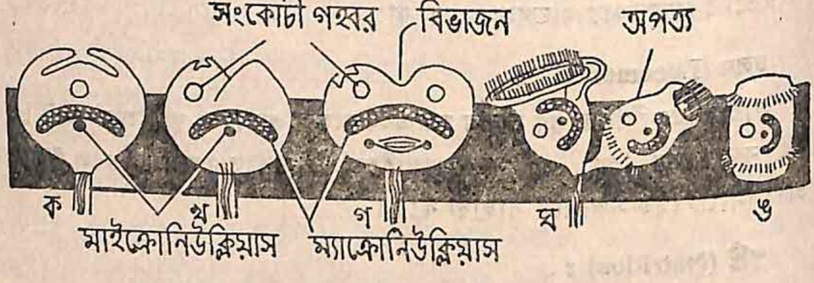
জনন (Reproduction) :

ভর্টিসেলার দুইধরনের—অযৌন ও যৌন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার ঘটে। প্রধানতঃ অযৌন—**অণুদৈর্ঘ্য দ্বিবিভাজন (Longitudinal binary fission)** পদ্ধতিতে ইহার প্রজনন ঘটে। ইহা ব্যতীত কিছুদিন পরে পরে **কনজুগেশান (Conjugation)** প্রক্রিয়ায় ইহার প্রজনন ঘটে। প্রতিকূল পরিবেশে ইহারা আবরণীবদ্ধ হইয়া দুঃসময় অতিক্রম করে।

অণুদৈর্ঘ্য দ্বিবিভাজন (Longitudinal binary fission) : এই পদ্ধতিতে ভর্টিসেলার দেহের অক্ষরেখা বরাবর বা অক্ষের সমান্তরাল রেখায় লম্বালম্বি-ভাবে দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি ভর্টিসেলার সৃষ্টি হয় [-57 নং চিত্র]।

বিভাজনের সময় ভর্টিসেলার দেহাগ্রের প্রান্তভাগ সংকুচিত হইয়া দেহটি খর্বাকৃতি করে। অবশ্য সংকোচনশীল গহ্বর সক্রিয় থাকে। বাঁকানো

বড় নিউক্লিয়াসটি সংকোচনের ফলে সোজা ও সরল হয় এবং অতঃ-

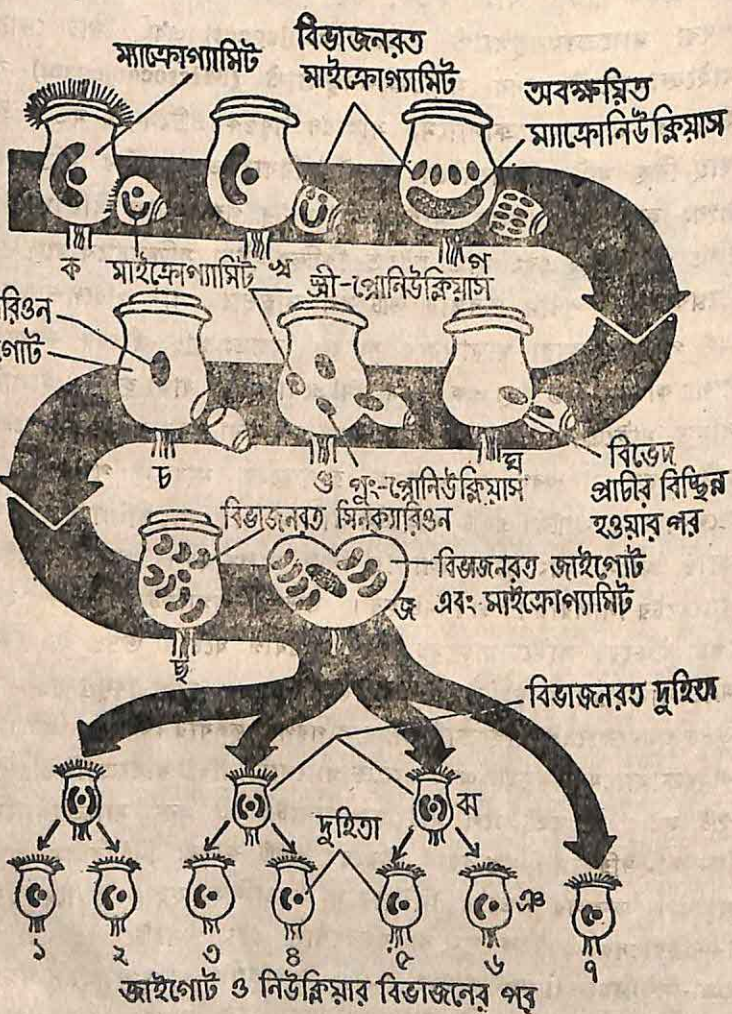


চিত্র-57 ভর্টিসেলার দ্বিবিভাজন

পর দেহের মাঝামাঝি আসিয়া আনুভূমিক অবস্থায় থাকে। এইবার ম্যাক্রো-নিউক্লিয়াস **আ—মাইটোসিস (Amitosis)** প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া দুইটি নিউক্লিয়াস গঠন করে। ইহার ক্ষুদ্র **মাইক্রোনিউক্লিয়াসটি** ও **মাইটোসিস (Mitosis)** প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া দুইটি নিউক্লিয়াস গঠন করে। এই সময়ে দেহকোষের অগ্রপ্রান্তের কেন্দ্র হইতে লম্বভাবে বিভাজনরেখা ক্রমশঃ দেহের পশ্চাদঅংশে প্রসারিত হয়। অবশেষে দুইটি অপেক্ষাকৃত অসমান ভর্টিসেলার সৃষ্টি হয়। ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও বৃন্তহীন দুহিতা কোষটিকে **টেলোট্রক (Telotrch)** বলে। এই মূহুর্তে ইহার পশ্চাদ ঘিরিয়া সিলিয়ার ফিতা গড়িয়া ওঠে। এই সিলিয়াগুলির আন্দেলিত হইবার জন্যই ইহারা সক্রিয়ভাবে সাঁতার কাটিয়া বিচরন করে। কিছুক্ষন পরেই ইহারা **আঁঠালো চাক্তি (adhesive disc)** অথবা **স্কপুলা (scopula)**-র সাহায্যে জলজ উদ্ভিদের সংলগ্ন হয়। ইহার পর গঠন সম্পূর্ণ হইলে নবগঠিত বৃন্তের সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ ভটিসেলার মত কোন বস্তুতে আটকাইয়া নূতন জীবন শুরু করে। অনুদৈর্ঘ্য দ্বিবিভাজনে এইভাবে ভটিসেলা বৃন্তসহ একটি অংশ হইতে অন্য অংশ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে।

কনজুগেশান (Conjugation)—এই পদ্ধতিতে ভটিসেলার যৌনজনন সাধিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় অন্যতম উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য যে, দুইটি **অসম আকৃতির জননকোষ (anisogametes)** মিলনে অংশগ্রহণ করে। প্রক্রিয়ার প্রারম্ভে লম্বা বিভাজন প্রক্রিয়ার দ্বারা দুইটি অসমআকৃতির ভর্টিসেলা গঠিত হয়। অবশ্য কোন কোন প্রজাতি (ভর্টিসেলা নেবুলিফেরা) তে পুনঃ পুনঃ

দ্বিবিভাজন ঘটে। যাহা হউক, বড় দুহিতা কোষটিকে **ম্যাইক্রোগ্যামেট** অথবা **ম্যাক্রোকনজুগ্যাণ্ট (Macroconjugant)** এবং ছোট কোষটিকে **মাইক্রোগ্যামেট** অথবা **মাইক্রোকনজুগ্যাণ্ট (Microconjugant)** বলে। ইহাদের মধ্যে ম্যাক্রোগ্যামেট সাধারণ সবৃন্তক ভর্টিসেলার মত। ইহারা স্থানু কিন্তু মাইক্রোগ্যামেটকে আকৃষ্ট করিবার জন্য শারীর বৃত্তিয় ক্ষমতা সম্পন্ন হয়। অপরপক্ষে, মাইক্রোগ্যামেটের পশ্চাদপ্রান্ত ঘিরিয়া সিলিয়ার ফিতা গঠিত হয় এবং মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সক্রিয়ভাবে জলে ভাসে। উল্লেখযোগ্য, পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় ভর্টিসেলা স্থানুভারে বাস করিলেও জীবনের এই পর্যায়ে ইহারা স্থানান্তরণে সক্ষম। বস্তুতঃ স্থানু জীবের কনজুগেশান সম্পন্ন করিবার জন্য ইহা এক ধরনের অভিযোজন। যাহা হউক, টেলোট্রকের সহিত মাইক্রোগ্যামেটের পার্থক্যের মধ্যে ইহারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, ইহাদের বৃন্ত গঠিত হয় না এবং কোনক্রমেই রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ হয় না। জলে সাঁতার কাটিয়া একটি মাইক্রোগ্যামেট স্থানু ম্যাক্রোগ্যামেটের কাছাকাছি আসে এবং বৃন্তের গোড়ায় গিয়া সংলগ্ন হয়। অতঃপর মাইক্রোগ্যামেটের সিলিয়ার ফিতা বিনষ্ট হয়। উভয় কনজুগ্যাণ্টের পেলিকল্ ফাটিয়া গিয়া উভয়ের সাইটোপ্লাজমের ভিতর সংযোগ ঘটে। উভয় জননকোষের ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস দুইটি ক্রমশঃ সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু উভয় জননকোষেই মাইক্রোনিউক্লিয়াস পরপর দুইবার বিভাজিত হয়। ফলে মাইক্রোগ্যামেটে আটটি এবং ম্যাক্রোগ্যামেটে চারিটি মাইক্রোনিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে মাইক্রোগ্যামেটের 7টি এবং ম্যাক্রোগ্যামেটের তিনটি নিউক্লিয়াস বিলুপ্ত হয়। উভয়ের একটি করিয়া নিউক্লিয়াস অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর উভয়ের নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়। ইহাদের দুইটি নিউক্লিয়াসের একটিকে পুং বা সঞ্চরণশীল এবং অপরটিকে স্ত্রী বা স্থানু **প্রো-নিউক্লিয়াস (pro-nucleus)** বলে। সঞ্চরণশীল বা পুং প্রোনিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমের সংযোগী সেতুর মধ্য দিয়া একে অপরের দিকে ধাবিত হয়। এই ভাবে মাইক্রোগ্যামেটের সঞ্চরণশীল বা পুং প্রোনিউক্লিয়াসের সহিত মিলিত হইয়া জাইগোট নিউক্লিয়াস বা **সিন্‌ক্যারিয়ন (Synkarion)** সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে, ম্যাক্রোগ্যামেটের সঞ্চরণশীল বা পুং প্রো-নিউক্লিয়াস ও মাইক্রোগ্যামেটের স্থানু বা স্ত্রী-প্রোনিউক্লিয়াস বিনষ্ট হয়। ইতিমধ্যে মাইক্রোগ্যামেটের সাইটোপ্লাজম, ম্যাক্রোগ্যামেটের মধ্যে আসিয়া পড়ে।



চিত্র-58 ভর্টিসেলার সংশ্লেষ পদ্ধতিতে জনন

যাহা হউক, নিষিক্ত মাইক্রোকন-জুগ্যাণ্ট (**Microconjugant**) জাইগোট সৃষ্টি করে।

অতঃপর জাইগোট অন্তঃস্থিত সিনক্যারিয়ন তিনবার বিভাজিত হইয়া

আটটি নিউক্লিয়াস গঠন করে। ইহাদের মধ্যে সাতটি বড় হয় এবং ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস গঠন করে। অপরটি মাইক্রোনিউক্লিয়াস রূপে পরিচিত হয়। এই অবস্থায় জাইগোট কোষটি মাইক্রোনিউক্লিয়াস সহ বিভাজিত হয়। ফলে দুহিতা কোষদুইটির উভয়েই একটি করিয়া মাইক্রো নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট হয় এবং একটিতে চারিটি ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস এবং অপটিতে তিনটি নিউক্লিয়াস যায়। পরবর্তীকালে, পুনরায় পরপর দুইবার বিভাজিত হইয়া শেষপর্যন্ত প্রতিটি হইতে চারিটি এবং অপরটি হইতে তিনটি ভর্টিসেলার সৃষ্টি হয়। প্রতিটি বিভাজনেই মাইক্রোনিউক্লিয়াস একবার করিয়া বিভাজিত হয় ও নবজাতক দুইটি কোষের প্রতিটিতে একটি করিয়া যায়। এইভাবে ভর্টিসেলার কনজুগেশান পদ্ধতি সম্পন্ন হয়। নবগঠিত ভর্টিসেলা বড় হইতে থাকে, এরপর সবৃন্তক হইয়া পূর্ণাঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ভর্টিসেলার কনজুগেশান পদ্ধতি প্যারামিসিয়ামের হইতেও আরও উন্নত ধরনের। ইহাদের সংশ্লেষ স্থায়ী এবং উভয় কনজুগ্যাণ্টের গঠন পদ্ধতি ভিন্ন প্রকৃতির। ইহাছাড়া আরও অন্যান্য পার্থক্য বর্তমান। তাই, ইহার কনজুগেশান প্রক্রিয়া উন্নত ধরনের প্রাণীদের নিষেক প্রক্রিয়ার সহিত আংশিকভাবে তুলনীয়।

ভর্টিসেলার জৈবনিক কার্য্য ঃ—ভর্টিসেলার অন্যান্য জৈবনিক কার্যের মধ্যে **শ্বসন (Respiration)** ও **রেচন (Excretion)** প্যারামিসিয়ামের মত ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে ভেস্টিবিউল সংলগ্ন পর্দা-ঘেরা একটি স্থায়ী সংকোচনশীল গহ্বর থাকে। দেহের জলসাম্য বজায় রাখাই ইহার কাজ।

ইহাছাড়া ভর্টিসেলার মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট দেখা যায়। যে কোন উদ্দীপনায় ইহারা তাৎক্ষনিক সাড়া দেয়।

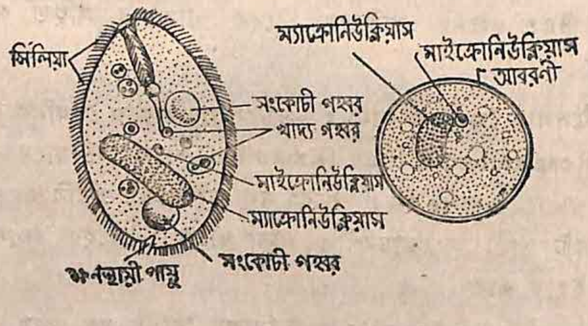
আবরনীবদ্ধতা (Encystation)—প্রতিকূল পরিবেশে ভর্টিসেলা কখনও কখনও সিস্ট গঠন করে। সাধারণভাবে ইহারা প্রতিকূল পরিবেশে বৃন্ত হইতে খসিয়া পড়িয়া সিলিয়ার সাহায্যে নূতন অনুকূল স্থান নির্বাচন করে। তারপর নবগঠিত বৃন্তের সাহায্যে সংলগ্ন হইয়া নূতন জীবন শুরু করে। যখন সিষ্ট তৈয়ারী হয় তাহার বৃন্তের অগ্রভাগ হইতে খসিয়া জলে পড়ে। সিলিয়ার ফিতা গঠিত হওয়ার পর সক্রিয় ভাবে সাঁতার কাটিয়া সুবিধামত স্থান ও

বস্তু নির্বাচন করে।

অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়া আসিলেই আবার আবরণীবদ্ধতা ঘটে। অতঃপর নবগঠিত বৃন্তের সাহায্যে সংলগ্ন হইয়া পরিপূর্ণ আকার ধারন করিয়া সুষ্ঠ জীবনযাপন করে।

সিলিয়াযুক্ত কয়েকটি প্রাণীর বহিরাকৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরন

1. **ব্যালানটিডিয়াম (Balantidium)** ঃ সর্বত্র বিস্তৃত ব্যালানটিডিয়াম একটি (প্রধানতঃ উভচর এবং স্তন্যপায়ীর) আন্ত্রিক পরজীবী প্রাণী। সঞ্চরনশীল পরজীবীর আকৃতি ডিমের ন্যায় এবং লম্বায় প্রায় 10μ থেকে 300μ পর্য্যন্ত হয়। দেহের সম্মুখভাগ কিছুটা সরু ও পশ্চাদভাগ গোলাকার। সিলিয়ার সজ্জা সর্বত্র প্রায় একই রকম। দেহের সম্মুখভাগে **পেরিস্টোম** এবং **সাইটোস্টোম**। দুইটি নিউক্লিয়াস—**ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস** লম্বাটে এবং সসেজ **(Sausage)** আকৃতির এবং **মাইক্রোনিউক্লিয়াস** গোলাকার। উল্লেখ যোগ্য,



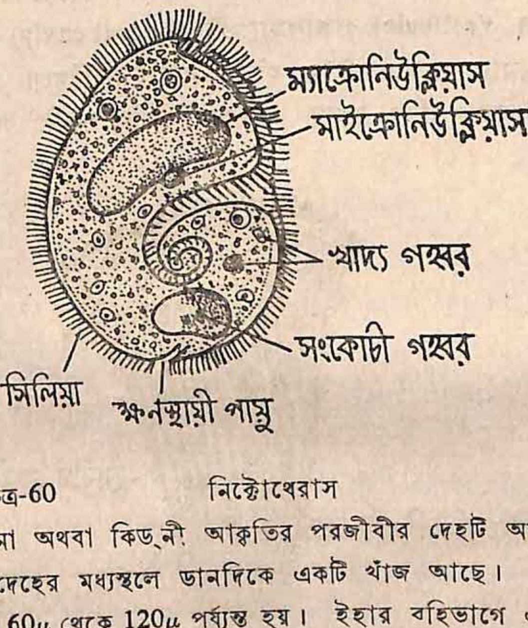
চিত্র-59 ক খ

ক) ব্যালনিটিডিয়াম কোলাই খ) বি-কোলই সিস্ট।

ব্যালানটিডিয়ামের দেহে একটি বা দুইটি সঙ্কোচনশীল গহ্বর বিদ্যমান। দেহের পশ্চাদভাগে সাইটোপেজ অবস্থিত। ইহার দ্বারা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ দেহের বাহিরে যায়। ইহাদের হোলোজোয়িক পুষ্টি দেখা যায় এবং দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে অযৌন জনন সম্পন্ন করে। ব্যালানটিডিয়ামের প্রায় পঞ্চাশটি প্রজাতির মধ্যে একটি প্রজাতি (**B. Coli**) মানবদেহে রোগ

সংক্রামিত করে।

2. নিক্টোথেরাস **(Nyctotherus)** ঃ ইহাও একধরনের উভচর এবং অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণীর আন্ত্রিক **(Endo-Commencal)** পরজীবী প্রাণী। মানুষের অন্ত্রেও অনেক সময় ইহাদের দেখা যায়। খুব সাধারন এবং সহজপ্রাপ্য প্রজাতি **নিক্টোথেরাস করডিফরমিস, (Nyctotherus cordiformis)** ব্যাঙ **(Frog)** এবং ট্যাডপোলে-এর মলাশয়ে বাস করে।

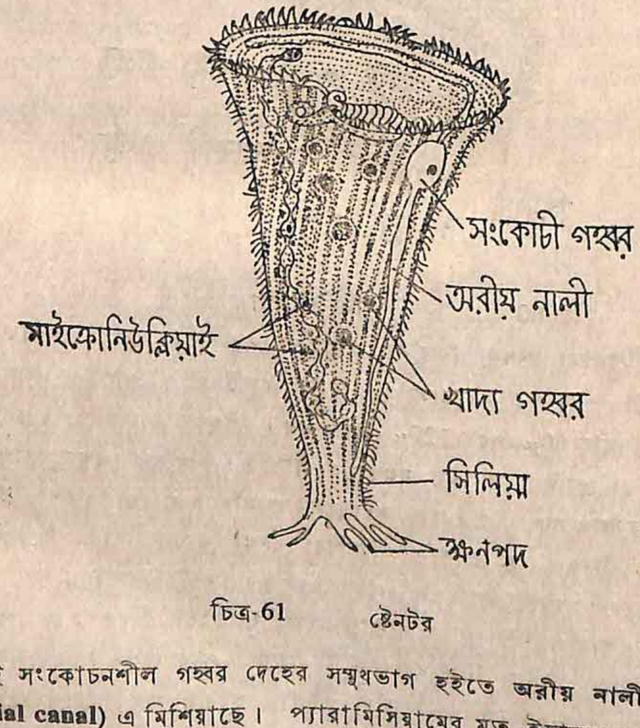


চিত্র-60 নিক্টোথেরাস

মটরদানা অথবা কিড্‌নী আকৃতির পরজীবীর দেহটি অঙ্কীয় পৃষ্ঠদেশ চ্যাপ্টা। দেহের মধ্যস্থলে ডানদিকে একটি খাঁজ আছে। ইহার দেহটি লম্বায় প্রায় 60μ থেকে 120μ পর্য্যন্ত হয়। ইহার বহিভাগে একই দৈর্ঘ্যের সিলিয়া দ্রাঘিমা বরাবর ঘনভাবে সজ্জিত। দেহের সম্মুখ ভাগ হইতে পেরিস্টোম সরু হইয়া দেহের মধ্যস্থলের ডানদিকে পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহার রেখা বরাবর বড় আকৃতির সিলিয়া দেখা যায়। সাইটোস্টোম একটু বাঁকানো সাইটোফ্যারিঙ্কস্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সাইটোফ্যারিঙ্কসের অভ্যন্তরে ঢেউখেলান পর্দা আছে। এক্টোপ্লাজমের বাহিরের দিকে সরু এবং ইহার পেলিকলে, ট্রাইকোসিস্ট থাকে না। সুস্পষ্ট পাকাপাকিভাবে সাইটোপেজ দেহের পশ্চাদভাগে অবস্থিত। এইখান হইতে সৃষ্ট সাইটোপ্রক্ট **(Cytoproct)**। একটি বড় সংকোচনশীল গহ্বর দেহের পশ্চাদভাগে সাইটোপ্রক্টের কাছাকাছি অবস্থিত। রেচনজাতীয় পদার্থ সাইটোপ্রক্টের মধ্যে নির্বাহ করে।

দেহের অর্ধ সম্মুখভাগে ছোট মাইক্রোনিউক্লিয়াস বৃক্কের আকৃতির ম্যাক্রোনিউক্লিয়াসের কাছাকাছি অবস্থান করে। এণ্ডোপ্লাজমের অভ্যন্তরে বাদামীরঙের গ্লাইকোজেন বস্তুসমূহ থাকে। ইহাদের ও হলোজোয়িক পুষ্টি দেখা যায় এবং দ্বিবিভাজন এবং কনজুগেশান পদ্ধতিতে বংশবিস্তার ঘটে।

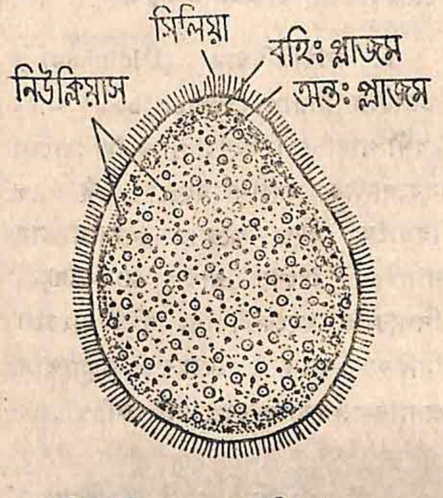
3. স্টেনটর (Stentor) ঃ স্বাধীনজীবী। সাধারণতঃ দূষিত পুকুরের জলে পাওয়া যায়। প্রাণীটির আকৃতি অনেকটা ফানেলের মত। চওড়া **ভেস্টিবিউল (Vestibule)** বাক্কালক্যাভিটি **(buccal caviy)** পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাও আবার সাইটোস্টোম হইয়া সাইটোফারিঙ্কসে পৌছাইয়াছে। ম্যাক্রোনিউক্লিয়াসগুলির সম্মুখে মাইক্রোনিউক্লিয়াসগুলি অবস্থান করে।



চিত্র-61 ষ্টেনটর

একটিই সংকোচনশীল গহ্বর দেহের সম্মুখভাগ হইতে অরীয় নালীকাতে **(Radial canal)** এ মিশিয়াছে। প্যারামিসিয়ামের মত ইহাদেরও হলোজোয়িক পুষ্টি এবং তির্যকভাবে দ্বিবিভাজন এবং কনজুগেশান পদ্ধতিতে ইহাদের জনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

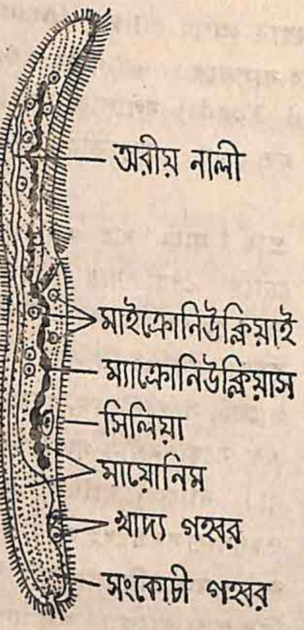
4. ওপালিনা (**Opalina**) ঃ অ্যাম্ফিবিয়ান শ্রেণীর অ্যানুরা (**Anura**) -র বৃহদঅন্ত্রে ওপালিনা **অন্তঃপরজীবী** হিসাবে বাসকরে। এই গনের অন্তর্গত ওপালিনা রানারাস্ ব্যাঙের (**Frog and Toads**) মলাশয়ে সচরাচর পাওয়া যায়। ইহার দেহটি চ্যাপ্টা পাতার মত এবং গোলাকার। লম্বায়



চিত্র-62 ওপালিনা

প্রায় 1 **mm.** মত এবং খালি চোখে দেখা যায়। পাতলা অথচ দৃঢ় পেলিকলের চারিপার্শ্বে সমান আকৃতির সিলিয়া থাকে। গালেট, সাইটোপেজ, খাদ্যগহ্বর এবং সঙ্কোচনশীল গহ্বর থাকে-না। **স্যাপ্রোজোয়িক** প্রথায় তরলখাদ্য সমগ্র দেহ দ্বারা শোষন করে। স্বচ্ছ বহিঃপ্লাজমে মাইও-নিম সূতা থাকে। অন্তঃপ্লাজমে সমান আকৃতির অসংখ নিউ-ক্লিয়াস ইতঃস্তত ভাবে থাকে। প্রতিটি নিউক্লিয়াসেই ট্রোফোক্রোমটিন এবং ইডিওক্রোমটিন বিদ্যমান। অন্তঃপ্লাজমে আরও অনেক বিভিন্ন আকৃতির দানাদার বস্তু থাকে। বছরের বেশীরভাগ সময়ে ওপালিনা আড়াআড়িভাবে অথবা তির্যকভাবে দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।

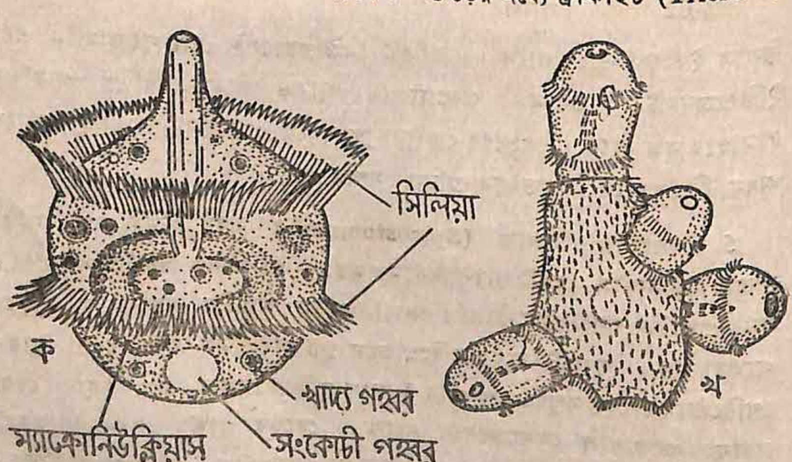
5. **স্পাইরোস্টোমাম** (**Spirostomum**) ঃ লম্বা কৃমির মত, অতি-মাত্রায় সঞ্চরনশীল, দেহটি চ্যাপ্টাধরনের হয়। এই গনের অন্তর্গত সবচাইতে বড় প্রজাতি **স্পাইরোস্টোমাম অ্যাসিগুয়াম** অগভীর ডোবা বা পুকুরে পাওয়া যায়। লম্বাটে দেহের বহিঃপ্লাজমে সুষ্ট মাইওনিম সূতা দেখা যায়। পেরিস্টোম দেহের সম্মুখভাগে প্রায় $\frac{1}{3}$ অংশ জুড়িয়া বিস্তৃত এবং ইহার রেখা বরাবর **এডোরাল মেমব্রেনেসি** থাকে। দেহের বাকী অংশে ছোটছোট সিলিয়া দ্বারা বেষ্টিত। দেহের পশ্চাদভাগের শেষঅংশে সাটোপেজ অবস্থিত। দেহের মধ্যভাগেই বাঁকানো দীর্ঘ ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস থাকে। মাইক্রো-নিউক্লিয়াসগুলি ততটা সুস্পষ্ট নয়। দেহের পশ্চাদ অংশে কিছুটা ন্যাসপতি



চিত্র-63 স্পাইরোষ্টোমাম

আকৃতির সংকোচনশীল গহ্বর বিদ্যমান। দেহের প্রায় সম্মুখভাগ হইতে একটি দীর্ঘ নালিকা সঙ্কোচনশীল গহ্বরের সহিত যুক্ত। কনজুগেশান এবং জটিল দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়ায় ইহারা জনন সম্পন্ন করে।

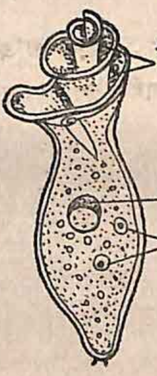
6. ডাইডিনিয়াম (Didinium) ঃ ওয়াটার বিয়ার (Water bear) নামে বেশী পরিচিত। ইহারা প্যারামিসিয়ামের সমগোত্রীয় তথাপি **ইহাদেরকেই** খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। **ডাইডিনিয়াম নাস্থটাম** দৈর্ঘ্যে প্রায় 40—200μ। পিপাকৃতি দেহকে ঘিরিয়া দুইটি গার্ডেলে সিলিয়া থাকে। দেহের সম্মুখভাগ প্রসারিত হইয়া শুঁড়ের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার অগ্রভাগে সাইটোস্টোম থাকে। শুঁড়ের মধ্যে ট্রাকাইট (**Trichites**)



চিত্র-64 ক) ডিডিনাম নাস্থটাম খ) প্যারামিসিয়ামকে আক্রমণকারী ডিডিনাম

বস্তু থাকে। এণ্ডোপ্লাজমের অভ্যন্তরে বড় ঘোড়ার পায়ের নালের মত ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস বিদ্যমান। সংকোচনশীল গহ্বর এবং সাইটোপেজ্ দেহের পশ্চাদভাগে অবস্থিত। ইহারা শুঁড় দ্বারাই শিকার বস্তুকে বিদ্ধ করে এবং শিকার বস্তুর সমগ্র দেহটিই গলাধঃকরন করে। আড়াআড়িভাবে দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে জনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিলেও সংশ্লেষ পদ্ধতিতে সময়ে সময়ে জননকার্য ঘটিয়া থাকে। প্রতিকূল পরিবেশে ইহারা এনসিস্টমেণ্ট তৈয়ারী করে।

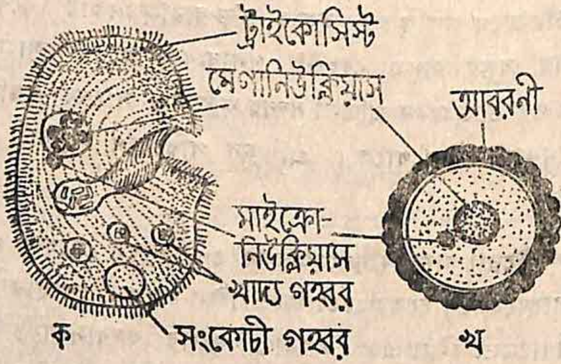
7. স্পাইরোকোনা **(Spirochona)** :—ইহারা দেহের পশ্চাদভাগের চাকতির সাহায্যে পোষকের দেহে আটকাইয়া থাকে। স্পাইরোকোনা গনের প্রাণীরা সাধারনতঃ মিঠা এবং লবনাক্ত জলের বসবাসকারী **গ্যামিউরাস (Gammurus)** এর ফুলকাতে এ পাওয়া যায়। লম্বা আকৃতির দেহের সম্মুখ ভাগে ফানেলের মত পেঁচানো পেরিষ্টোম থাকে। ইহার অভ্যন্তরে এডোরাল মেম-ব্রেনেলি থাকে না কিন্তু সিলিয়া থাকে। দেহের অবশিষ্ট অংশে সিলিয়া নাই। দেহে একটি মাত্র **নিউক্লিয়াস** বিদ্যমান। অযৌন জননে দেহের পার্শ্বে কোরকের সৃষ্টি করে। কনজুগেশানের সময় পরস্পর পেরিষ্টোম দ্বারা **মিলিত হয়।**



চিত্র-**65** স্পাইরোকোনা

8. কোলপোডা **(Colpoda)** :—মিঠা জলে বসবাসকারী কোলপোডা মটরদানা অথবা কিডনি আকৃতির হয়। দেহটি চ্যাপ্টা ধরনের, ইহার পৃষ্ঠদেশ গোলাকার। অঙ্কীয় দেশের বাঁদিকে সাইটোস্টোম অবস্থিত। ইহার অভ্যন্তর দীর্ঘ সিলিয়া দ্বারা পরিবেষ্টিত। বহিঃপ্লাজমে সুস্পষ্ট ট্রাইকোসিষ্ট বিদ্যমান। দেহের **পশ্চাদভাগে** সঙ্কোচনশীল গহ্বর বাহিরে পৃষ্ঠছিদ্রের দ্বারা মুক্ত। সাইটোস্টোমের সম্মুখে ডানদিকে গোলাকার ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস এবং মাইক্রোনিউক্লিয়াস অবস্থিত। **কোলপোডা কিউকিউলাস** প্রজাতির ম্যাক্রো-

নিউক্লিয়াসে স্টেলেট এণ্ডোসোম **(Stellate endsome)** দেখা যায়। দ্বি-



চিত্র-66 কোলপোডা কিউকিউলাস ক) পূর্ণাঙ্গ দশা খ) সিস্ট দশা

বিভাজন পদ্ধতিতে জনন প্রক্রিয়া ঘটায়। উল্লেখযোগ্য, এনসিস্টেড কোল-পোডা বহুদিন পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং আবার ইহারা সক্রিয় হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চলন (Locomotion in Protozoa)

পরিবেশে জীবের কোন নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করিবার অর্থই চলন। বিভিন্ন কারনে যেমন, খাদ্যসংগ্রহ, আশ্রয় ও নিরাপত্তা, আত্মরক্ষা, প্রজনন, অনুভূতি এবং সুষ্ঠু পরিবেশ ইত্যাদির জন্য প্রানীর চলনের প্রয়োজন হয়। সক্রিয় ও নিস্ক্রিয় অবস্থায় প্রাণীর চলন ঘটে। রিফ্লেক্স গমন ছাড়াও আদ্য-প্রাণীরা স্বয়ংক্রিয় চলনে সক্ষমে। দেহ কোষের যে অংশ বা অঙ্গাংশগুলির সাহায্যে চলন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাকে **'চলন অঙ্গাংশ'** (**Locomotor Organelles**) বলে।

আদ্যপ্রাণীরা প্রধানতঃ তিন ভাবে চলন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। প্রতিটি চলন ক্রিয়াই অবশ্য চলন অঙ্গাংশ দ্বারাই সংঘটিত হয়। উল্লেখযোগ্য, আদ্যপ্রাণীর বিভিন্ন পর্বের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রকার চলন দেখা যায়।

বিভিন্ন প্রকার চলন—1. ক্ষনপদ বিস্তার (Amoeboid or creeping) দেহের যে কোন অংশে সৃষ্ট ক্ষনপদের সাহায্যে এই প্রকার চলন সম্ভব হয়। লোবসিয়া শ্রেণীভুক্ত এবং স্পোরোজোয়া শ্রেণীর (কিছু সংখ্যক) আদ্যপ্রাণীদের মধ্যে এই ধরনের চলন দেখা যায়। এই ধরনের চলনকে আবার অ্যামিবয়েড চলন ও বলা হয়।

2. **সাঁতার (Swimming)**—প্রাটোপ্লাজম গঠিত সূক্ষ্ম রোমের ন্যায় ফ্লাজেলা (ম্যাস্টিগোফোরা অধঃ পর্বের বৈশিষ্ট্য) অথবা অপেক্ষাকৃত ছোট সিলিয়ার সিলিওফোরা পর্বের বৈশিষ্ট্য) সাহায্যে এই ধরণের চলন সংঘটিত হয়। উল্লেখযোগ্য, সাক্টোরিয়া অধঃ শ্রেণীর প্রাণীদের শৈশবে সিলিয়া থাকে তবে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় ইহার পরিবর্তে কর্ষিকা স্থলাভিষিক্ত হয়।

3. **গড়াইয়া বা মাটির উপর দিয়া দেহটানিয়া চলা (Gliding)**—সাধারণতঃ স্পোরোজোয়া শ্রেণীভুক্ত আদ্যপ্রাণীদের কোনরকম চলন অঙ্গাংশ থাকে না। পেলিক্‌লে অবস্থিত মাইওনিমের (Myoneme) সঙ্কোচন ও

প্রসারণের দ্বার: এই শ্রেণীর অন্তর্গত কিছুকিছু প্রাণীর গ্লাইডিং বা আকার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

বিভিন্ন প্রকার চলন অঙ্গাংশের গঠন ও গমন—কোন বিশেষধরণের চলন অঙ্গাংশ বস্তুতঃ দেহকোষের বহিঃপ্লাজম হইতে উৎপন্ন হয় এবং **ইহারই রূপান্তরের ফলে গঠিত হয়।** আগ্তপ্রাণীদের এক বা একাধিক অঙ্গ, এক অথবা একাধিক জীবনচক্রে দেখা যায়, যেগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যোগসাধন করে। উল্লেখযোগ্য যে, চলন অঙ্গাংশগুলি চলন প্রক্রিয়া ছাড়াও খাদ্য সংগ্রহ করিতে সাহায্য করে।

1. (A) **সিউডোপোডিয়া অথব ক্ষণপদ (Pseudopodia)** ঃ অস্থায়ী অচল প্রকৃতির। বহিঃত্বকহীন অর্থাৎ নগ্ন আদ্যপাণীর (সারকোডিনা) প্রোটোপ্লাজম হইতে সৃষ্ট হয়। গতিপথের দিক পরিবর্তনের প্রয়োজনে পরিধির যে কোন স্থান হইতে ক্ষণপদ আবির্ভূত হইতে পারে। এগুলি প্রধানতঃ বহিঃপ্লাজম হইতে তৈয়ারী হয় যদিও অন্তঃপ্লাজম পরে প্রবাহিত হয়।

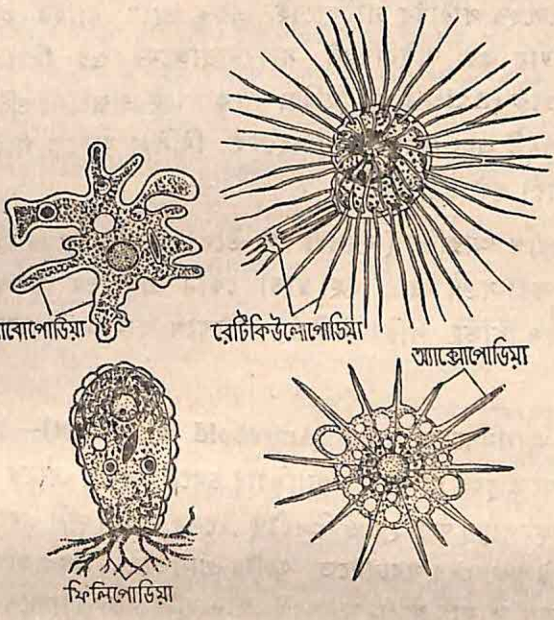
ম্যাস্টিগোফোরা অধঃপর্বের (অসংখ্য) এবং স্পোরোজোয়া (কিছু সংখ্যক্য শ্রেণীর অন্তর্গত) আকৃতি ও গঠন অনুযায়ী প্রধানতঃ চারি ধরনের ক্ষণপদ দেখা যায়। যেমন—

(i) লোবোপোডিয়া (Lobopodia) তুলনামূলক ভাবে চওড়া প্রকৃতির হয়। বিভিন্ন ধরনের—আঙুলের ন্যায় অথবা জিব্বার ন্যায় দেখিতে হয় এবং অনেক সময় শাখা প্রশাখা যুক্ত হয়। এগুলি সাধারনতঃ বহিঃপ্লাজম ও অন্তঃপ্লাজম লইয়া গঠিত হয় এবং যত তাড়াতাড়ি সৃষ্ট হয় ঠিক তেমনই অল্প সময়েই দেহের মধ্যে লুপ্ত হয়। এই ধরনের ক্ষণপদ অ্যামিবার বৈশিষ্ট হইলেও কিছু সংখ্যক ফ্লাজেলা যুক্ত এবং টেষ্টাসিয়ান (আরসেলা) দের মধ্যে দেখা যায়।

অ্যামিবা প্রোটিয়সের দেহের পরিধি হইতে অনেকগুলি সিউডোপোডিয়া নির্গত হয় কিন্তু অন্যান্যদের মধ্যে যেমন, **অ্যামিবা লাইম্যাক্স**-এ সমস্ত দেহটিই একটি মাত্র লোবো পোডিয়ামে পরিণত হয়।

(ii) ফিলোপোডিয়া (Filopodia)—এগুলি লম্বাকার সুতার ন্যায় অথবা সুক্ষ্ম সুতার ন্যায় হায়ালিনের অভিক্ষেপগুলির সূঁচালো মাথাযুক্ত। দেহ

হইতে বাহির হইয়া সমস্তদিকেই প্রসারিত হয়। অভিক্ষেপ গুলি সম্পূর্ণ-



চিত্র-66 অ্যামিবা, এলফিডিয়াম, ইউগ্লাইফা ও অ্যাকটিনোফিরিজের ক্ষণপদ

ভাবেই বহিঃপ্লাজম হইতে তৈয়ারী হয় এবং অনেক সময় শাখা প্রশাখা মিলিত হইয়া জালকাকৃতির সৃষ্টি করে। এই ধরনের অভিক্ষেপগুলি ইউগ্লাইফা এবং অসংখ্য টেস্টাসিয়ান দের মধ্যে সচরাচর দেখা যায়।

(iii) রেটিকিউলোপোডিয়া (**Reticulopodia**)—এইগুলি শাখা-প্রশাখা যুক্ত হইলেও ফিলোপোডিয়ার মত নয়। বেশ বড় আকৃতির জালক সৃষ্টি হয়, ফলে খাদ্য শিকারে সাহায্য করে। ফোরামিনিফেরিডা বর্গের অন্তর্গত এলফিডিয়াম, এলোগ্রোমিয়া, পলিষ্টোমেলা, ক্লামিডোফ্রিস প্রভৃতি এবং কিছু টেষ্টাসিয়ানদের মধ্যে এই ধরনের ক্ষনপদ দেখা যায়। এই ক্ষনপদ গুলি রাইজোপোডিয়া (**Rhizopodia**) অথবা মিক্সোপোডিয়া (**Myxopodia**) নামেও অভিহিত।

(iv) এক্সোপোডিয়া (**Axopodia**)—এই ধরনের ক্ষনপদগুলিকে

এক্টিনোপোডিয়াও (Actinopodia বলা হয়। এইগুলি শক্ত, কণ্টকাকৃতি এবং স্বচ্ছ। গমনের থেকেও খাদ্যশিকারে এই ক্ষনপদগুলি বেশী উপযোগী। গোলাকৃতি দেহের পরিধির চারিধারেই একক ভাবে বাহির হয়। একটি এক্সোপোডিয়াম এর বহিরাবরণী সাইটোপ্লাজমের স্তর দিয়া তৈয়ারী, এক্সিয়াল দণ্ডকে (Axial rod) ঘিরিয়া থাকে। এই এক্সিয়ালদণ্ডটি কতকগুলি ফাইব্রিলের সমষ্টি এবং দেহের মধ্যে সহজেই মিলিয়া যাইতে পারে আবার পুনরায় তৈয়ারী হইতে পারে।

বিভিন্ন মধ্যস্থ আকৃতির (ক্ষনপদ) জন্য উপোরক্ত চারিধরনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া কোন প্রজাতির ক্ষনপদ নির্দিষ্ট ধরনের হইলেও বিভিন্ন পরিবর্তনশীল পরিবেশে তাহার পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

1. (B)—অ্যামিবয়েড চলন (Amoeboid movement)—এই ধরনের চলন অ্যামিবাতে খুবই সুস্পষ্ট। অ্যামিবার চলনের সময়, দেহের গতিপথে একের বেশী ক্ষনপদের সৃষ্টি হয় ও বিপরীত দিকের ক্ষনপদগুলি দেহের মধ্যে লুপ্ত হয়। সৃষ্ট ক্ষনপদের সবচাইতে বড়টির প্রান্তভাগে একপ্রকার আঠাল রস নিঃসৃত হয়। তাহার ফলে, ক্ষনপদটি কোন কঠিণ বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে, তাহাতে আটকাইয়া যাইয়া সমগ্রদেহটিকে সেইদিকে ধাবিত করে। অবশ্য এই ধরনের চলন ভাসমান অবস্থায় থাকাকালীন সম্ভব হয় না।

অ্যামিবয়েড চলন, বস্তুত, অন্যতম প্রাচীন চলন পদ্ধতি। ইহা প্রধানতঃ দেহ সংকোচনের ফলে সৃষ্ট হয়। ক্ষনপদ বিস্তার, তথা বিক্ষেপের ফলে অগ্রগমন সম্ভব হয়। এই ধরনের চলন প্রাণীবিদের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাঁহারা এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

যেমন, (ক) **প্রোফ্লুয়েন্ট টাইপ (Profluent type)**—ফাঁপিয়া ওঠা এক্টোপ্লাজমের মধ্যে এণ্ডোপ্লাজম প্রবাহিত হয়।

(খ) **ইরাপ্‌টিভ টাইপ (Eruptive type)**—প্লাজমালেম্মা (বহিরাবরন) বিদির্ন হওয়ার ফলে এক্টোপ্লাজম ও এণ্ডোপ্লাজম বাহিরে প্রবাহিত হয়।

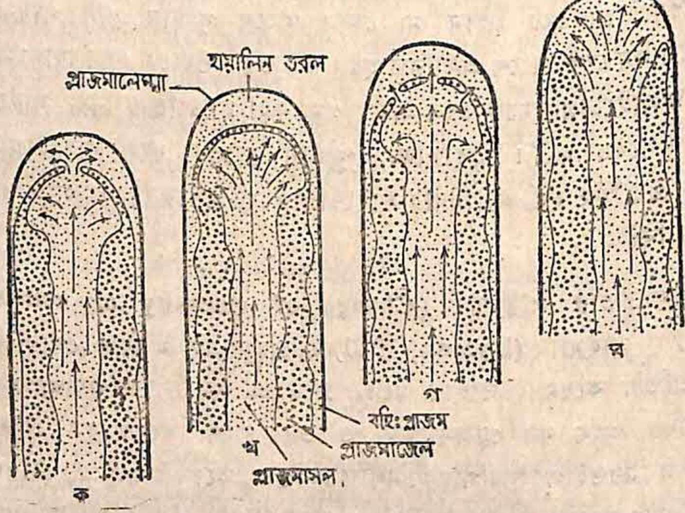
ক্ষণপদ-গঠনের শারীর বৃত্তীয় ব্যাখ্যা নিম্নলিখিত মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

1. পৃষ্ঠটান বা সারফেস টেনসন (Surface tension) ঃ এই তত্ত্ব অনুযায়ী ক্ষনপদ সৃষ্টি হয় পৃষ্ঠটানের পরিবর্তনের ফলে। ক্ষনপদ সৃষ্টির পূর্বে প্রোটোপ্লাজমের কোন না কোন অংশে পৃষ্টটান হ্রাস পায় এবং সাইটোপ্লাজম সেই অংশে **প্রসারিত** হয়। এই তত্ত্ব বর্ত্তমানে গ্রহণ যোগ্য নয়। এই তত্ত্বে সাইটোপ্লাজমকে তরল বলিয়া গন্য করা হইয়াছিল কিন্তু সাইটোপ্লাজম কলয়েড ধর্মী। ইহাছাড়া, পৃষ্টটান হ্রাসের ফলে সাইটোপ্লাজম যেদিকে প্রবাহিত হয়, অ্যামিবায় সাইটোপ্লাজমের গতির দিকের সঙ্গে তাহা সামঞ্জস্য বিহীন।

2. সান্দ্রতার পরিবর্ত্তন (Change of viscosity or colloidal theory) : হাইম্যান (**Hyman, 1917**)-ই প্রথম এই মতবাদ জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মতে, চলনরত অ্যামিবার অন্তঃপ্লাজমের-এর বাহির অংশ ঘন প্লাজমাজেল ও ভিতর অংশ অপেক্ষাকৃত পাতলা প্লাজমাসল নিয়তই পরস্পর পরিবর্তনশীল। বস্তুতঃ, কয়েকটি জল-অনু (**H_2O**) যুক্ত বা বিযুক্ত হওয়ার উপর **সল (Sol)** ও **জেল (Gel)** এর অবস্থা যথাক্রমে নির্ভরশীল। প্লাজমাজেলের কিছু অংশ প্লাজমাসলে পরিবর্তিত হয় ও ভিতরের স্তর তাহার মধ্যে প্রবাহিত হয়। এইভাবে, একটি নলের সৃষ্টি হয় এবং ইহার ধারে ধারে প্লাজমাসল প্লাসমাজেলে রূপান্তরিত হয় ও ক্ষণপদের সৃষ্টি হয় (67 নং চিত্র)। সংকোচনশীলতার ধর্ম অনুসারে প্লাজমালেম্মা কখনও কঠিন বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে, তাহাতে আটকাইয়া যায়। প্লাজমালেম্মা স্থিতিস্থাপক ও সান্দ্র। অপর প্রান্তে অর্থাৎ পশ্চাদভাগে প্লাজমাজেলে তরলীভবন ঘটে এবং সেইখানেই প্লাজমাজেলের সংকোচন ঘটে। এইভাবেই অ্যামিবয়েড চলন সম্ভব হয়। পরবর্ত্তীকালে প্যানটিন (**Pantin, 1923-26**) এবং মাস্ট (**Mast, 1925**) অ্যামিবয়েড চলন সম্বন্ধে আরও বিশদ বিবরন দেন। তাঁহারা গবেষনা করিয়া প্রমান করেন যে, প্রোটোপ্লাজমের সল (**Sol**) ও জেল অবস্থার আপেক্ষিক ও পারস্পরিক পরিবর্তনের ফলেই ক্ষণপদ এর সৃষ্টি হয় এবং হাইড্রোস্টাটিক প্রেসার, রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও উষ্ণতার দ্বারাই এই ধরনের চলন প্রভাবিত হয়। অ্যামিবয়েড চলনের গতি 0·2-.2 মাইক্রা/সেকেণ্ড বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

মাস্ট (**Mast**) এবং প্যানটিনের (**Pantin**) ব্যাখ্যাকে আরও নতূনতথ্যে ব্যক্ত করেন গোল্ডাক্রে এবং লর্চ (**Goldacre and Lorch, 1950**) এবং

অ্যালেন এবং রোসালানেস্কি (**Allen and Rosalansky, 1958**)। এই



চিত্র-67 অ্যামিবার ক্ষণপদ গঠনের পদ্ধতি

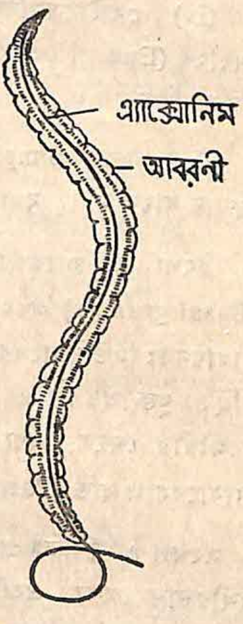
বৈজ্ঞানিকগন অ্যামিবার মধ্যে একটিনোমাইওসিন্ (**Actinomyocin**) এবং অন্যান্য **A.T.P**-র মত উত্তেজক প্রোটিন পদার্থ পান। তাঁহারা আরও প্রমান করেন যে, পশ্চাদভাগের প্রোটোপ্লাজমের সঙ্কোচন শুধুমাত্র অ্যামিবার চলনের জন্য দায়ী নহে, সল হইতে জেল এবং জেল হইতে সল-এ রূপান্তরও এই প্রক্রিয়ায় বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে।

2. (A) ফ্লাজেলা (Flagella)—অতি সূক্ষ্ম, দ্রুতসঞ্চালন-সক্ষম, সূত্রাকার, অঙ্গাংশ, **বহিঃপ্লাজমের গভীরতা হইতে উৎপন্ন হয়।** ইহা প্রোটোপ্লাজমের বিস্তারিত অংশ। সন্তরনে, খাদ্যমিশ্রিত জলস্রোত সৃষ্টি সংলগ্ন হওয়ার কাজে এবং পরিবেশের অনুভূতি বহ সুবেদী অঙ্গাংশরূপে ফ্লাজেলা কাজ করে।

সকল ম্যাস্টিগোফোরা (**Mastigophora**) ইহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চলনাঙ্গ। সারকোডিনা (**Sarcodina**) র ও স্পোরোজোয়া (**Sprozoa**) শ্রেণীভুক্ত কোন প্রাণীর জীবনের বিভিন্ন দশায় ফ্লাজেলা দেখা যায়।

গঠন ঃ সাধারনভাবে একটি নলাকার প্রোটোপ্লাজমীয় অংশই ফ্লাজে-

লাম। সমগ্র ফ্লাজেলামে অ্যাক্সোনিমি (Axoneme) নামক একটি কঠিন দণ্ডকে ঘিরিয়া থাকে একটি সুক্ষ্ম ও সংকোচনশীল (প্রোটোপ্লাজমীয়) রক্ষাকরক আবরন। অ্যাক্সোনিমি সোজা হইতে পারে অথবা পেঁচানোও থাকিতে পারে। সবসময় ইহারা 11 টি অনুদৈর্ঘ্য ফাইব্রিল দিয়া গঠিত। এই 11 টি অনুদৈর্ঘ্য ফাইব্রিলের মধ্যে 2 টি কেন্দ্রে এবং বাকী 9 টি পরিধির দিকে সমান দূরত্বে থাকে। ফ্লাজেলাম আবরণীতে কোন কোন প্রাণীর অতি সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্তু থাকে। এই তন্তুগুলিকে 'ফ্লিমার' (Flimmer বলে)। ফ্লিমারের সংখ্যা ও সারিবিন্যাস অনুযায়ী নিম্নবর্নিত বিভিন্ন শ্রেণীতে ফ্লাজেলাকে ভাগ করা হইয়াছে।



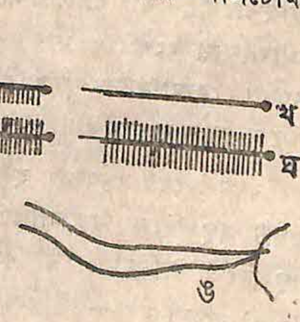
চিত্র-68 ফ্লাজেলার গঠন

(i) **স্টিকোনিমাটিক (Stichonematic) ঃ** আবরণীর একদিকে সারিবদ্ধভাবে ফ্লিমার সজ্জিত থাকে। যথা—ইউগ্লিনা (**Euglena**)

(ii) **প্যাণ্টোনিমাটিক (Pantonematic) ঃ** দুই বা ততোধিক সারিতে ফ্লিমার থাকে। যথা—পেরানেমা (**Peranema**)

(iii) **অ্যাক্রোনিমাটিক (Achronematic) ঃ** ইহা আবার 'হুইপ ফ্লাজেলাম' (**Whip flagellum**) নামেও পরিচিত। অ্যাক্সোনিমির মুক্ত দূরবর্তী অংশ (**endpiece**) আবরণীর বাহিরে থাকে। যথা—পলিটোমা (**Polytoma**).

চিত্র-69 বিভিন্ন ফ্লাজেলা
ক) স্টিকোনিমাটিক
খ) অ্যাক্রোনিমাটিক
গ) প্যাণ্টোনিমাটিক
ঘ) পেণ্টাক্রোনিমাটিক
ঙ) সরল



(iv) পেণ্টাক্রোনিমাটিক (Pentachronematic) : অ্যাক্সোনিমির শেষাংশ (End piece) থাকেই এবং তাহাছাড়া এক বা একাধিক সারিতে ফ্লিমার বিদ্যমান।

(iv) সরল (Simple) : অ্যাক্সোনিমির শেষাংশ (End piece) বা ফ্লিমার থাকে না। যথা—ক্রিপ্টোমোনাডিডা (Cry ptomonadida)

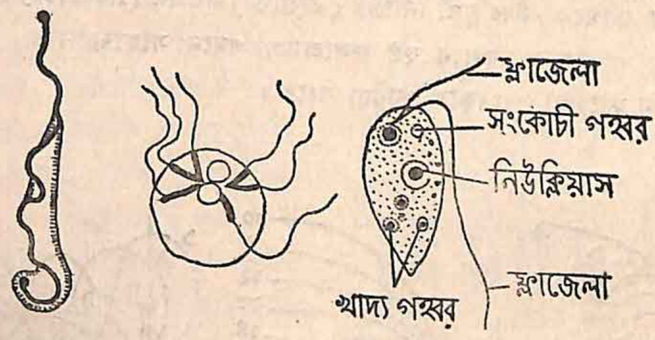
উৎপত্তি : ফ্লাজেলামের অ্যাক্সোনিমির উৎপত্তি ঘটে বেসাল দানা (Basal granule) অথবা ব্লেফারোপ্লাস্ট (Blepharoplast) হইতে, যাহা সাধারণতঃ নিউক্লিয়াসের সহিত মূলতন্ত রাইজোপ্লাস্ট (Rhizoplast) এর সহিত যুক্ত হয়। এই রাইজোপ্লাস্ট আবার কখনও কখনও (বিশেষতঃ পরজীবীর ক্ষেত্রে, যথা ট্রাইপানোসোমা, জিয়ার্ডিয়া, ট্রাইকোমোনাস) প্যারাবেসাল বডি (Parabasal body)-র সহিতও যুক্ত থাকে।

সংখ্যা : বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ফ্লাজেলার সংখ্যায় বৈষম্য বিদ্যমান। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে একটি বা দুইটি ফ্লাজেলা দেখা যায়। স্বাধীনজীবী ম্যাস্টিগোফোরা অধঃপর্ব অন্তর্গত প্রাণীদের চারিটির বেশী ফ্লাজেলা খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু পরজীবীদের ক্ষেত্রে (যথা, জিয়াডিয়া, ট্রাইকোনিমফা ট্রাইকোমোনাস) বেশী সংখ্যক ফ্লাজেলা দেখা যায়।

অনেক সময় দেখা যায় যে একটিমাত্র প্রধান বড় ফ্লাজেলামের সহিত অনেক ছোট ছোট ফ্লাজেলা থাকে। এই ফ্লাজেলাগুলিকে অতিরিক্ত বা সহযোগী (accessory) ফ্লাজেলা বলে। **ট্রাইপানোসোমাতে** ফ্লাজেলামটি দেহের সহিত সমান্তরাল ভাবে দেহের **ধার দিয়া** ঢেউখেলানো পর্দা (undulating membrane) বরাবর যাইয়া দেহের বাহিরে মুক্ত হয়। **ট্রাইপানোসোমা** রোডেন্সিনেনসিতে ফ্লাজেলামের মুক্তপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার অংশ দেখা যায়। ইহাকে প্রান্তিক উদ্গম (Terminal knob) বলে। **হেক্সামিটাস পুলশার (Hexamitus pulchar)**—এ সম্মুখস্থ ফ্লাজেলার নিচের অংশ দণ্ডাকৃতি।

যখন দেহের সম্মুখভাগ হইতে দুইটি ফ্লাজেলা বাহির হয়, তখন সাধারণতঃ একটি সম্মুখদিকে আন্দোলিত হইয়া নৌকার "গুন" টানার মত দেহটিকে সম্মুখদিকে টানিয়া লইয়া যায়। ইহাকে আকর্ষক বা ট্রাকটেলাম (Tractellum) বলে (যথা—ইউগ্লিনা)। অপরটি স্বাধীনভাবে পিছনদিকে প্রসারিত

থাকে এবং ইহার সঞ্চালনের ফলে চলনস্রোতের সৃষ্টি হয়। ফ্লাজেলাম যখন



চিত্র-70 ক) ট্রাইপেনোসোমা রোডেসিএনস
খ) হেক্সামিটাস পুলশার গ) বোডো সালটানস্

দেহের পশ্চাদ্প্রান্তে যুক্ত থাকে তখন তাহাকে পাল্সেলাম **(Pulsellum)** বলে (যথা—বোডো)। ইহা পিছন হইতে দেহকে সম্মুখদিকে টানিয়া লইয়া যায়।

2. (B) ফ্লাজেলার সাহায্যে চলন (Flagellar movement) ঃ

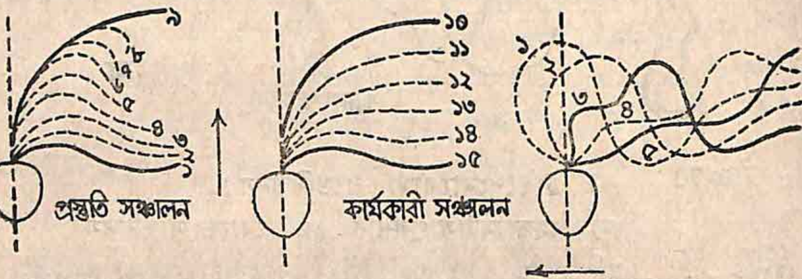
জীবন্ত কোন প্রাণীতে ফ্লাজেলার ক্রিয়শীলতা পর্যবেক্ষণ করা ভীষণ দুরূহ। তাহার কারণ ফ্লাজেলার সঞ্চালন খুব ক্ষিপ্র। ফ্লাজেলার সক্রিয়তা কোন বিশেষ প্রকারে ঘটিয়া থাকে তাহা সুস্পষ্টভাবে বলা কঠিন। তবে-এ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে তিনটি তত্ত্বের উল্লেখ করা হইয়া থাকে, যথা—

(i) বুশ্‌লি (Butcbli)-র স্ক্রুরতত্ত্ব (Screw theory)—এই মতে প্রাণীর সামনের দিকে অগ্রসর সম্ভব তখনই যখন ফ্লাজেলাম স্ক্রুর ন্যায় সর্পিল গতিতে জলের মধ্যে পাক খাইয়া জলে স্পন্দনের সৃষ্টি করে।

(ii) মেশ্‌নার (Metzner)-এর তত্ত্ব (theory)—ফ্লাজেলাম জলে একটি বৃত্ত মধ্যে সঞ্চালিত হওয়ার ফলে একটি শঙ্কুর সৃষ্টি করে। তাহার ফলে প্রাণীটিকে জল ঠেলিয়া লইয়া যায়।

(iii) আল্‌হেলা (Ulhela) ও ক্রিশ্‌ম্যান (Krijsman) —এই তত্ত্ব অনুযায়ী ফ্লাজেলামের সঞ্চালন সাধারণভাবে পার্শ্বীয়। অর্থাৎ এক পার্শ্ব হইতে শুরু হইয়া অপর প্রান্ত পর্যন্ত আন্দোলিত হয়। এই সঞ্চলনের প্রথম

ভাগকে **নিম্নমুখী সক্রিয় (কার্যকরী) সঞ্চলন (Effective stroke)** এবং দ্বিতীয় ভাগকে **ঊর্ধ্বমুখী নিষ্ক্রিয় (প্রস্তুতি) সঞ্চলন (Recovery stroke)** বলে। প্রথমোক্ত সঞ্চলনে সৃষ্ট জলস্রোত, গমনে সাহায্য করে। দ্বিতীয় সঞ্চলনে ফ্লাজেলা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে।



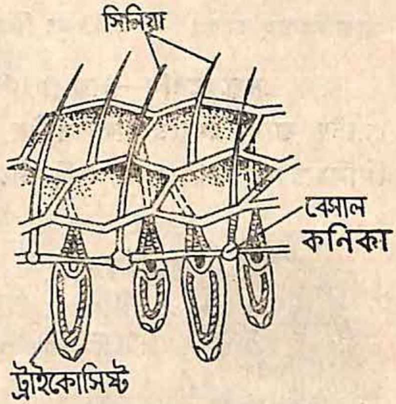
চিত্র নং **71** ফ্লাজেলার সঞ্চলনের পর্যায়ক্রম

ফ্লাজেলার সাহায্যে চলনের গতি লক্ষ্য লরা হইয়াছে। প্রতি সেকেণ্ডে 15 to 300 মাইক্রা পর্যন্ত হয়। ফ্লাজেলার সাহায্যে চলনের সঠিক প্রক্রিয়া এখনও ভালভাবে স্পষ্ট নয়।

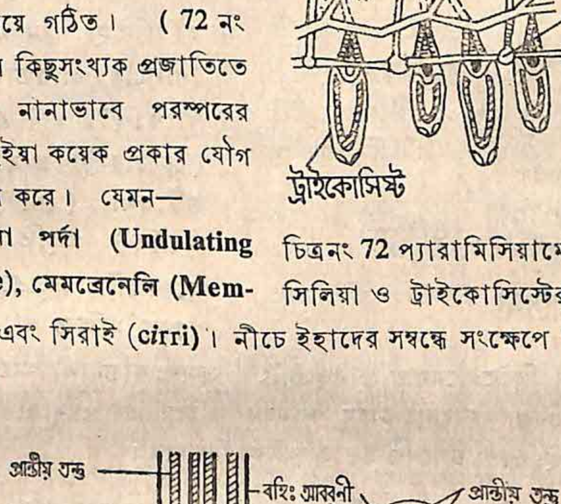
3 (A) সিলিয়া (Cilia) সিলিওফোরা পর্বের অন্তর্গত এবং সাক্টোরিয়া **(Suctoria)** শ্রেণীর অন্তর্গত (লার্ভা) আত্মপ্রাণীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য সিলিয়া—প্রোটোপ্লাজম গঠিত স্থায়ী অঙ্গাংশ। ফ্লাজেলার তুলনায় সিলিয়া আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। অতি সুক্ষ্ম রোমের ন্যায়, ইহারা সংখ্যায়ও ফ্লাজেলার তুলনায় অনেক বেশী থাকে।

উৎপত্তি ও গঠন ঃ ফ্লাজেলামের মতই সিলিয়ামেরও বহিঃপ্লাজমে অবস্থিত বেসাল বডি হইতে উৎপত্তি ঘটে এবং পেলিকল ভেদ করিয়া দেহের উপরিভাগে আসে। অ্যাক্সোনিমি নামে একটি প্রোটোপ্লাজমীয় অক্ষীয় দণ্ডকে ঘিরিয়া প্রোটোপ্লাজম থাকে। সমগ্র এলাকার অংশটি আবার সুক্ষ্ম প্রোটো-

প্লাজমীয় আবরণ-বদ্ধ থাকে। ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সহায়তায় দেখা গিয়াছে যে, অ্যাক্সোনিমি বস্তুতঃ অনেকগুলি প্রোটোপ্লাজমীয় তন্তু (9 জোড়া পরিধিতে এবং 2 জোড়া কেন্দ্রে)-সমন্বয়ে গঠিত। (72 নং চিত্র)। বেশ কিছুসংখ্যক প্রজাতিতে সিলিয়াগুলি নানাভাবে পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া কয়েক প্রকার যৌগ অঙ্গাংশ গঠন করে। যেমন—ঢেউখেলানো পর্দা (**Undulating membrane**), মেমব্রেনেলি (**Membranelle**) এবং সিরাই (**cirri**)। নীচে ইহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।



চিত্র নং 72 প্যারামিসিয়ামের বহিস্ত্বকে সিলিয়া ও ট্রাইকোসিস্টের অবস্থান

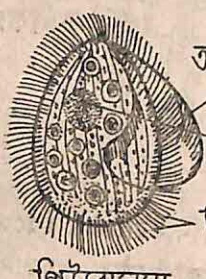


চিত্র নং 73 ফ্লাজেলার আভ্যন্তরীণ গঠন

a) ঢেউখেলানো পর্দা—সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ পর্দার ন্যায় দেখিতে। এক হইতে বহু সিলিয়া সারিবদ্ধভাবে পাশাপাশি যুক্ত হইয়া ইহা গঠন করে। স্কুটিকোসিলিয়াটিডা বর্গের অন্তর্গত প্রাণীর খাদ্যনালীপথে ইহাদের দেখা যায়। ইহাদের ঢেউখেলানো ছন্দোময় আন্দোলন খাদ্যবহ জলস্রোতকে খাদ্যনালী পথে সঠিকভাবে চালনা করে। কিছু সংখ্যক সিলিয়াটায় [প্লিউরোনেমা

(Pleuronema), সাইক্লিডিয়াম (cyclidium)] এই পর্দা প্রসারিত হইয়া খাদ্য সংগ্রহ করে। (73 নং চিত্র)

b) মেম্ব্রেনেলি—দাঁড় (paddle)-এর মত (অনেকটা ত্রিকোনাকৃতি) প্লেটের ন্যায় মেমব্রেনেলি সর্পিল সারিতে মুখছিদ্র অঞ্চলেই অবস্থিত। সিলিয়ার সারিগুলি আড়াআড়ি ভাবে অবস্থান করিবার ফলেই পরস্পর যুক্ত হইয়া ইহা গঠন করে। অবশ্য সিলিয়ার প্রান্তভাগগুলি মুক্ত থাকে। (75 নং চিত্র)। স্টেনটর (হেটেরোট্রিকিডা বর্গের অন্তর্গত) ভর্টিসেলা (পেরিট্রিকিডা বর্গের অন্তর্গত) প্রভৃতি আদ্যপ্রাণীর অনেকগুলি মেম্ব্রেনেলি মুখছিদ্র অঞ্চলে সজ্জিত থাকে। এগুলি ক্রমশঃ খাদ্যনালী অংশে প্রসারিত হয়। খাদ্যবস্তু সাইটোস্টোমে আনয়ন করিতে এই মেম্ব্রেনেলি সাহায্য করে। ইহা ছাড়া চলনেও ইহার ভূমিকা বিদ্যমান।



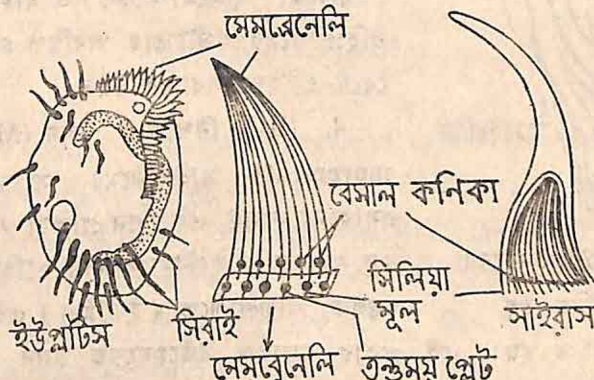
চিত্র নং-74 প্লিউরোনেমার আনডুলেটিং

(c) সিরাই—দেহের অঙ্কীয় ভাগে ইহারা অবস্থান করে। যে সকল সিলিয়েট হামাগুড়ি দিয়া চলাফেরা করে [স্টাইলোনিকিয়া (Stylonichia), ইউপ্লটিস (Euplotes) ইত্যাদি] তাহাদের মধ্যে ইহা দেখা যায় (68 নং চিত্র)। একগুচ্ছ সিলিয়ার অঙ্গে অঙ্গে মিলনের ফলে সাইরাস (Cirrus) গঠিত হয়।

সাইরাস একটি বৃহদাকার অপেক্ষাকৃত শক্ত ধরনের বস্তু। কোন কোন সময়ে সাইরাস এর দূরবর্তী অংশ দুই বা ততোধিক শাখায় বিভক্ত হইতে পারে। দেহে অবস্থান অনুযায়ী সিরাই বিভিন্ন প্রকারের (প্রান্তিক, অঙ্কীয়, পায়ুদেশীয়, পার্শ্বীয় প্রভৃতি) এবং ইহারা সবদিকেই নড়াচড়া করিতে পারে। হামাগুড়ি দিয়া চলন ব্যতীত অনুভূতিজ্ঞাপক অঙ্গাংশ হিসাবেও সিরাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

3. (B) সিলিয়ার সাহায্যে চলন (Ciliary movement) : সিলিয়াগুলির ক্রিয়াশীলতা নিয়ন্ত্রিত হয় অতিজটিল এক নিউরোমোটর (Neuro-

motor) তন্তুদ্বারা। ইহা এক কেন্দ্রবস্তু মোটোরিয়াম (Motorium) ও



চিত্র নং-75 ইউপ্লটিসের মেম্‌ব্রেনেলি ও সিরাই-এর গঠন

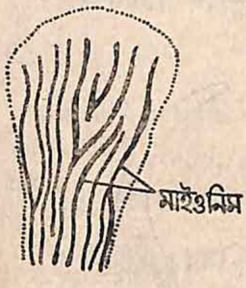
বেসালবডি সমূহের সহিত যুক্ত তন্তুসমহে লইয়া গঠিত। চলনের সময়ে সিলিয়া দাঁড়ের ন্যায় প্রথমে জল ঠেলিয়া পিছনে ফেলে ইহাকে **সক্রিয় সঞ্চলন (Effective stroke)** এবং পরবর্ত্তীকালে ধীরে ধীরে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে—ইহাকে **নিষ্ক্রিয় সঞ্চলন (Recovery Stroke)** বলে। বস্তুতঃ সমগ্র ঢেউ দেহের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হয়।

চিত্র-76 সিলিয়ার সক্রিয় সঞ্চালন



এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ পরিধির তন্তুর সঙ্কোচনের ফলে ইহা সম্ভব হয়। যাহাহউক, আদ্যপ্রাণীর মধ্যে সিলিওফোরা পর্বের দলভুক্ত প্রাণীরাই ক্ষিপ্রতম গতিবেগের অধিকারী। ইহারা প্রতিসেকেণ্ডে 400μ হইতে $2,000\mu$ পর্যন্ত পথ সিলিয়ার সাহায্যে অতিক্রম করিতে পারে।

4. (A) **মাইওনিমি (Myoneme)** ঃ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সঙ্কোচনশীল এই তন্তু সদৃশ বস্তুগুলি বিভিন্ন দিকে ছড়ান পেলিকূল বা বহিঃপ্লাজমে দেখা যায়। প্রধানতঃ এগুলি দৈহিক পরিবর্ত্তন আনিতে সাহায্য করে। মাইওনিম বিভিন্ন আকারে আদ্যপ্রাণীতে বিদ্যমান। কতকগুলি সিলিয়া যুক্ত



চিত্র নং-77স্টেনটরের সাইওনিম তন্তু

প্রাণী (স্টেনটর-**Stentor**) এবং বৃহদাকার গ্রেগারিনা (মনোসিস্টিস)-এ মাইওনিমগুলি বহিঃপ্লাজমের গভীরতায় অবস্থিত এবং সিলিয়েটে-এ ইহারা সর্বাধিক উন্নত।

4. (B) বিপাকীয় চলন (Metabolic movement) মাইওনিমের সংকোচন ও প্রসারনের ফলেই এই চলন প্রক্রিয়া সম্ভব হয়। কিছু সংখ্যক ফাইটোম্যাসটিগোফোরিয়া শ্রেণীর অন্তর্গত আদ্যপ্রাণীতে (ইউগ্লিনা) এই ধরণের চলন সংঘটিত হয়। এই প্রকার চলনকে **ইউগ্লেনয়েড চলন (Euglenoid movement)** বলে। অনুরূপভাবে গ্রেগারিনিডাদের চলনকে **গ্রেগারাইন চলন (Gregarine movement)** বলে। যদি ও মাইওনিমের ক্রিয়ার ফলেই এই চলন প্রক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয় তথাপি ইহার সম্বন্ধে এখনও অনেক কিছুই ভালভাবে জানা যায় নাই।

সপ্তম অধ্যায়

পুষ্টি (Nutrition)

জীবের খাদ্যগ্রহণ, খাদ্যপরিপাক, দেহমধ্যে শোষণ ও অপাচ্য অংশের বহিঃষ্করণকে সামগ্রিকভাবে **পুষ্টি** বা Nutrition বলে। আদ্যপ্রাণী বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন পরিবেশে পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে, যথা—হোলোজয়িক, হোলোফাইটিক ও স্যাপোজয়িক পুষ্টি। যখন একটি আদ্যপ্রাণীতে একাধিক পুষ্টি দেখা যায়, তাহাকে **মিক্সোট্রপিক পুষ্টি** বলে। নীচে আদ্যপ্রাণীর বিভিন্ন পুষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

(A) হোলোজয়িক পুষ্টি : (Holozoic nutrition): [Gr ; holos, whole ; zoon, animal.]

বেশীরভাগ আদ্যপ্রাণী হোলোজয়িক প্রথায় পুষ্টি সাধন করে। এই প্রথায় আদ্যপ্রাণীরা প্রধানতঃ কঠিন খাদ্যদ্রব্য, আনুবীক্ষণিক জীব, ডায়াটম, রটিফার, সন্ধিপদ প্রাণীর শূককীটকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। আদ্যপ্রাণী তৃণভোজী, মাংসাশী, সর্বভুক হইতে পারে।

হোলোজয়িক পুষ্টিকে প্রধানতঃ চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যেমন—খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, খাদ্যশোষণ ও বহিঃষ্করণ।

সারকোডিনা শ্রেণীর প্রাণীর খাদ্যসংগ্রহ :

(i) খাদ্যসংগ্রহ (ingestion) : সাধারণতঃ পাঁচধরণের খাদ্য গ্রহণ হোলোজয়িক পুষ্টিতে দেখা যায়। অ্যামিবাতে নিম্নলিখিত খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি দেখা যায়।

(1) সারকামভ্যালেশান : এই পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহণের পূর্বে অ্যামিবা প্রোটিয়াস কিছুদূরে অবস্থিত খাদ্যের নড়াচড়ায় অথবা খাদ্যের দেহ-নিঃসৃত কোনও পদার্থের সংস্পর্শে উদ্দিপীত হইয়া খাদ্য গ্রহণে তৎপর হয় এবং খাদ্যের দিকে ক্ষণপদ প্রসারিত করে। ফলে, সাইটোপ্লাজমের একটি অংশ ছোট বাটির আকারে খাদ্যের দিকে অগ্রসর হয়, ইহাকে খাদ্য গহবর বলে। ক্রমে খাদ্যকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ক্ষণপদের মুক্তপ্রান্তগুলি জুড়িয়া

যায় এবং জলসহ খাদ্যবস্তু দেহের মধ্যে গৃহীত হয়। এই জলবেষ্টিত অন্তঃপ্লাজমে **খাদ্যগহ্বর সৃষ্টি হয়।** খাদ্যের সঙ্গে গৃহীত জলের পরিমাণ খাদ্যবস্তুর সক্রিয়তা এবং আয়তনের উপর নির্ভরশীল হয়। খাদ্যবস্তু বেশী নড়াচড়া করিতে থাকিলে বা খাদ্যবস্তুর আয়তন বড় হইলে উহার সঙ্গে জলও বেশী পরিমাণে গৃহীত হয়।

(2) **সারকামফ্লুয়েন্স ঃ** নিশ্চল বা নিষ্ক্রিয় খাদ্য দেহসংলগ্ন হওয়ামাত্র অ্যামিবার প্রোটোপ্লাজম তাহার উপর দিয়া গড়াইয়া যাইয়া খাদ্যকে গ্রহণ করে। এইভাবে চারদিক হইতে পর্যায়ক্রমে ক্ষণপদ সৃষ্টি করিয়া খাদ্যকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরিয়া ফেলিয়া খাদ্যগহ্বরের সৃষ্টি করে।

(3) **ইনভ্যাজিনেশান ঃ** এই উপায়ে খাদ্যগ্রহণের সময় অ্যামিবা কোনও খাদ্যের সংস্পর্শে আসিলে, উহার সংগে নিজের দেহ আটকাইয়া রাখে। আগের মতো একটি খাদ্য গহ্বর সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহণের সময় ক্ষণপদ সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না।

(4) **ইমপোর্ট ঃ** কোনক্রমে খাদ্য দেহের উপর আসিয়া পড়িলে, অ্যামিবা অল্প চেষ্টায় অর্থাৎ প্রায় নিশ্চল থাকিয়া খাদ্যকে দেহের মধ্যে গ্রহণ করে। এই পদ্ধতিকে **ইমপোর্ট** বলে। এই পদ্ধতিতে ক্ষণপদের প্রয়োজন হয় না। হেলিওজোয়া ও রেডিওলেরিয়ান আদ্যপ্রাণী অ্যাক্সোপোডিয়ার দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করে। ফোরামিনিফেরা জালকের দ্বারা খাদ্যসংগ্রহ করে।

(5) **পিনোসাইটোসিস ঃ প্লাজমা পর্দা দ্বারা এই পদ্ধতিতে তরল খাদ্য গ্রহণ করে।** কয়েকটি ফ্লাজেলা ও সিলিয়া যুক্ত প্রাণীদের এই ধরণের খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি দেখা যায়। 1934 সালে **'Mast'** এবং **'Doyle'** প্রথম অ্যামিবা প্রোটিয়াসে এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিতে অ্যামিবা বেশী আণবিক ওজন বিশিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করে। এই পদ্ধতিতে একটি পিনো-সাইটিক নালী গঠন করে এবং অন্তঃপ্লাজমে একটি পিনোসাইটিক গহ্বরের সৃষ্টি করে।

ম্যাসটিগোফোরা শ্রেণীর খাদ্যসংগ্রহ ঃ ফ্লাজেলাযুক্ত আদ্যপ্রাণীরা ফ্লাজে-লার সাহায্যে খাদ্যসংগ্রহ করে। ফ্লাজেলা জলে নড়াচড়া করিয়া একটি স্রোতের সৃষ্টি করে, এই জলস্রোত খাদ্যআহরণে সাহায্য করে। সাধারণ ফ্লাজেলাযুক্ত মোনাস (**Monas**) ফ্লাজেলা দ্বারা সরাসরি খাদ্যসংগ্রহ করে।

আবার ইউগ্লিনাতে একটি ছোট মুখছিদ্র বা সাইটোজোম থাকে। এই সাইটোজোম অন্তঃপ্লাজমে অবস্থিত সাইটোফ্যারিংক্সে মুক্ত হয়। পেরানিমার ফ্যারিংক্সের প্রাচীর গাত্রে অবস্থিত শক্ত দণ্ড ট্রাইকাইটিস (trichites) খাদ্য-সংগ্রহে সাহায্য করে।

সিলিয়াযুক্ত প্রাণীর খাদ্যসংগ্রহ ঃ কোলেপস (coleps) এবং ডাইডিনিয়াম (Didinium) ইত্যাদি প্রাণীর দেহকোষের সম্মুখে অবস্থিত একটি বড় ছিদ্র খাদ্য সংগ্রহে সাহায্য করে। কাইলোডোন, পোরোডন ট্রাইকাইটিসের সাহায্যে খাদ্য সংগ্রহ করে। কোলপোডার (Colpoda) মুখছিদ্র অস্থায়ী ভাবে দেহের বিভিন্ন অংশে সৃষ্টি হয়, ইহাদের নির্দিষ্ট কোন সাইটোফ্যাংরিক্স থাকে না। প্যারামিসিয়ামের সাইটোফ্যারিংক্স বা গালেটের তলদেশে খাদ্যবস্তুগুলি আসিয়া জমা হয়। ইহার গালেটের মধ্যকার স্পন্দনের ফলে খাদ্যবস্তু বলের মতো আকার ধারণ করে। অবশেষে এই খাদ্যবস্তু কিছুটা জল সংগ্রহ করিয়া সাইটোজোমের অন্তঃপ্লাজমে প্রবেশ করে এবং খাদ্যগহ্বর সৃষ্টি হইতে এক হইতে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত সময় লাগে। খাদ্যসরবরাহ এবং খাদ্যগ্রহণের উপর খাদ্যগহ্বর সৃষ্টি নির্ভর করে।

খাদ্যগহ্বর অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পথে সংবহিত হয়। সুনির্দিষ্ট পথে সংবহনকে **সাইক্লোসিস** বলে। এই খাদ্যসংবহনের সময় খাদ্যগহ্বর প্রথমে পিছনের দিকে অগ্রসর হয় এবং পরে ঘুরিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হয়। অগ্রপ্রান্তে পৌছাইবার পর উহা আবার ঘুরিয়া পশ্চাদদিকে অগ্রসর হয় এবং দেহকোষের মাঝামাঝি আসিয়া পৌছায়। ইহার পর সংবহন সম্পূর্ণ হয়। খাদ্যগহ্বরের বর্ণ ক্রমশঃ সবুজ হইতে হলুদ হয়।

খাদ্যগহ্বর গঠন পদ্ধতি ঃ আদ্যপ্রাণীতে খাদ্যগহ্বর থাকে না। খাদ্যকে ঘিরিয়া পাতলা সাইটোপ্লাজম দ্বারা বেষ্টিত খাদ্যগহ্বর তৈয়ারী হয় এবং অন্তঃপ্লাজমে প্রবেশ করে। অ্যামিবার দেহে সাইটোপ্লাজমের চলনের ফলে খাদ্যগহ্বর দেহকোষে স্থান পরিবর্তন করে। সিলিয়েটা শ্রেণীর আদ্যপ্রাণীর একটি নির্দিষ্ট পথে খাদ্যগহ্বরের চলন দেখা যায়। প্যারামিসিয়ামের অন্তঃপ্লাজমে একটি নির্দিষ্ট পথে খাদ্যগহ্বর চলাচল করে। ভর্টিসেলাতে খাদ্যগহ্বর নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে না। অনেকের মতে সিলিয়াযুক্ত কিছুপ্রাণীর সাইটো-

জোম হইতে সাইটোপাইজ পর্যন্ত একটি খাদ্যনালী থাকে, যে পথে খাদ্যগহ্বর যাতায়াত করে।

(ii) **পরিপাক (digestion)** : আদ্যপ্রাণীতে অন্তঃকোষীয় পরিপাক দেখা যায়। খাদ্য সরাসরি অন্তঃপ্লাজমে প্রবেশ করে বা খাদ্যগহ্বরের মধ্যে থাকা পার্শ্বস্থ সাইটোপ্লাজম হইতে জারকরস খাদ্যগহ্বরে প্রবেশ করে। যেমন অ্যামিবার ক্ষেত্রে সাইটোপ্লাজম হইতে এনজাইমসমৃদ্ধ লাইসোসোম খাদ্যের সহিত মিশিয়া খাদ্যকে পরিপাক করে। পরিপাকের প্রথম পর্যায়ে খাদ্যগহ্বর গুলিতে অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়, ফলে জীবিত খাদ্যবস্তুর মৃত্যু ঘটে। পরে খাদ্যের পরিপাক শুরু হইলে খাদ্যগহ্বরের ক্ষারকত্ব বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন আদ্যপ্রাণী বিভিন্নরকম খাদ্য গ্রহণ করে, ফলে পরিপাক পদ্ধতি আলাদা ধরণের হয়। সাধারণতঃ প্রোটিন হজমকারী পেপসিন ও শর্করা হজমকারী রস অ্যামাইলেজ থাকে। **'Dawsoy'** এবং **'Belkin'** এর মতে কতিপয় আদ্যপ্রাণী চর্বি জাতীয় ও সেলুলোজ হজম করিতে পারে। অনেক সিলিয়াযুক্ত আদ্যপ্রাণী মিথোজীবি হিসাবে ঘোড়া, গরুর অন্ত্রে বাস করে। এই মিথোজীবি জীব ঐসকল প্রাণীর অন্ত্রে সেলুলোজ হজমে সাহায্য করে।

(iii) **শোষণ (assimilation)** : সরল পাচিত খাদ্যকে পারিপার্শ্বিক সাইটোপ্লাজম ব্যাপনক্রিয়ার মাধ্যমে শোষণ করে। উন্নত প্রাণীর মতো এখানে নির্দিষ্ট সংবহনতন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, খাদ্যগহ্বরগুলি অন্তঃপ্লাজমের মধ্যে চক্রাকার আবর্তনের মাধ্যমে সর্বদাই সারাদেহে ঘোরাফেরা করে ও পুষ্টি যোগায়। খাদ্যদ্রব্য অন্তঃপ্লাজম দ্বারা শোষিত হয় এবং খাদ্যগহ্বর ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়।

(iv) **অপাচ্য অংশের বহিঃক্ষরণ** : খাদ্যদ্রব্য পাচিত হইবার পর অপাচ্য খাদ্যদ্রব্য দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। অ্যামিবার দেহের পশ্চাদঅংশ হইতে বর্জ্যদ্রব্য নিষ্কাশিত হয়। ফ্লাজেলা ও সিলিয়াযুক্ত আদ্যপ্রাণীর একটি নির্দিষ্ট ছিদ্র **সাইটোপাইজ (Cytopyge)** থাকে। এই ছিদ্র পথেঅপাচ্য অংশ বাহির হয়। এইছিদ্র সাধারণতঃ কোষের পিছনের দিকে থাকে। প্যারামিসিয়ামের দেহের পশ্চাদভাগে অস্থায়ী সাইটোপাইজ সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোন কোন প্রাণীর নির্দিষ্ট সাইটোপাইজ থাকে, যেমন ব্যালানটিডিয়াম,

নিকটোথেরাস ইত্যাদি।

(B) হোলোফাইটিক পুষ্টি (**Holophytic nutrition**) [**Gr, holos; whole, phyton**]

গাছ যে পদ্ধতিতে খাদ্য তৈয়ারী করে, তাহাকে হোলোফাইটিক পুষ্টি বলে। এই প্রকার পুষ্টি প্রধানতঃ ক্লোরোফিলযুক্ত দেখা যায়। ইহারা সূর্যালোক, ক্লোরো-



চিত্র-78 ব্যালানটিডিয়াম কোলাই এর বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাশন

ফিল, ও কার্বনডাই-অক্সাইডের উপস্থিতিতে শর্করা খাদ্য তৈরী করে। এইসময় উপজাত গ্যাস হিসাবে অক্সিজেন নির্গত হয়। শর্করা খাদ্য অ্যামাইলাম ও প্যারামাইলাম হিসাবে দেহকোষে সঞ্চিত থাকে। কিছু কিছু প্রজাতির দেহে রঞ্জক কণিকা থাকে না। ইহাদের দেহকোষে মিথোজীবী শৈবাল জুক্লোরেল্লা পুষ্টিগ্রহণে সংহায্য করে।

(C) মৃতভোজী (**Saprozoic**) ঃ বহু পরভোজী এবং অনেকগুলি বর্ণ-বিহীন স্বাধীনজীবী ফ্লাজেলাযুক্ত প্রাণীর এই ধরণের পুষ্টি দেখা যায়। ইহাদের খাদ্যসংগ্রহের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই। ইহাদের সমগ্রদেহ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় খাদ্যরস শোষণ করিয়া পুষ্টিসাধন করে। জৈব গলিত পদার্থের জৈব-নির্যাসের উপর ইহারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়। অনেকগুলি পরজীবী আদ্যপ্রাণী (এন্টমিবা হিস্টোলিটিকা) কঠিন খাদ্যকণা গ্রহণ করে অন্যান্য হোলোজয়িক প্রথায় পুষ্টিসাধন করে। এই পরভোজীর দেহ নিঃসৃত উৎসেচক কঠিন খাদ্যবস্তুকে গ্রহণোপযোগী করিয়া তোলে। একমাত্র সামুদ্রিক প্রাণী সিরাটিয়াম কতকগুলি বিশেখ গহ্বর পালসিউল সৃষ্টি করে।

(D) পরভোজী (**Parasitic nutrition**) ঃ অন্যজীবদেহে পরভোজী আদ্যপ্রাণী বাস করে। ইহারা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে খাদ্যের জন্য প্রাণীর উপর নির্ভরশীল হয়। অনেক পরজীবী, যেমন ওপেলিনা (**opalina**)

পোষক মৃতভোজীর মতো সমগ্র দেহ দ্বারা পোষকজীবের কোষকলার উপর খাদ্যর জন্য নির্ভরশীল হয়।

(E) মিশ্রভোজী (Mixotrophic nutrition) : অনেক আদ্যপ্রাণী পরিবেশের প্রভাবে একাধিক পদ্ধতিতে পুষ্টিসাধন করে, তাহাকে মিশ্রপুষ্টি বলে। যেমন, ইউগ্লিনা উদ্ভিদের মতো ক্রোমেটোফোরের উপস্থিতিতে শর্করাজাতীয় খাদ্য হোলোফাইটিক প্রথায় তৈয়ারী করে। আবার ইহারা পরিবেশ হইতে মৃতভোজী আদ্যপ্রাণীর মতো বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য কোষ মধ্যে পোষণ করে। একইজীবে একাধিক পুষ্টি ক্রিয়া থাকায় ইহাদের মিশ্রভোজী প্রাণী বলে।

(F) কপরোজয়িক পুষ্টি (Coprozoic nutrition) : অনেক আদ্যপ্রাণী অন্যপ্রাণীর মলমূত্র হইতে খাদ্যসংগ্রহ করিয়া পুষ্টিসাধন করে। ইহাকে কপরোজয়িক পুষ্টি বলে। সারকোমোনাস, টিলিনা ইত্যাদি আদ্যপ্রাণীতে এইধরণের পুষ্টি দেখা যায়।

আদ্যপ্রাণীর কোষে সঞ্চিত খাদ্য : আদ্যপ্রাণীয় কোষে বিভিন্ন প্রকার সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য থাকে। এই সকল খাদ্যদ্রব্য কোষের মধ্যে কণিকার আকারে, কেলাস আকারে জমা থাকে। এই সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য জনন, পুষ্টি ও বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে সাহায্য করে। নীচে কয়েকটি আদ্যপ্রাণীর দেহে সঞ্চিত খাদ্যের তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

(i) গ্লাইকোজেন :	বেশীরভাগ আদ্যপ্রাণীতে থাকে। তাহার ভিতরে পরজীবী প্রাণীতে ইহাদের প্রাধান্য বেশী।
(ii) প্যারাগ্লাইকোজেন :	মৃতজীবী আদ্যপ্রাণীতে দেখা যায়; যেমন— গ্রিগ্যারিনিডা।
(iii) প্যারামাইলাম :	ইউগ্লিনা বা ক্লোরোফিলযুক্ত আদ্যপ্রাণীতে থাকে।
(iv) লিউকোসিন :	ক্রিসোমোনাডিনাতে পাওয়া যায়।
(v) প্রোটিন :	যে সকল আদ্যপ্রাণী হোলোজয়িক প্রথায় পুষ্টিসাধন করে, তাহাদের কোষে প্রোটিন জমা থাকে।

(vi) তৈলবিন্দু ঃ	প্রায় সকল আদ্যপ্রাণীর সাইটোপ্লাজমে তৈলবিন্দু পাওয়া যায়।
(vii) ভলিউটিন কণা ঃ	সিলিয়া যুক্ত প্রাণী ব্যতিরেকে সকল আদ্য-প্রাণীতে পাওয়া যায়।

অষ্টম অধ্যায়

জনন (Reproduction in Protozoa)

জনন বলিতে বুঝায়, পুরাতন বয়বৃদ্ধ জীব হইতে নূতন জীবের সৃষ্টি। পুরাতন জীবগুলি হয় মরিয়া যায় অথবা শত্রুর দ্বারা **নিধন হইয়া** ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। জননের প্রয়োজনীয়তা জীবের মধ্যস্থ প্রাণকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য নয়, সমগ্র জাতির অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য। ইহা একটি জৈবিক সূত্র, শারীরবৃত্তীয় আশ্চর্য রকমের ঘটনা, যাহার ফলে পুরাতন জীব হইতে প্রায় একই রকম গুন সম্পন্ন নূতন জীবের সৃষ্টি হয়।

আদ্যপ্রাণী পুষ্টি ও বৃদ্ধির অন্তবর্তীকালে বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে। জনন প্রক্রিয়া সবসময়ই নিউক্লিয় বিভাজনের দ্বারা সম্পন্ন হয় (অবশ্য কিছু ফ্লাজেলেট ব্যতীত)। প্রোটোজোয়ার নিউক্লিয়াস মিটোসিস বা 'পরিবর্ধিত মিটোসিস' প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। জননকোষ তৈয়ারীর সময় সর্বদাই মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজন হয়। দ্বিবিভাজন (Binary fission) বা বহু বিভাজন (Multiple fission) প্রক্রিয়ার শুরুতে নিউক্লিয়াসই প্রথম বিভক্ত হয় ও বিভাজিত অংশ তাহার চারিপার্শ্বে সাইটোপ্লাজম জড়ো করে এবং পরিশেষে দেহ বিভক্ত হইয়া অপত্য কোষের (প্রাণীর) সৃষ্টি করে।

আদ্যপ্রাণীর জনন প্রক্রিয়া ও জীবন চক্র হইল বিবিধ এবং দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—**অযৌন (asexual)** এবং **যৌন (sexual)**।

1. অযৌন জনন (Asexual reproduction)—এই প্রক্রিয়ায় কোন বিশিষ্ট যৌন কোষ অংশগ্রহণ করে না। বেশীর ভাগ আদ্যপ্রাণী এই অযৌন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বংশ বিস্তার করিয়া থাকে এবং কিছু কিছু আদ্য-প্রাণীর ক্ষেত্রে ইহাই একমাত্র জননের মাধ্যম। অযৌন পদ্ধতিতে সাধারণতঃ —দ্বিবিভাজন (**Binary fission**), বহুবিভাজন (**Multiple fission**), প্লাসমোটমি (**plasmotomy**), কোরকোদ্গম (**Budding**) এবং এণ্ডোডাই-জেনি (**Endodyogeny**) প্রক্রিয়ায় প্রজনন হয়।

(i) দ্বি-বিভাজন (Binary fission) : মাতৃকোষের বিভাগে দুই বা ততোধিক অপত্য কোষের সৃষ্টিকে **বিভাজন (fission)** বলে। দ্বিবিভাজন

পদ্ধতিই আদ্যপ্রাণীতে সচরাচর ঘটিয়া থাকে। এই বিভাজন প্রনালী পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। এই প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষটি বিভাজিত হইয়া দুইটি প্রায় সমান অংশের অপত্য কোষ তৈয়ারী করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে নিউক্লিয়াসটি বড় ও স্পষ্ট হইয়া উঠে। মিটোসিস (Mitosis) পদ্ধতিতে নিউক্লিয়াস বিভাজন হয়। অতঃপর সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয়। সাইটোপ্লাজমের বিভক্ত হওয়াকে সাইটোকাইনেসিস (cytokynesis) বলে। নিউক্লিয়াসের বিভাজনকালে নিউক্লিও পর্দা বিলুপ্ত হয় ও নিউক্লিয়াস দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়। অসংখ্য ক্রোমোজোম দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া নিউক্লিয় আবরণীবদ্ধ হয়।

বিভিন্ন আদ্যপ্রাণীতে এই বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান এবং দৈহিক আকৃতির সহিত নির্দিষ্ট সম্পর্কযুক্ত। বিভাজনের তল অনুযায়ী—

(a) **সাধারণ-দ্বিবিভাজন (Simple binary fission)**ঃ লোবোসিয়া শ্রেণীর অন্তর্গত আদ্যপ্রাণীর বিভাজনটি তুলনামূলক ভাবে খুবই সরল এবং যে কোন তলেই হইতে পারে। অ্যামিবাতে (79 নং চিত্র) অপত্য নিউক্লিয়াস দুইটি দুইদিকে সরিয়া যায় এবং দেহমধ্যস্থ সাইটোপ্লাজম বিপরীত মুখী হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। ইতোমধ্যে, নিউক্লিয়াসের মধ্যস্থল ক্ষীন হইতে ক্ষীনতর হইতে থাকে এবং অবশেষে জীবনের মধ্যপাদে বা যৌবনেই মাতা অ্যামিবা দুইটি অপত্য অ্যামিবায় রূপান্তরিত হইয়া নূতন করিয়া জীবন শুরু করে।



চিত্র-79 অ্যামিবার দ্বিবিভাজন

(b) **অনুদৈর্ঘ্য দ্বিবিভাজন (Longitudinal binary fission)** বেশীর ভাগ ম্যাস্টিগোফোরা শ্রেণীর অন্তর্গত আদ্যপ্রাণী (যেমন, ইউগ্লিনা, পেরানিমা)

এবং সিলিওফোরা পর্বের পেরিট্রিকিডা বর্গের অন্তর্গত আত্মপ্রাণীদের (যেমন—ভর্টিসেলা)-য় এই বিভাজনটি দেহকোষের মধ্যস্থল হইতে লম্বালম্বি ভাবে ঘটে এবং কোষের উপর প্রান্ত হইতেই বিভাজিত হইতে থাকে (80 নং চিত্র)।



চিত্র-80 ইউগ্লিনারঅণুদৈর্ঘ্য দ্বিবিভাজন

(c) **আড়াআড়ি দ্বি-বিভাজন (Transverse binary fission)**-সিলিওফোরা পর্বের প্যারামিসিয়ামের মধ্যে এই বিভাজন দেখা যায়। দেহের অক্ষরেখার সহিত সমকোন করিয়া আড়াআড়িভাবে এই বিভাজনটি সম্পূর্ণ হয়। অবশ্য খুব কম সংখ্যক সিলিওফোরা পর্বের অন্তর্গত আত্মপ্রাণীতে [যেমন, অক্সিরথিস্ (oxyrthis)] এই ধরনের বিভাজন দেখা যায়।

(d) **তেরছা-দ্বি-বিভাজন (oblique binary fission)**–কিছু সংখ্যক ডাইনোফ্লাজেলাটা (Dinoflagellata) আত্মপ্রাণীতে (যেমন-সেরাটিয়াম) দ্বিবিভাজন তেরছাভাবে সংঘটিত হয়।

আত্মপ্রাণীতে অপত্য জীবের বিভিন্ন অঙ্গাংশের (যেমন-ফ্লাজেলা, ষ্টিগ্‌মা, ক্রোমেটোফোরা, ব্লেফারোপ্লাস্ট, সিরাই, মেমব্রেনেলি, সাইটোস্টোম ইত্যাদি) বিভাজনের পর বিভিন্ন অবস্থা হইতে পারে।

অঙ্গাংশগুলি বিভাজিত হইয়া প্রতিটি অপত্য কোষে চলিয়া যাইতে পারে। তাহা না হইলে অবিভক্তভাবে একটি অপত্য কোষে থাকিয়া যায় এবং অন্য অপত্য কোষে নূতনভাবে অঙ্গাংশগুলির সৃষ্টি হয়। আবার কখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তও হইতে পারে।

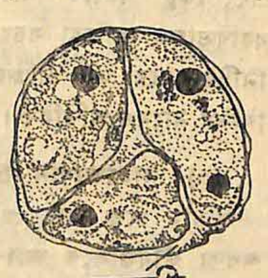
কিছু কিছু আত্মপ্রাণীতে [যেমন, ক্লামিডোমোনাস (chlamydomonas), মাইক্রোগ্রোমিয়া (Microgromia) ইত্যাদি] পরপর (repeated) সমান-

ভাবে দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়া ঘটে, ফলে চারিটি বা ততোধিক অপত্যজীব সৃষ্টি হয়। অবশ্য সম্পূর্ণরূপে বিভাজন প্র ক্রিয়াটি না হওয়া পর্যন্ত অপত্যজীবগুলি পৃথক হয় না। উল্লেখযোগ্য, ভলভক্সের (**Volvox**) মাইক্রোগ্যামেট সৃষ্টিও এই রূপে হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ অপত্যকোষগুলি মেরুর **অভিমুখী** বজায় রাখে। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও দেখা যায়। দ্বিবিভাজনের ফলে সচরাচর সমান আকৃতির দুইটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়। অনেক সময় ইহার অন্যথাও দেখা যাইতে পারে। অর্থাৎ বিভাজনটি সমান নাও হইতে পারে। যেমন, বৃন্তযুক্ত ভর্টিসেলাতে দুইটি অপেক্ষাকৃত অসমান ভর্টিসেলায় সৃষ্টি হয়। দুহিতা কোষ দুইটির মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও বৃন্তহীন তাহাকে **টেলোট্রক (Telotroch)** বলে। ইহার পশ্চাদ অংশ ঘিরিয়া সিলিয়ার ফিতা গড়িয়া ওঠে এবং সিলিয়াগুলি আন্দোলিত হওয়ার ফলে ইহারা সক্রিয়ভাবে সাঁতার কাটিয়া বিচরন করে। ক্রমশঃ ইহারা জলজ উদ্ভিদ সংলগ্ন হয় এবং গঠন সম্পন্ন হইলে বৃন্তের সাহায্যে সাধারন পূর্ণাঙ্গ ভর্টিসেলার ন্যায় কোন বস্তুতে আটকাইয়া থাকিয়া ভাসিতে থাকে।

উল্লেখ যোগ্য, কিছু কিছু সিলিওফোরা পর্বের অন্তর্গত আদ্যপ্রাণীতে (যেমন, কোলপোডা, টিলিনা) শুধুমাত্র আবরণীবদ্ধ অবস্থায় বিভাজন ঘটে। (চিত্র নং 81)

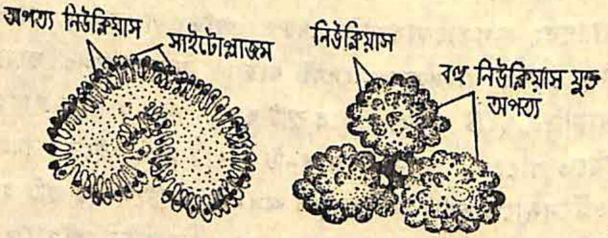
(ii) বহুবিভাজন (Multiple fission) অথবা স্পোরুলেশান **(Sporulation)**— অযৌন প্রজননের অপর আর এক পদ্ধতি বহু-বিভাজন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াতে নিউক্লিয়াসের বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গেই সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয় না। প্রথমে নিউক্লিয়াসটি পর পর দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে বিভক্ত হয় (যেমন, প্লাসমোডিয়ামের ক্ষেত্রে) অথবা একই সঙ্গে বহুবিভাজন ঘটে (যমন, এগ্রিগাটা অন্তর্ভূক্ত আদ্যপ্রাণীতে)। ফলে, দেহটি অসংখ্য নিউক্লিয়াস সমন্বিত হয়। ইহার পরেই সাইটোপ্লাজম, যতগুলি অপত্য নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয় ততগুলি অংশে বিভক্ত হয়। অপত্য



চিত্র-81 সিস্টের মধ্যে টিলিনার বিভাজন

নিউক্লিয়াসগুলি সাধারণতঃ পরিধির দিকে থাকে এবং প্রতিটি নিউক্লিয়াসই সাইটোপ্লাজম দ্বারা আবৃত হয়।

এইভাবে যতগুলি নিউক্লিয়াস মাতৃকোষে উৎপন্ন হয়, ততগুলিই অপত্য



চিত্র-82 (ক) বহুবিভাজন (খ) প্লাসমোটোমি

জীবের সৃষ্টি হয়। উল্লেখযোগ্য, সাধারণতঃ মাতৃকোষে কিছুটা অবশিষ্ট সাইটোপ্লাজম থাকিয়া যায় এবং পরে উহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। অপত্য কোষের সংখ্যা বিভিন্ন প্রজাতিতে বা একই প্রজাতিতে বিভিন্ন হইতে পারে।

ফোরামিনিফেরা (Foraminifera), রেডিওলারিয়া (Radiolaria) এবং কিছু সংখ্যক **ম্যাষ্টিগোফোরা (Mastigophora)** আত্মপ্রাণীতে বহুবিভাজন প্রক্রিয়া সচরাচর দেখা যায়। বিভিন্নপ্রজাতিতে, জীবনচক্রের নির্দিষ্ট সময়ের এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং সেই কারনে এই প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন নামেও অভিহিত।

(a) সাইজোগনি **(Schizogony)** অথবা এগামোগনি **(Agamogony)** —অযৌন চক্রে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় (উদাহরণ—প্লাসমোডিয়াম)। অপত্য জীবগুলিকে অ্যা-গ্যামেটস **(agametes)** অথবা মেরোজয়েটস্ **(Merozoites)** বলা হয় এবং প্রতিটিই সরাসরি পূর্ণ দানায় পরিণত হয়।

(b) গ্যামোগনি **(Gamogony)**—যৌন চক্রে সমাধা হয়। উৎপন্ন বস্তুগুলি যৌনকোষ **(Sexcells)** অথবা গ্যামেট্স **(Gametes)**।

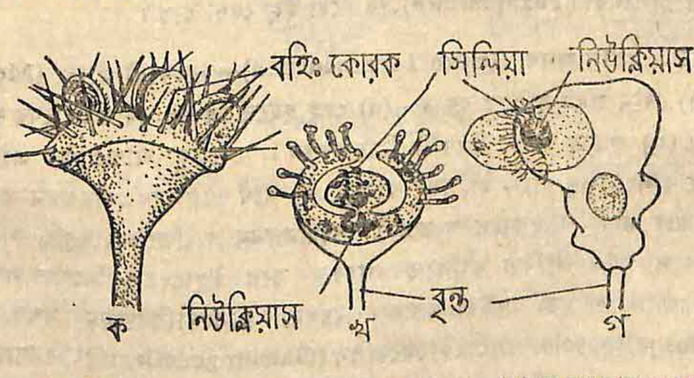
উদাহরণ—মনোসিস্টিস।

(c) স্পোরোগনি **(Sporogony)**—যৌনমিলনের পরে ইহা সংঘটিত হয়। উৎপন্ন বস্তুগুলি সাধারণতঃ স্পোর **(Spore)** নামে অভিহিত করা হয় (যখন-

সিস্ট্ অথবা অনান্য প্রতিরোধক প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ থাকে)। এইরূপ বহুবিভাজনের ফলে উৎপন্ন বস্তুগুলিকে সোয়ামার্স (Swarmers) বলে। পরে ফ্লাজেলাস্পোরস্ (Flagellospores). [ফ্লাজেলা থাকে] অথবা অ্যামিবোস্পোরস (অ্যামিবয়েড আকৃতির)-এ রূপান্তরিত হয়।

(iii) প্লাসমোটমি—(Plasmotomy)-বহুনিউক্লিয়াস যুক্ত আদ্যপ্রাণীতে (যেমন, ওপালিনা, এক্টিনোস্ফিয়াম, পেলোমিক্সা ইত্যাদি) দুই বা ততোধিক ছোট অসংখ্য নিউক্লিয়াস সমন্বিত অপত্য জীব সৃষ্টি হওয়াকে প্লাসমোটোমি বলে। এই রকম বিভাজন দেখিয়া—ডফ্লিন (Doflein) এই নামকরণ দিয়াছিলেন। মাতৃকোষের নিউক্লিয়াইগুলি বিক্ষিপ্তভাবে অপত্য জীবে যায় এবং পরে বিভক্ত (পুনরায়) হইবার ফলে সঠিক সংখ্যায় অপত্য জীবে ফিরিয়া আসে। (82খ নং চিত্র)। অসংখ্য মিক্সোসপোরিডিয়ান (Myxosporidian), মাইসেটোজোয়ান (Mycetozoan), এবং লোবোসিয়া (Labosia) শ্রেণীর অন্তর্গত আদ্যপ্রাণীতে ঘটে।

(iv) কোরকোদ্গম (Budding) অথবা গেমেশান (Gemmation)—মাতৃদেহ হইতে এক বা একাধিক ছোট অপত্য জীবের উদ্ভব এবং পৃথক হওয়াকেই কোরকোদ্গম বা গেমেশান বলে। প্রতিটি কোরক মাতৃ নিয়াক্লিয়াসের অংশ গ্রহণ করে এবং মাতৃকোষ হইতে বিচ্যুত হইবার পূর্বে বা পরে সুবিন্যস্ত হয়। শেষ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করে। এই প্রক্রিয়া কম দেখা গেলেও সাক্টোরিয়া অধঃ শ্রেণী ভুক্ত আদ্যপ্রাণীর ইহা নিত্যকার জনন পদ্ধতি।



চিত্র 83 (ক) ইউগ্লাইফার বহিঃকোরকোদ্গম (খ) অন্তঃকোরকদ্গম (গ) টোকোফ্রিয়ার কোরকদ্গম

কোরকোদ্‌গম চারিধরনের—

(a) **মনোটমিক কোরকোদ্‌গম (Monotomic budding)**—একবারে একটিই মাত্র কোরক সৃষ্টি হওয়াকে মনোটমিক কোরকদ্‌গম বলে।

(b) **বহুলকোরকোদ্‌গম (Multiple budding)**—অসংখ্য কোরকোদ্‌ সৃষ্টি। উদাহরণ-সাক্টোরিয়া অধঃশ্রেণী ভুক্ত আদ্যপ্রাণী।

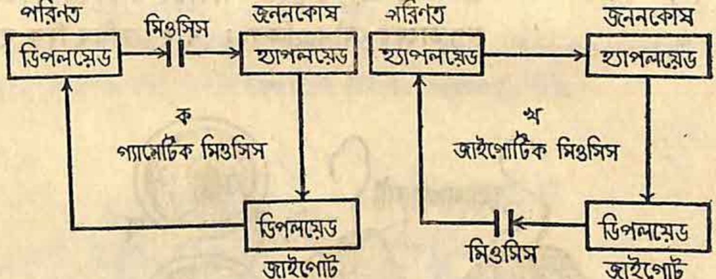
(c) **বহিস্থঃ কোরকোদ্‌গম (Exogenous budding)**—এই প্রকার বহিঃস্থ কোরকোদ্‌গমে উৎপন্ন কোরকগুলি মাতৃদেহের বাহিরের দিক হইতে সঙ্কুচিত হইয়া আলাদা হইয়া যায়। (যেমন, নক্টিলিউকা, এফেলোটা, মিক্সিডিয়াম ইত্যাদি)।

(d) **অন্তঃস্থ কোরকোদ্‌গম (Endogenous budding)**—অন্তঃস্থ কোরকোদ্‌গমে উৎপন্ন কোরকগুলি মাতৃদেহের ভিতরে বিশেষ স্থানে (ব্রডচেম্বার) মুক্ত হয়। কোরকগুলি বাহির হইবার পূর্বে ইহাদের দেহে সিলিয়া উৎপন্ন হয়। অন্তস্থঃ কোরকোদ্‌গম খুবই কম দেখা যায়। **স্পোরোজোয়া (sporozoa)** শ্রেণী এবং **সাক্টোরিয়া (Suctoria)** অধঃশ্রেণী ভুক্ত আদ্যপ্রাণীতে এই অন্তস্থঃ কোরকোদ্‌গম দেখা যায়।

(v) **এণ্ডোডাইয়োজেনি (Endodyogeny)**—মাতৃকোষেই দুইটি অপত্যের ক্রমবিকাশ ঘটে এবং পরে প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মাতৃকোষটি নষ্ট হয়। টক্সোপ্লাসমিয়া (**Toxoplasmea**)দের মধ্যে ইহা দেখা যায়।

2. **যৌন জনন (Sexual reproduction)**—বহুকোষী জীবে (**Metazoa**) যৌন জনন বলিতে বুঝায়—**(a)** দেহ হইতে বিশিষ্ট যৌন কোষের মুক্তি এবং **(b)** শুক্রানু দ্বারা ডিম্বকটির নিষিক্তকরন। যেহেতু আদ্যপ্রাণীর এইরূপ দেহ বলিয়া কিছু থাকে না, সেই কারনে এই অর্থে তাহাদের যৌনজনন সঠিক বোঝায় না। অধিকাংশ আদ্যপ্রাণী অযৌনজনন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করিয়া বহুকাল পর্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। তবে ইহাদেরও বিশেষ সময়ে যৌনজনন প্রক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। যেমন, প্লাসমোডিয়ামের মশক-চক্র (Mosquitocycle) গ্যামেটোজেনেসিস (Gametogenesis) এবং সিনগ্যামী (Syngamy) ব্যতীত সম্পূর্ণ হইতে পারে না। একইভাবে, এমেরিয়া (Eimeria)-র স্পোর সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

মিওসিস (Meiosis)—অথবা হ্রাসবিভাজন **(Reduction division)**—যৌন প্রক্রিয়ায়, এই পদ্ধতির দ্বারা ক্রোমোসোম গুলি সবসময় হ্যাপলয়েড **(Haploid)** সংখ্যায় পরিণত হয়। বিভিন্ন আদ্যপ্রাণীতে এই মিওসিস বিভিন্ন সময়ে ঘটে। বেশীরভাগ সময়ে সিনগ্যামীর পূর্বে ঘটিয়া থাকে। ইহাকে **গ্যামেটিক মিওসিস (Gameticmeiosis)** বলে। ফলে, গ্যামেটগুলি হ্যাপ্লয়েড এবং জাইগোট এবং অন্যান্য দশাগুলি **ডিপ্লয়েড (Diploid)**। কিন্তু, কিছু স্পোরোজোয়া শ্রেণীভুক্ত আদ্যপ্রাণী জাইগোটের প্রথম বিভাজনের সময় হ্রাস বিভাজন **(Reduction-division)** হয়, তখন ইহাকে **জাইগোটিক মিওসিস (zygotic meiosis)** বলা হয়। ইহাতে শুধুমাত্র জাইগোটটি ডিপ্লয়েড এবং অপর সকল দশা হ্যাপ্লয়েড। **কনজ্যুগ্যাণ্ট মিওসিস (Conjugant meiosis)**-এ হ্রাস বিভাজন ঘটে কনজ্যুগেশান **(Conjugation)**-এর কোন এক **প্রিগ্যামিক (pregamic)** বিভাজনের সময়। রেখাঙ্কিত করিয়া দুই ধরনের জীবনচক্র বোঝান হইল।



চিত্র-84 আদ্যপ্রাণীর দু'ধরণের জীবনচক্র

আদ্যপ্রাণীর বিভিন্ন প্রকারের যৌনপ্রক্রিয়া গুলি নীচে আলোচিত হইল:

(i) **সিনগ্যামী (Syngamy)**ঃ এই প্রক্রিয়ায় দুইটি বিশিষ্ট আদ্যপ্রাণীর বা জননকোষের সম্পূর্ণরূপে মিলনের ফলে সৃষ্টি হয় একটি নিষিক্ত কোষ **(fertilized cell)** অথবা জাইগোট **(zygote)** অথবা উস্‌পোর **(oospore)**। জননকোষ গুলির নিউক্লিয়াই মিলিত হইয়া জাইগোট নিউক্লিয়াস **(zygote-nucleus)** বা সিনক্যারিয়ন **(synkaryon)** পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

মিলনগামী জননকোষের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া সিনগ্যামী অনেক

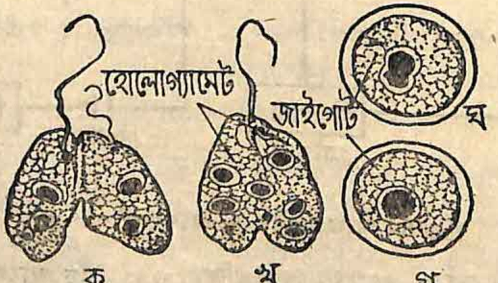
রকমের হইতে পারে।

(a) অটোগ্যামী **(Autogamy)** ঃ একই মাতৃকোষ হইতে আগত জননকোষের মিলনকে অটোগ্যামী বলে। (যেমন, এক্টিনোস্ফিয়াম এবং এক্টিনোফ্রিসদের মধ্যে দেখা যায়।

(b) এক্সোগ্যামী **(Exogamy)** ঃ এই ধরনের সিনগ্যামী ঘটে বিভিন্ন মাতৃকোষ হইতে আগত অপত্যদের মধ্যে।

(c) পিডোগ্যামী **(Paedogamy)** ঃ মিলনগামী অপত্যরা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। যেমন দেখা যায় এক্টিনোফ্রিসদের মধ্যে।

(d) হোলোগ্যামী **(Hologamy)** ঃ দুইটি সাধারণ আকৃতির পূর্ণতপ্রাপ্ত অপত্যদের যৌনপ্রক্রিয়া। বহিরাকৃতির দিক হইতে



চিত্র-**85** কপরোমোনাসের হোলোগ্যামি জনন

ইহারা সাধারণের মতই কিন্তু গ্যামেটের ন্যায় আচরণ করে। খুব কম সংখ্যক সারকোডিনা এবং ম্যাস্টিগোফোরা আত্মপ্রাণীর মধ্যে হোলোগ্যামি দেখা যায়।

(e) মেরোগ্যামি (**Merogamy**) ঃ মিলনগ্যামী অপত্যদের মেরো-গ্যামেট্স (**Merogametes**) অথবা সাধারণ জননকোষ বলিয়া অভিহিত করা হয়। বিশেষ ধরনের বিভাজনের ফলে ইহাদের সৃষ্টি হয়। এবং সাধারণের থেকে আকৃতিতে ছোট হয়।

(f) আইসোগ্যামি (**Isogamy**) ঃ একই আকৃতি বিশিষ্ট জননকোষ গুলিকে অ্যাইসোগ্যামেট্স (**Isogametes**) বলে। এবং ইহাদের মিলনকে আইসো গ্যামী (**Isogamy**) বলা হয়। আইসোগ্যামেটগুলি বহুবিভাজন অথবা পরপর দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হইতে পারে। এবং প্রায়শঃ **ফ্লাজেলেট সোয়ার্মাস (Flagellate Swarmers)** হিসাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হয়। সৃষ্ট জাইগোট পরে **ট্রফোজয়েট** (**Trophozoit**)-এ পরিণত হয়। আইসোগ্যামী সাধারণত নিম্নলিখিতদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন, এলফিডিয়াম, কপ্রোমোনাস, ক্লামিডোমোনাস এবং মনোসিস্টিস।

(g) অ্যানাইসোগ্যামী (**Anisogamy**) ঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মিলন-গামী জননকোষগুলি আকৃতিগত ভাবে আলাদা হয়। ইহাদের মিলনকে অ্যানাইসোগামী অথবা হেটেরোগ্যামি (**Heterogamy**) বলে।



চিত্র-86 ভলভক্সের অ্যানাইসোগ্যামেট

আদ্যপ্রাণীর জনন প্রক্রিয়ায় অ্যানাইসোগ্যামেটগুলির আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য স্পারমেটোজোয়া (**Spermatozoa**) ও ওভা (**Ova**)-র সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ছোট আকৃতির জননকোষ গুলিকে মাক্রোগ্যামেট (**Microgamete**) এবং বড় আকৃতির জননকোষ গুলিকে ম্যাইক্রোগ্যামেট (**Macrogamete**) বলে এবং যথাক্রমে পুং জননকোষ (**Malegamete**) এবং স্ত্রী জননকোষ (**Female gamete**) বলিয়া চিহ্নিত হয়। নিম্নলিখিতদের

মধ্যে, অ্যানাইসোগ্যামী দেখা যায়।

যেমন, প্লাসমোডিয়াম, এমেরিয়া (স্পোরোজোয়া), ভলভক্স, ক্লোরোগোনিয়াম (ফাইটোমোনাডিনা), কিছু সংখ্যক ফোরামিনিফেরা এবং সম্ভবতঃ রেডিওলারিয়া দের মধ্যেও দেখা যায়।

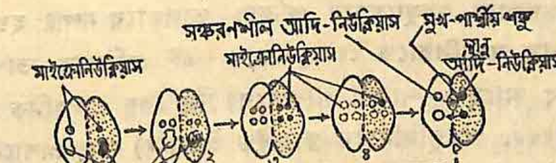
সিনগ্যামী ঘটিত প্রভাব (Effects of syngamy) ঃ বাহ্যিক বৈশিষ্টের দিক হইতে সিনগ্যামীর ফলে নিউক্লিয়াসের পুনর্গঠন হয়। ইহা ছাড়া শারীর বৃত্তীয় ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার রাখে। যেমন,

1. উচ্চতর প্রাণীদের **ডিম্বাঙ্কুর (Egg)** স্ফুরনে সাহায্য করে।
2. দুইটি পৃথক বংশগতির ধারাকে নিকটে আসিতে সাহায্য করে।
3. অপত্যের বাহ্যিক পৃথকত্ব বজায় থাকে।
4. ক্রমাগত অযৌন জননের ফলে কমিয়া যাওয়া জীবনশক্তি কে পুনরুদ্ধার করে।

(ii) কনজ্যুগেশান (Conjugation) ঃ দুইটি একই প্রজাতির অথবা অপত্যপ্রাণী সাময়িক ভাবে মিলন বদ্ধ হয় ও উভয়ের মধ্যে সাইটোপ্লাজমের সেতু গড়িয়া উঠে। মেগা-নিউক্লিয়াস বিলীন হইয়া যায় এইং মাইক্রো-নিউক্লিয়াস পুনঃ সশ্লেষিত হইয়া নিউক্লিয় বস্তুর আদান প্রদান ঘটায়। এই বিশেষ মিলন প্রক্রিয়ার নাম **সংযোগ** বা **কনজ্যুগেশান**। সিলিওফোরা পর্বের অন্তগত আদ্যপ্রাণীতে ইহা দেখা যায়া। এই প্রক্রিয়াটি অনেক উন্নত ধরনের এবং বহুকোষী প্রাণীর জননের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। দুইটি যৌনতাপ্রাপ্ত প্রাণীকে **কনজ্যুগ্যান্ট (Conjugant)** বলা হয়। ইহারা **আইসোগ্যামাস** (যেমন, প্যারামিসিয়াম) অথবা **আনাইসোগ্যামাস (Anisogamous)** হইতে পারে।

কনজ্যুগেশান পদ্ধতি (Process of Conjugation) ঃ হার্টউইগ (Hertwig), মপাস (Maupas), উডরাফ (Woodruff) এবং অন্যান্যরা এই পদ্ধতিটি প্যারামিসিয়ামের উপর ভালভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বিরাট বৈচিত্র্যও দেখিয়াছেন। শুধুমাত্র মাইক্রোনি-ক্লিয়াই (Micronuclei)-এই প্রক্রিয়ার অংশীদার। **মাক্রোনিউক্লিয়াস (Macronucleus)** তথা বিপাকীয় নিউক্লিয়াসটি পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়, কারন সাইটোপ্লাজমেরই ইহা সামগ্রিকভাবে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া

যায়। প্রতিটি কনজ্যুগ্যাণ্টের **মাইক্রো** (ক্ষুদ্র) নিউক্লিয়াসটির দুইবার বিভাজন ঘটে ইহার মধ্যে একটি বিভাজন **মিয়োসিস (meiosis)** পদ্ধতিতে হয়। ফলে প্রত্যেক কনজ্যুগাণ্টে—চারটি করিয়া ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হ্যাপ্‌লয়েড (ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক) নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। অতঃপর প্রত্যেকটিতে ইহাদের তিনটি করিয়া নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমে বিলীন হইয়া যায়, ফলে একটি করিয়া অবশিষ্ট থাকে। এই নিউক্লিয়াসটি পুনঃবিভাজিত হয় ও দুইটি করিয়া অক্ষম আকৃকির **প্রো (Pro)** নিউক্লিয়াস গঠন করে। ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার নিউক্লিয়াসটি **সঞ্চরনশীল (migratory)** নিউক্লিয়াস বা পুং জননকোষ ও অপরটিকে **স্থানু (Stationary)** নিউক্লিয়াস বা স্ত্রী জননকোষ বলা হয়। অতঃপর যুগলবদ্ধ উভয়ের মধ্যে স্থাপিত সাইটোপ্লাজমের সংযোগী-সেতু বাহিয়া একের 'পুং' প্রো নিউক্লিয়াস অপরের 'স্ত্রী' প্রোনিউক্লিয়াসের সহিত মিলিত হয়। ফলে, প্রত্যেকটিকে একটি করিয়া সম্মিলিত নিউক্লিয়াস বলে। ইহাই **জাইগোট নিউক্লিয়াস** বা **সিনক্যারিয়ন**। এখানে উল্লেখ-যোগ্য, দুইটি ভিন্ন প্রাণী হইতে লব্ধ নিউক্লিয়াস দুইটির সম্পূর্ণ মিলনকে **অ্যামফিমিক্সিস (Amphimixis)** বলে [ওয়াইজম্যান (**Weismamann**)-এর মতে]। দুইটি কনজ্যুগ্যাণ্টই এক্স-কনজ্যুগ্যাণ্ট হিসাবে মিলনের পর পৃথক হয়।



চিত্র নং 87 প্যারামিসিয়াম কডেটাম এর কনজ্যুগেশান পদ্ধতিতে নিউক্লিয় বস্তুর আদান প্রদান দেখান হইল

ইহারপর প্রতিটি এক্স-কনজ্যুগ্যাণ্টের নিউক্লিয়াসের পরপর বিভাজনের

সহিত সঙ্গতি রাখিয়া দেহকোষের দ্বি-বিভাজন হয়। এই প্রক্রিয়ায় চারিটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকটি অপত্য কোষেই মাতৃকোষের ন্যায় একটি মাইক্রো ও একটি মেগা নিউক্লিয়াস থাকে।

কনজ্যুগেশানের শর্ত (Factors affecting Conjugation) ঃ কনজ্যুগেশানের গতি **সিলিয়াটার** বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন শর্ত গুলি বিজ্ঞানীরা নানাভাবে বুঝাইয়াছেন।

(1) সংশ্লেষ উদ্যোগী অপত্যরা সাধারণের থেকে আকৃতিতে ছোট হয়।

(2) সোনেবর্ণের (**Sonneborn**, 1937) মত অনুযায়ী, প্যারামিসিয়ামের প্রতিটি প্রজাতির অনেকগুলি **সিনজেন্ (Syngen)** বর্তমান। প্রতিটিরই দুইটি করিয়া সঙ্গমের ধরন অছে। কনজ্যুগেশান শুধুমাত্র একই সিনজেনের ভিন্ন ধরনের সঙ্গম উদ্যোগী অপত্যদের মধ্যে ঘটিয়া থাকে।

(3) **মপাস্ (Maupas)** এর মতে প্রতিটি অপত্যরই কনজ্যুগেশানের পূর্বে বহুবার অযৌন দশার মধ্য দিয়া যাইতে হয়।

(4) কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রথমে অনশন এবং পরে প্রচুর খাদ্য লইয়া কনজ্যুগেশানে প্রবৃত্ত হয়।

(5) বিভিন্ন পরিবেশের উপর কনজ্যুগেশান নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অন্ধকারে কনজ্যুগেশান প্রক্রিয়া ভালভাবে সম্পন্ন হয় (যেমন, **প্যারামিসিয়াম অরেলিয়াতে** দেখা যায়)। এই প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রারও যথেষ্ট প্রভাব আছে। আবার পরিবেশের কিছু কিছু রাসয়নিক পদার্থ ও (যেমন, আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি) কনজ্যুগেশানের পক্ষে সুবিধাজনক।

কনজ্যুগেশানের তাৎপর্য (Significanee of Conjugation) কনজ্যুগেশান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যদিও ইহা জনন প্রক্রিয়ার সহিত সম্পর্কিত। ইহার উদ্দেশ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে কনজ্যুগেশানের তাৎপর্য বলিয়া মনে করা হয়—

(1) **সজীবন (Rejuvenescence) ঃ** দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ক্রমন্বয়ে দ্বিবিভাজন চলিবার ফলে কর্ম ক্ষমতা ভীষণভাবে হ্রাস পায় এবং আকৃতিতে হ্রাস প্রাপ্ত ও অবক্ষয়িত হইয়া পরিশেষে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। কনজ্যুগে-

শানই এই ভয়াবহ পরিণতি হইতে রক্ষা করে। ইহার ফলেই প্রজাতি পূর্ণ জীবন লাভ করে। অবশ্য উডরাফ (Woodruff) ও জেনিংস (Jennings) এর মতে কনজ্যুগেশানের ফলে যথার্থ সঞ্জীবন লাভ হয় না।

(2) নিউক্লিয় বস্তুর পুনর্বিন্যাস (Nuclear reorganization) ঃ কনজ্যুগেশানের ফলে নিউক্লিয় বস্তুর পুনর্বিন্যাস ঘটে এবং নিউক্লিয়াসের এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ভারসাম্য পুনঃস্থাপিত হয়।

(3) বংশগতিগত প্রকরণ (Hereditary Variation) ঃ অনেকগুলি দ্বিবিভাজন জননের পর কনজ্যুগেশান ঘটিবার ফলে জনিতৃর মধ্যে বর্ণসংকর প্রকরণের উদ্ভব হয়। ইহার ফলে তাহাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সহিত নিজেদের মানাইয়া লইতে সক্ষম হয়।

বিজ্ঞানী জেনিংস (**Jenning's**) এর পরীক্ষা হইতে বোঝা যায় কনজ্যুগেশানের ফলেই প্রভেদ বজায় থাকে।

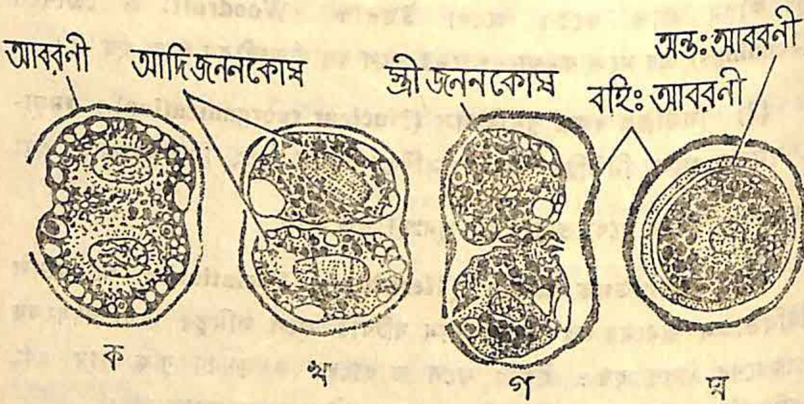
(iii) অটোমিক্সিস্ (Automixis) ঃ হার্টম্যান (**Hartmann**) ইহার সংজ্ঞা দেন। ইহা একই নিউক্লিয়াস হইতে সৃষ্ট দুইটি গ্যামেটিক নিউক্লিয়াই এর মিলন।

অটোমিক্সিস নিম্নলিখিত প্রকারের হয়—

1. অটোগামী (Autogamy) ঃ এই প্রক্রিয়ায় দুইটি মিলনরত গ্যামেটিক অথবা প্রো-নিউক্লিয়াই একই কোষের মধ্যে থাকে। প্রক্রিয়াটি কনজ্যুগেশানের সহিত তুলনীয়। **মিক্সোসোমা (Myxosoma)**, স্ফিওমিক্সা এবং কিছু মাইক্রো স্পোরিডিয়াদের মধ্যে এই প্রক্রিয়াটি সচরাচর দেখা যায়। বিজ্ঞানী ডিলার (**Diller**) 1936 খ্রীষ্টাব্দে, প্যারামিসিয়াম অরেলিয়া (**Paramaecium aurelia**)-র মধ্যে প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করিয়া বর্ণনা দেন।

2. পিডোগামী (Paedogamy) ঃ একই মাতৃকোষ হইতে আগত দুইটি ভিন্ন কোষের প্রো-নিউক্লিয়াসের মিলনকে পিডোগামী বলা হয়। ব্লার (**Blar, 1922**), এক্টিনোফ্রিস সল্ (**Actinophrys sol**)-এ প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করিয়া বর্ণনা দেন। ইহা ছাড়া কিছু কিছু মিক্সোস্ পোরিডিয়ার মধ্যে এই প্রক্রিয়াটি দেখা যায়। এই প্রক্রিয়ার ফলে জাইগোটটি ডিপ্লয়েড হয় এবং

ইহার চারিধারে একটি শক্ত সিস্ট্ (cyst) তৈয়ারী করে।



চিত্র নং-88 অ্যাকটিনোফিরিজের পিডোগামীর বিভিন্ন পর্যায়

(3) **সাইটোগামী (Cytogamy)** ঃ কনজ্যুগেশানের ন্যায় দুইটি প্রাণীই জোড়ায় মিলিত হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় প্রো-নিউক্লিয়াই-এর কোন আদান প্রদান ঘটে না। অটোগামীর ন্যায় এখানেও নিউক্লিয়াই-এর মিশ্রন হয়।

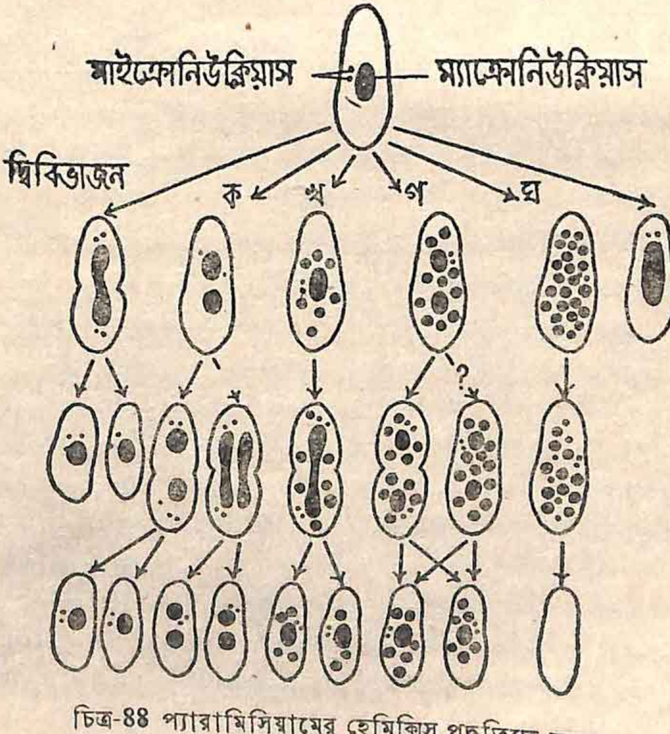
(iv) **অন্তঃসমন্বয় (Endomixis)** ঃ যখন কনজ্যুগেশান হয় না, সেই সময়ে এই প্রক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রক্রিয়ার ফলে নিউক্লির বস্তুর আদান প্রদান ঘটিয়া থাকে। মিওসিস এবং প্রো-নিউক্লিয়াই-এর মিশ্রন এই প্রক্রিয়ায় ঘটে না, তাই কনজ্যুগেশান হইতে ইহা পৃথক ধরণের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি সাধারণতঃ নীচ ধরনের সিলিয়াটা মধ্যে দেখা যায়। কনজ্যুগেশানের বিকল্প হিসাবে, এই প্রক্রিয়ায় সম্ভবতঃ ক্লান্ত মেগা নিউক্লিয়াসের পুনর্গঠন সম্ভব হয়।

(v) **হেমিক্সিস্ (Hemixis)** ঃ বিজ্ঞানী ডিলার (Diller) বিভিন্ন প্যারামিসিয়ামে (**প্যারামিসিয়াম অরেলিয়া, প্যারামিসিয়াম কডাটাম, প্যারামিসিয়াম মাল্টি মাইক্রোনিউক্লিয়েটাম**) লক্ষ্য করেন যে, একটি প্রাণীর মেগানিউক্লিয়াস ইহার দেহ হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ (ক্রোমাটিন বল) সাইটোপ্লাজমে পরিত্যাগ করে। পরে এইগুলি সাইটোপ্লাজমেই বিলীন হয়। মাইক্রোনিউক্লিয়াসের এই প্রক্রিয়ার কোন ভূমিকা নেই। পরবর্তীকালে মেগানিউক্লিয়াসের অবশিষ্ট্যাংশ ও মাইক্রো-নিউক্লিয়াস স্বাভাবিকভাবে কাজ করে, ডিলারের মতে, বর্জ্যবস্তু ত্যাগ

করিয়া মেগানিউক্লিয়াস এইভাবে তাহার দেহশুদ্ধি (Purification) করে। (চিত্র নং ৪৪)

3. অপুংজনি বা পার্থেনোজেনেসিস (**Parthenogenesis**) : এক্টিনোফিস (**Actinophrys**)-এ যে জননকোষগুলি আড়াআড়িভাবে নিষেকে সক্ষম হয় না, তাহাদের মধ্যে অপুংজনি দেখা যায়। ক্লামিডোমোনাস (**chlamydomonas**) এবং অন্যান্যদের যখন সিনগ্যামী হয় না তখন ইহাদেরও অপুংজনি ঘটিয়া থাকে।

4. প্লাসমোগ্যামী (**Plasmogamy**) : কিছু কিছু আদ্যপ্রাণীতে দুই বা ততোধিক প্রাণী নিজেদের মধ্যে সাইটোপ্লাজমের মিশ্রণ ঘটাইয়া একটি প্লাসমোডিয়াম সৃষ্টি করে, যাহার মধ্যে নিউক্লিয়াইগুলি সুস্পষ্ট থাকে। পরে ইহারা পৃথক হয়। ইহাকেই প্লাসমোগ্যামী বলা হয়। কখনও কখনও এই প্রক্রিয়া পরিপাকেও সাহায্য করে।



চিত্র-৪৪ প্যারামিসিয়ামের হেমিক্সিস পদ্ধতিতে জনন

5. পুনরুৎপত্তি বা রিজেনোরেশান (Regeneration) ঃ বেশীর ভাগ আত্মপ্রাণী তাহাদের হারানো অংশগুলির পুনরুৎপাদনে সক্ষম হয়। সাধারণতঃ ইহা বিভাজন এবং এনসিস্টমেণ্ট-এর সময় দেখা যায়। পরজীবি আত্মপ্রাণীর কিছুটা এই ক্ষমতা থাকে। নিউক্লিয়াসই এই ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে।

নবম অধ্যায়

আদ্যপ্রাণীর বিভিন্ন জৈবনিক কার্য

আমরা জানি, আদ্যপ্রাণীর সমগ্র দেহ একটি মাত্র কোষ লইয়া গঠিত। ইহাদের কোনও বিশেষ অঙ্গ বা তন্ত্র নাই। দেহের একটি মাত্র কোষই বিভিন্ন জৈবনিক কার্য (যথা—খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, শ্বসন, রেচন, প্রজনন ইত্যাদি) সম্পন্ন করে। কোন বহুকোষী প্রাণীর একটিমাত্র কোষের সহিত ইহার তুলনা করা চলেনা। তাহার কারন, বহুকোষী প্রাণীর একটিমাত্র কোষ একটি বিশেষ ধরণের কাজ সমাধা করে। সুতরাং ইহারা এককোষী হইলেও এই কোষের কাজ খুব সরল নয়।

আদ্যপ্রাণীর বিভিন্ন জৈবনিক কার্যের প্রধান ক্রিয়াকলাপ গুলি পূর্বোক্ত অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এখানে অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

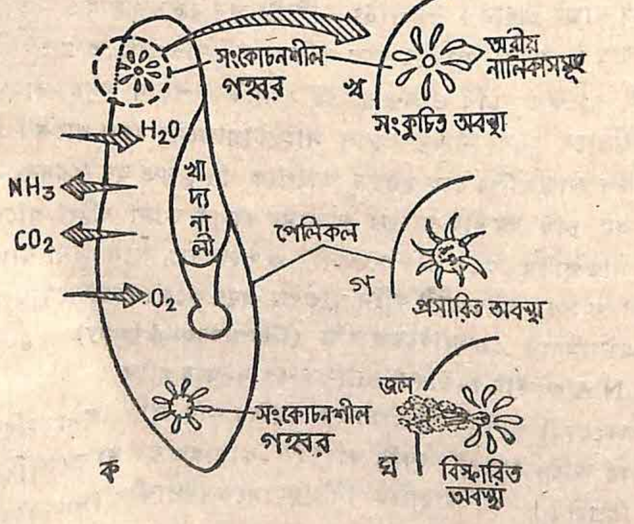
আদ্যপ্রাণীর **সাইটোপ্লাজমে** বিভিন্ন অঙ্গাংশ ও রাসয়নিক পদার্থ দেখা যায়। **সঞ্চিত খাদ্য** যাহা সাইটোপ্লাজমে বর্তমান তাহার মধ্যে শর্করাও চর্বি জাতীয় খাদ্যই প্রধান। কদাচিৎ নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থও ইহাদের সহিত দেখা যায়। শর্করা জাতীয় খাদ্য অধিকাংশ আদ্যপ্রাণীতে গ্লাইকোজেন রূপে সঞ্চিত থাকে। চর্বি ও অন্যান্য এই সম্পর্কিত পদার্থ সমূহ দানা আকারে বিক্ষিপ্তভাবে অথবা নির্দিষ্ট অঞ্চলে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থাকে। উত্তেজনায় যে সকল আদ্যপ্রাণীর দেহ হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হয় (যেমন, নক্টিলিউ-কা) এই চর্বি জাতীয় খাদ্যের জারনের ফলেই তাহা ঘটিয়া থাকে। কিছু কিছু আদ্যপ্রাণীর ক্ষেত্রে সঞ্চিত প্রোটিন ও সাইটোপ্লাজমে দেখা যায়। বিশেষ করিয়া যে সকল আদ্যপ্রাণী কঠিন খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। উল্লেখযোগ্য, আবরণী-বদ্ধ এণ্টামিবার **ক্রোমাটয়েড বডি (Chromatoid body)** বস্তুতঃ প্রোটিন ও **R.N.A** জাতীয় নিউক্লিক অ্যাসিড-এর সমন্বয়ে গঠিত।

এককোষী প্রাণীর **নিউক্লিয়াসও** বহুবিধ কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। সংখ্যায় অধিকাংশেরই একটি, কাহারও কাহারও দুই বা ততোধিক নিউক্লি-য়াস বিদ্যমান। বড় আকৃতির নিউক্লিয়াসকে বিপাকীয় **(metabolic)** এবং

ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসকে জনন (**reproductive**) নিউক্লিয়াস বলা হয়। আকৃতি অনুযায়ী নিউক্লিয়াস তিনটি শ্রেণীতে পড়ে। যেমন, ভেসিকুলার (**vesicular**), ম্যাসিভ (**massive or compact**) এবং পলিনারজিড (**Polynergid**)। নিউক্লিয় পর্দা (**nuclear membrane**) দ্বারা নিউক্লিয়াসটি বেষ্টিত থাকে এবং ইহার ভিতরে থাকে ক্রোমাটিন বস্তু (**Chromatin material**)। নিউক্লিয়াসই দেহের সমস্ত কার্য পরিচালনা করে।

সাইটোপ্লাজমের ভিতরের দানাদার ও অপেক্ষাকৃত তরল অংশে অর্থাৎ অন্তঃপ্লাজমে খাদ্যগহ্বর ছাড়া যে গহ্বরগুলি থাকে তাহাকে সংকোচনশীল গহ্বর (**contractile vacuole**) বলে। প্রোটোপ্লাজমের জলীয় অংশের পরিমান নিয়ন্ত্রন ও বিপাকীয় কার্যের ফলে উদ্ভূত জলীয় রেচন পদার্থ এবং অতিরিক্ত ও অপ্রোজনীয় জল দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিবার জন্যই সংকোচনশীল গহ্বর গঠিত হয়।

সংকোচনশীল গহ্বর ও জলের সাম্যতা রক্ষা Contractile vacuole and osmoregulation) : মিঠাজলের বসবাসকারী বেশীর ভাগ আদ্যপ্রাণীর সংকোচনশীল গহ্বর দেখা যায়। এমনকি লোনা জলে বসবাসকারী



চিত্র-89 অ্যামিবার রেচন পদার্থের নিষ্কাশন ও জলসাম্য নিয়ন্ত্রন

সিলিয়েটদেরও এই গহ্বর থাকে। পরজীবি আদ্যপ্রাণীতে (সিলিয়েট ব্যতীত) এই গহ্বর একদমই থাকে না।

অ্যামিবার সংকোচনশীল গহ্বর অনাবশ্যক জল দেহের বাহিরে নিষ্কাশনে সাহায্য করে, তাহার ফলে দেহের জলীয় ভারসাম্য বজায় থাকে। গোলাকৃতি ভেসিকল পুরু পর্দা (0.5μ) দ্বারা আবৃত থাকে। এই গহ্বরের চারিধারে মাইটোকনড্রিয়া উপস্থিত থাকিতে পারে। সংকোচনশীল গহ্বর প্রথমে আকারে ছোট থাকে, ক্রমশঃ জলীয় পদার্থ জমা হওয়ায় আকারে বর্ধিত হয়। এক সময় ইহা বিদির্ণ হয় ও ভিতরের পদার্থ দেহের বাহিরে যায়।

রেচন—(Excretion) : ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রবীভূত বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ আদ্যপ্রাণীর দেহ হইতে নিষ্কাশিত হয়। সামুদ্রিক এবং অন্তঃ-পরজীবি আদ্যপ্রাণীর দেহের সমস্ত তল হইতেই রেচন ঘটে। মিঠা জলের আদ্যপ্রাণীতে সংকোচনশীল গহ্বরের জলীয় পদার্থের নিষ্কাশনের সঙ্গে দ্রবীভূত কার্বনডাইঅক্সাইডও নিষ্কাশিত হয়। এই সব আদ্যপ্রাণীর সংকোচনশীল গহ্বরকে **রেচন গহ্বর (Excretory vacuole)** নামেও অভিহিত করা হয়।

শ্বসন (Respiration) : স্বাধীনজীবি এবং পরজীবি (রক্ত ও অন্যান্য কলায় বসবাসকারী) আদ্যপ্রাণীতে সবাত শ্বসন ঘটিয়া থাকে। এই প্রকার শ্বসনে গ্লুকোজ জারিত হইয়া জল ও কার্বনডাইঅক্সাইড তৈয়ারী হয়। দুইটি পদক্ষেপ—প্রথমে, গ্লাইকোলাইসিসের মাধ্যমে পাইরুভিক অ্যাসিড তৈয়ারী হয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপে ক্রেবস চক্রের শেষে এই পাইরুভিক অ্যাসিড পরিবর্তিত হইয়া জল ও কার্বনডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। অন্ত্রে বসবাসকারী পরজীবিদের অবাত শ্বসন শর্করার বিনিময়ে ঘটিয়া থাকে। এই প্রকার শ্বসনে কম শক্তি উৎপন্ন হয়।

দশম অধ্যায়

আদ্যপ্রাণীর বহিরাবরণ ও কংকাল, আদ্যপ্রাণীর পরজীবিতা ও আদ্যপ্রাণীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বহিরাবরণী ঃ অনেক আন্থপ্রাণীর দেহকোষের বাহিরে বিশেষ বহিরাবরণী, খোলক বা কংকালতন্ত্র থাকে। আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী আন্থপ্রাণী টেকটিন নামক মিউকাস জাতীয় পদার্থ নিঃসৃত করিয়া বহিরাবরণী গঠন করে বা দেহকে কোন জিনিষের সহিত আটকাইয়া রাখে। বেশীরভাগ আদ্যপ্রাণী জৈবপদার্থ, জিলেটিন, সেলুলোজ, ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও সিলিকা দ্বারা গঠিত হয়।

(1) প্লাজমাপর্দা (**Plasmalemma**) ঃ কতিপয় আদ্যপ্রাণীর নির্দ্দিষ্ট বহিরাকৃতি থাকে না। এই সকল আদ্যপ্রাণীর নির্দ্দিষ্ট বহিরাবরণী বা বহিঃপ্লাজম থাকে না। এইসকল ক্ষেত্রে দেহের বাহিরে একটি পাতলা প্রোটোপ্লাজম নির্মিত অস্থায়ী পর্দা থাকে, তাহাকে প্লাজমাপর্দা বলে। এই প্লাজমাপর্দা ও বাহ্যিক পরিবেশের মধ্যে খাদ্য ও গ্যাসের আদানপ্রদান হয়।

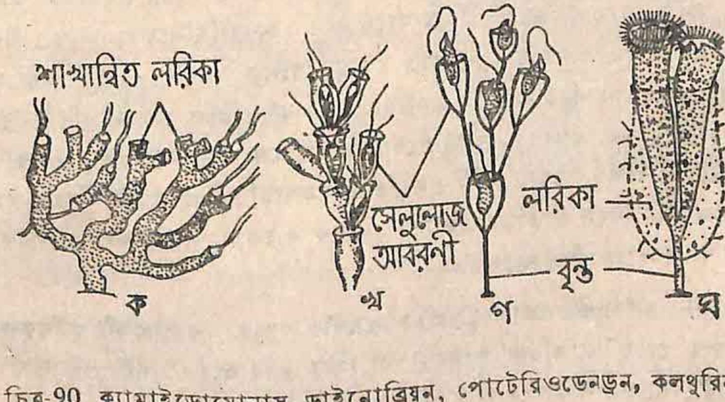
(2) পেলিকল (**Pellicle**) ঃ বেশীরভাগ আদ্যপ্রাণীর একটি নির্দ্দিষ্ট বহিরাকৃতি থাকে। সাধারণতঃ দেহস্থ সাইটোপ্লাজমের বাহিরে একটি আবরণী থাকে, তাহাকে পেলিকল বা পেরিপ্লাষ্ট বলে। এই পেলিকল দেহকে রক্ষা করে। অনেকসময় এই পেলিকল পাতলা, সংকোচন-প্রসারণশীল হয় এবং চলনে সাহায্য করে। কিন্তু সাধারণতঃ পেলিকল পুরু হয় এবং দেহকে একটি নির্দ্দিষ্ট আকার দিতে সাহায্য করে। সাধারণতঃ ফ্লাজেলাযুক্ত আদ্যপ্রাণীর পেলিকল পুরু হয় এবং অনেক সময় পেলিকলের রূপান্তর ঘটে। যেমন, প্যারামিসিয়ামের পেলিকল ষড়ভূজাকৃতি প্লেট, কোলিপসে (Coleps) উঁচু প্লেট এবং ভর্টিসেলাতে উঁচু গোলকার অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। পেলিকল রূপান্তরিত হইয়া কিউটিকলে পরিণত হয়। পেলিকল সজীব পদার্থ কিন্তু কিউটিকল্ মৃতপদার্থ। যেমন, মনোসিসটিসের কিউটিকল নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থ ও কাইটোম্যাসটিজিনার কিউটিকল শর্করাজাতীয় পদার্থ

দ্বারা তৈয়ারী হয়।

কংকালতন্ত্র (Skeleton) ঃ

(1) **থিকা (Theca) ঃ** দেহকোষকে ঘিরিয়া প্রথম যে শক্ত আবরণী গঠিত হয় তাহাকে (Theca) বলে। ডায়ানোফ্লাজেলেট আদ্যপ্রাণীর থিকাতে কাঁটার মতো অংশ এবং সেরাটিয়াম (ceratium) ও গনিঅলাক্স (Gonyaulux) এর ক্ষেত্রে বহুভূজাকৃতি সেলুলোজ নির্মিত প্লেট থাকে। এই বহিরাবরণীকে উদ্ভিদকোষের কোষপ্রাচীরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। থিকা একটি বা একাধিক স্তর লইয়া গঠিত হয়। থিকা দুইটি খোলক বা অসংখ্য প্লেট দ্বারা নির্মিত হইতে পারে। থিকার বহিঃস্থপ্রাশ্ব অনেক সময় চিত্র বিচিত্র হয়।

(2) **লরিকা বা আবরণী (Lorica or envelope) ঃ** দেহকে ঘিরিয়া একটি বড় হালকা, স্বচ্ছ আবরণী থাকে। এই আবরণী কাপ, ফানেলের বা ঘণ্টার মত হয়। এই আবরণী শাখাযুক্ত বা শাখাবিহীন হয়। এই আবরণীকে লরিকা বলে। লরিকার অগ্রভাগে একটি বড় ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রপথে দেহ হইতে সিলিয়া বা ফ্লাজেলা বাহির হয়। আত্মপ্রাণীর কলোণীতে লরিকা সরাসরি বা ছোট বৃন্তের সহিত পরস্পর যুক্ত থাকে। এই লরিকা টেকটিন বা বালি দ্বারা তৈয়ারী হয়। ষ্টেনটরের লরিকা জেলির মত থক্‌থকে পদার্থ দ্বারা গঠিত।



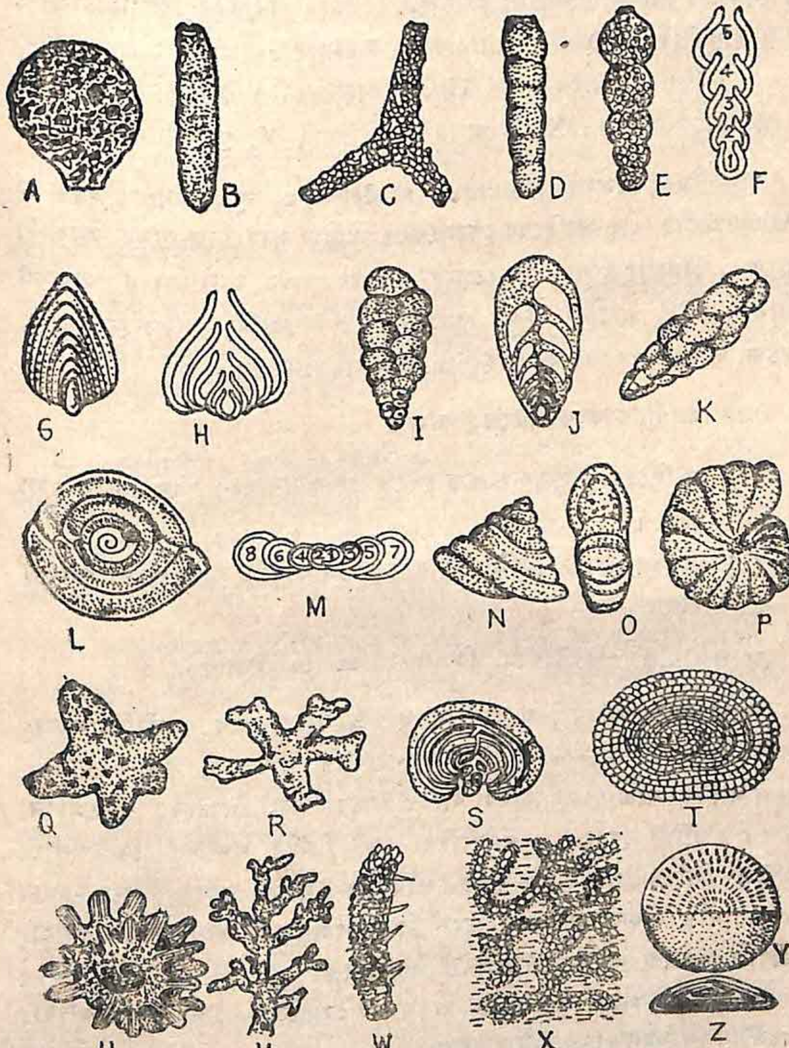
চিত্র-90 ক্ল্যামাইডোমোনাস, ডাইনোব্রিয়ন, পোটেরিওডেনড্রন, কলথুরিনা

(3) খোলক (Shell) ঃ দেহের বাহিরে একটি শক্ত খোলক থাকে। গ্লোবোসা, ফিলোসা ও ফোরামিনিফেরাতে সাধারণতঃ খোলক থাকে। খোলকের উপর অসংখ্য ছিদ্র থাকে, এই ছিদ্র পথে অসংখ্য ক্ষণপদ বাহির হয়। খোলকের আকার, গঠন, প্রকৃতি বিভিন্ন ধরণের হইতে পারে। এই খোলক কাইটিন অথবা টেকটিন দ্বারা গঠিত হইতে পারে। ইহা সাধারণতঃ বালুকা, ডায়টম খোলক, কাইটিন ও টেকটিন দ্বারা গঠিত হয়। **Haliphysma**র বাহিরের খোলকে স্পঞ্জের কাঁটা এবং **Technitella** তে কণ্টকত্বক প্রাণীর প্লেট থাকে। অনেক আদ্রপ্রাণীর খোলক সেলুলোজ দ্বারা গঠিত হইতে পারে।

ইউগ্লাইফাতে **(Euglypha)** বহিরাবরণীর জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ অন্তঃপ্লাজম নিঃসৃত করে। এই নিঃসৃত পদার্থ বিভাজন বা আবরণীবদ্ধতার সময় দেহের বাহিরে আসে এবং খোলক গঠন করে।

ফোরামিনিফেরার খোলক প্রধাণতঃ ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্বারা গঠিত। অনেক সময় কাইটিন দ্বারা গঠিত হয়। কিছু কিছু প্রজাতিতে সিলিকানির্মিত খোলক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক প্রজাতির বাহিরের খোলক বালুকা, স্পঞ্জের কাঁটা, পরিত্যক্ত আবরণী **(test)** ও বর্জ্য পদার্থ দ্বারা তৈয়ারী হয়। এইগুলি পরস্পর কাইটিনের সহিত যুক্ত হইয়া খোলকের সৃষ্টি করে। মাইক্রোগ্রোমিয়া, ক্ল্যামাইডোফিরিজ ইত্যাদি আদ্যপ্রাণীর একটি খোলক থাকে। এই খোলক হইতে একটি সাধারণ ছিদ্রপথে ক্ষণপদ বাহির হয়। অ্যালোগ্রোমিয়াতে খোলকের বাহিরে একটি পাতলা প্রোটোপ্লাজমের বহিরাবরণ সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ খোলকটি আর বাহিরে থাকে না। ফোরামিনিফেরা আদ্যপ্রাণীর জীবনের প্রথম অবস্থায় একটিমাত্র ছোট খোলক থাকে, পরবর্তী পর্যায়ে একাধিক খোলক গঠন করে। একটিমাত্র খোলক থাকিলে **মোনোলকিউলার** ফোরামিনিফেরা বলে। একাধিক খোলক থাকিলে **মালটিলকিউলার** ফোরামিনিফেরা বলে। কোনকোন প্রজাতিতে সমআকৃতির বহুখোলক থাকে বা অনেক সময় বিষম আকৃতির একাধিক খোলক থাকে। এই সকল খোলকে এক বা একাধিক ছিদ্র থাকে।

(4) আবরণীবদ্ধতা (Cyst) ঃ বেশীর ভাগ আদ্যপ্রানী প্রতিকূল অবস্থায় দেহে অতিরিক্ত আবরণী বা সিস্ট্ গঠন করে। এই আবরনী অস্থায়ী, অনুকূল পরিবেশে আবরণী নষ্ট হইয়া যায়।



চিত্র-91 ফোরামিনিফেরার বিভিন্ন ধরণের খোলক :

E F–নোডোসেরিয়া ; G, H-ফনডিকিউলেরিয়া ; I, J-টেকসটিউলেরিয়া

A-ম্যাকামিনা ; B-ব্যাথাইসাইফন ; C-র‍্যাবডামিনা ; D-হাইপারমিনা ;

K-ডারনিউলিনা ; L, M-স্পাইরোসেকিলিনা ; N, O-টু রিস্পাইরিলিনা ; P-সাইক্লিয়ামিনা ; Q-সিউডাষ্ট্রোরাইজা ; R-অ্যাসট্রোরাইজা ; S-প্যাভোনিনা T-ডিসকোস্পাইরুলিনা ; U-ক্যালক্যারিনা ; V-ডেনড্রোফিরা ; W-ম্যাকোরাইজা ; X-রাইজোনিউবেকিউলা ; Y, Z-নিউমিউলাইট ; ।

(5) অন্তঃকংকাল (**Internal skeleton**) : পূর্বেই বলা হইয়াছে Allogramia তে বাহিরের খোলককে ঘিরিয়া সাইটোপ্লাজমের আবরণী থাকে। Hastigerina তে প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট নির্মিত কণ্টক থাকে। কিছু আদ্রপ্রাণীতে অন্যপ্রাণীর পরিত্যক্ত খোলক, কণ্টক, ও প্লেট দেহকোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে।

আদ্যপ্রাণীতে কংকালতন্ত্রের কাজ :

(1) বাহিরের আক্রমণ ও শত্রু হইতে এই বহিরাবরণ আদ্যপ্রাণীকে রক্ষা করে।

(2) দেহের একটি নির্দ্দিষ্ট আকৃতি গঠন করিতে বহিরাবরণী সাহায্য করে।

আদ্যপ্রাণীর পরজীবিতা (Parasitism in Potozoa :

আদ্যপ্রাণীপরজীবি ও স্বাধীজীবি হইতে পারে, তবে পরজীবির সংখ্যা স্বাধীনজীবি অপেক্ষা কম। এই সকল পরজীবি আদ্যপ্রাণী অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে থাকিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া থাকে এবং পোষকের ক্ষতিসাধন করে। প্রতিটি পোষক ও পরজীবির একটি নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ নির্দিষ্ট পোষক ছাড়া পরজীবির জীবনচক্র সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আদ্যপ্রাণীর সকল শ্রেণীতেই পরজীবি পাওয়া যায় তবে স্পোরোজোয়া শ্রেণীর অন্তর্গত সকল আদ্যপ্রাণীই পরজীবি।

পরজীবির গঠন, বাসস্থান ও স্বভাব-বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করিয়া পরজীবি বিভিন্ন রকমের হইতে পারে।

পরজীবি আদ্যপ্রাণীর প্রকারভেদ (Kinds of Parasitic Protozoa) :

(i) বহিঃপরজীবি : যে সকল পরজীবি প্রাণী পোষকের দেহের বাহিরে থাকে তাহাকে এপিজয়িক (epizoic) বা বহিঃপরজীবি আদ্যপ্রাণী বলে।

উদাহরণ—ক্লাইড্রামি বা হাইড্রোক্সেনা (**Hydramoeba hydroxena**) হাইড্রার বহিঃস্তকে থাকে। মাছের বহিঃস্তকে অনেক পরজীবি আদ্যপ্রাণী বাসকরে।

(ii) অন্তঃপরজীবি : যে সকল পরজীবি প্রাণী পোষকের দেহ অভ্যন্তরে বাস করে তাহাদের অন্তঃপরজীবি আদ্যপ্রাণী বলে। ইহারা আবার বিভিন্নরকমের হইতে পারে।

(a) সিলোজয়িক (Coelozoic) : যে সকল অন্তঃপরজীবি প্রাণীর দেহ গহ্বরে বাস করে, তাহাদের সিলোজয়িক বলে। ইহারা নিম্নলিখিত প্রকারের হয়—

1. **খাদ্যনালীর পরজীবি প্রাণী :** অনেক অন্তঃপরজীবি আদ্যপ্রাণী খাদ্যনালীতে বাস করিয়া পুষ্টিসাধন করে। যেমন, এন্টামিবা হিস্টোলিটিকা, জিয়ার্ডিয়া ইনটেসটিনালিস, আইসোপোরা হিমিনিস ও ব্যালানটিডিয়াম কোলাই ইত্যাদি মানুষের অন্ত্রে পরজীবি হিসাবে বাস করে।

2. **মুখগহ্বরের পরজীবি আদ্যপ্রাণী :** অনেক আদ্যপ্রাণী মুখগহ্বরে বাস করে। যেমন, এন্টামিবা জিনজিভ্যালিস, ট্রাইকোমোনাস টেনাক্স প্রভৃতি আদ্যপ্রাণী মানুষের মুখগহ্বরের চোয়াল ও দাঁতের ফাঁকে থাকে।

3. **জনন নালীতে পরজীবি আদ্যপ্রাণী :** ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাই-নালিস মানুষের স্ত্রীজননতন্ত্রের যোনিতে বাস করে।

(b) সাইটোজয়িক (Cytozoic) : যে সকল আদ্যপরজীবি প্রাণী অন্ত্রের প্রাচীর গাত্রের কোষের মধ্যে বা অন্তঃকোষ অঞ্চলে থাকে, তাহাদের সাইটোজয়িক আদ্যপ্রাণী বলে। যেমন, প্লাসমোডিয়াম, লিস্‌ম্যানিয়া ব্যাবেসিয়া ও ট্রাইপানোসোমা মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তিকণিকায় পরজীবি হিসাবে বাস করে। আইমেরিয়া, আইসোপোরা, এপিথেলিয়াল কোষে থাকে।

(c) হিস্টোজয়িক (Histozoic) : অনেক অন্তঃপজীবি আদ্যপ্রাণী কোষমধ্যবর্তী অঞ্চলে থাকিয়া পুষ্টিসাধন করে। ইহাদের ইন্টারসেলুলার (**Intercellular**) অথবা হিস্টোজয়িক পরজীবি বলে।

(iii) হাইপার প্যারাসাইট (Hyperparasite) : অনেক পরজীবি আদ্যপ্রাণীর উপর অন্য আদ্যপ্রাণী পরজীবি হিসাবে খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য নির্ভর করে। ইহাদের হাইপার প্যারাসাইট বলে। যেমন, ব্যাঙের অন্ত্রে অবস্থিত ওপালিনার উপর অন্য অ্যামিবা পরজীবি হিসাবে থাকে। টোড-ফিস্ (Toad fish)-এ অবস্থিত স্ফিরোসফোরা আদ্যপ্রাণীকে নোসেমা নোটাবিলিস (Nosema notabilis)-ক্ষতি করে। একটি পরজীবি আর একটি পরজীবি দ্বারা আক্রান্ত হইবার ঘটনাকে হাইপার প্যারাসিটিজম (Hyperparasitism) বলে।

নির্দিষ্ট পোষকের মধ্যে বাস (Host specificity) : সাধারণতঃ দেখা যায় একটি পরজীবি প্রাণী নির্দিষ্ট পোষকের দেহে বাস করে এবং জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে। যেমন, প্লাসমোডিয়াম, এণ্টামিবা, ওপালিনা নির্দিষ্ট পোষকের মধ্যে পাঁওয়া যায়। কিন্তু কিছু পরজীবি একাধিক পোষকের দেহে থাকে বা জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে।

সংক্রমনের উপায় (Modes of transfer) : একটি পরজীবি আদ্যপ্রাণীর জীবনচক্র দুইটি পোষকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এই দুইটি পোষক একই প্রকার বা বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। একটি পোষক হইতে নতুন পোষকে পরজীবির সংক্রমণ নিম্নলিখিত উপায়ে হয়—

(i) সক্রিয় সংক্রমন (Active migration) : সক্রিয় সংক্রমণ প্রধানতঃ জলজ পোষকের ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন, ইকথিওপথিরিয়াস মাছের বহিঃপরজীবি, একটি মাছ হইতে বাহির হইয়া জলের মাধ্যমে নতুন মাছকে আক্রমণ করে।

(ii) সরাসরি সংক্রামণ (Direct transfer) : আমরা জানি মানুষের দাঁতের চোয়ালে এণ্টামিবা জিনজিভ্যালিস অন্তঃপরজীবি হিসাবে বাস করে। ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনালিস স্ত্রীমানুষের ক্ষেত্রে যোনিতে বাস করে। চুম্বন বা সংগমের সময় এই পরজীবি এক পোষকের দেহ হইতে অপর পোষকে সংক্রামিত হয়।

(iii) আকস্মিক সংক্রমণ (Casual contaminative infecction) : খাদ্যও পানীয়ের মাধ্যমে সংক্রমণ হইলে Contaminative infection বলা

হয়। যেমন, এন্টামিবা হিস্টোলিটিকার আবরণীবদ্ধ (Cyst) অবস্থা খাদ্য ও পানীয়ের সহিত সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করে ও পূর্ণাংগ অবস্থায় পরিণত হয়।

(iv) প্রাণীর মাধ্যমে সংক্রমণ (Inoculative transfer) : ইহারা সাধারণতঃ মশকীর দংশনের মাধ্যমে এক পোষকের দেহ হইতে অন্য পোষকে স্থানান্তরীত হয়। যেমন, স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার দংশনে স্পোরোজয়েট (প্লাসমোডিয়ামের) মানুষের সংবহনে প্রবেশ করিয়া প্রথমে যকৃত ও পরে লোহিত কণিকাতে প্রবেশ করে এবং প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স পূর্ণাংগ অবস্থায় পরিণত হয়।

(v) বংশগত সংক্রমণ (Congenital transfer) : বংশগত ভাবে জন্মের পূর্বে বা জন্মমূহূর্তে মাতৃজীব হইতে অপত্যজীবে পরজীবি সংক্রামিত হয়। অনেকসময় মানুষের ক্ষেত্রে প্লাসেন্টার মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার জীবাণু সন্তানের মধ্যে প্রবেশ করে, ইহাকে **প্লাসেন্টা দ্বারা সংক্রামণ (Placental-transfer)** বলে। অনেক সময় ডিম্বের মধ্য দিয়া **নোসেমা বমবাইসিস্**, রেশমমথে সংক্রামিত হয়, ইহাকে **ডিম্বাণু সংক্রমণ (ovarion transfer)** বলে। ট্রাইপানোসোমার অনেকগুলি প্রজাতি মানুষের ক্ষেত্রে শিশুর মাতৃদুগ্ধ পানের সময় দুধের সহিত মায়ের দেহ হইতে শিশুর দেহে সংক্রামিত হয়। ইহাকে **ল্যাকটিয়াল সংক্রমণ (Lacteal transfer)** বলে।

পোষক ও পরজীবির জীবনচক্র (Hosts aud Life cycle of Parasite) : অধিকাংশ আদ্যপ্রাণীর পরজীবির জীবনচক্রে অযৌন জনন বেশীক্ষন স্থায়ী হয়, যৌনজননের পর্যায়টি হয় সংক্ষিপ্ত। তাহাদের জীবনচক্র এক বা একাধিক ভিন্ন পোষকের দেহে সম্পূর্ণ হয়।

(i) মনোজেনেটিক (Monogenetic) : অধিকাংশ পরজীবি আদ্যপ্রাণীর জীবনচক্রের বেশীরভাগ একটিমাত্র পোষকের দেহে অতিবাহিত হয়। কিছুক্ষণের জন্য পোষক দেহের বাহিরে আসিয়া নতুন পোষকে প্রবেশ করে। যেমন, এন্টামিবা হিস্টোলিটিকা, ট্রাইকোমোনাস হোমিনিস, আইমেরিয়া ও ব্যালানটিডিয়াম একটি পোষকের দেহে বেশী সময় থাকে, তাহার পর আবরণীবদ্ধ অবস্থায় পোষকের দেহের বাহিরে আসিয়া নতুন পোষকে সংক্রামিত হয়। নতুন পোষকে আবরণীহীনতা ঘটাইয়া পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পরিণত হয়। এই ধরনের জীবনচক্রকে মনোজেনেটিক জীবনচক্র বলে।

(ii) ডাইজেনেটিক (Digenetic) : অনেক পরজীবি আদ্যপ্রাণী দুইটি ভিন্ন ধরনের পোষকের মাধ্যমে জীবচক্র সম্পূর্ণ করে। ইহাকে ডাইজেনেটিক জীবনচক্র বলে। ইহাদের যৌন ও অযৌন জনন দুইটি ভিন্ন ধরনের পোষকে ঘটে। এই সকল ক্ষেত্রে একটি পোষক মেরুদণ্ডী ও অপরটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী হয়। দুই ধরনের পোষক আছে—যথা, মুখ্যপোষক ও গৌনপোষক। যে পোষকের দেহে পরজীবির যৌনজনন সম্পন্ন হয়, তাহাকে মুখ্যপোষক বলে। গৌনপোষকের ক্ষেত্রে পরজীবির অযৌন জনন সম্পন্ন হয়। অনেক পোষক পরজীবিকে সংক্রমণ করিতে সাহায্য করে, তাহাদের ভেক্টর (Vector) বা বাহক (carrier) বলে। যেমন, ম্যালেরিয়া রোগ মানুষের হয়। স্ত্রী এনোফিলিস মশা এই রোগের বীজানুর বাহক হিসাবে কাজ করে। যদি এই বাহকের মধ্যে পরজীবির জীবনচক্র ঘটে, তবে তাহাকে চক্রাকার (cyclical) সংক্রমন বলে। যদি বাহকের মধ্যে জীবনচক্র অতিবাহিত না হয়, তবে তাহাকে যান্ত্রিক সংক্রমণ (mechanical transfer) বলে।

অনেক সময় হঠাৎ অন্য পোষকের দেহে পরজীবি প্রবেশ করিতে পারে তাহাকে এক্সিডেন্টাল (accidental) পোষক বলে। অনেক পরজীবি প্রাণী পোষকের মধ্যে থাকে, কিন্তু পোষকের কোন ক্ষতি করে না। এই পোষক শুধুমাত্র সংক্রমণে সাহায্য করে এবং ভিন্ন ধরনের পোষককে আক্রান্ত করিতে সাহায্য করে। যেমন, স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া রোগের বীজানু বহন করে কিন্তু নিজে এই রোগে আক্রান্ত হয় না। এই ধরনের পোষককে রিজার্ভয়ার (Reservoir) পোষক বলে।

পরজীবিতা জনিত পরিবর্তন (Effect due to Parasitism) :
যে সকল পরজীবি পোষকের দেহের মধ্যে বাস করে, তাহাদের বিভিন্ন-রকম আকৃতিগত ও জৈবনিক পরিবর্তন হয়। বিশেষতঃ যে সকল পরজীবি শোষণ পদ্ধতিতে নিজেদের পুষ্টিসাধন করে, তাহাদের আকৃতিগত পরিবর্তন বেশী ঘটে। ইহাদের বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মুখছিদ্র বা চলন অংগ থাকে না এবং কম অক্সিজেনের প্রভাবে যাবতীয় বিপাকীয় কার্য সম্পন্ন করে। আবার অনেকে নিজেদের দেহকে পোষকের দেহে আটকাইবার জন্য বিভিন্ন জিনিষ তৈয়ারী করে। অনেক অন্তঃপরজীবি পোষকের দেহের পরিবেশ হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য দেহের বাহিরে অতিরিক্ত আবরণী বা সিস্ট

(cyst) গঠন করে।

সকল পরজীবির জনন ক্ষমতা উন্নত ও দ্রুত। যাহাতে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়াও নিজেদের বংশ গতির প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখিতে পারে। অনেক পরজীবি আদ্যপ্রাণী মানুষের কোন ক্ষতি করে না, তাহাদের ক্ষতিকারকবিহীন পরজীবি অথবা **non pathogenic protozoa** বলে। ক্ষতিকারক পরজীবি আদ্যপ্রাণীকে প্যাথোজেনিক আদ্যপ্রাণী বলে।

আদ্যপ্রাণী ও আদ্যপ্রাণী ঘটিত রোগ ঃ

আদ্যপ্রাণী পরজীবি হিসাবে অন্যজীবের দেহে বাস করে এবং পুষ্টি গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা সৃষ্ট উপজাত বর্জ্য পদার্থ পোষকের দেহে জমা হয়। পরজীবির প্রভাবের ফলে পোষকের কতকগুলি গুন দেখা যায়। যেমন—

(i) সহ্যগুণহীন (Intolerant) ঃ অনেক পোষক প্রাণী পরজীবি প্রবেশ করা মাত্র তাহাদের ধ্বংস করিয়া ফেলে এই সময় শ্বেত কণিকার ভূমিকাই প্রধাণ। ইহাদের **সহ্যগুণহীন** পোষক বলে।

(ii) সহ্যগুণসম্পন্ন (To lerant) ঃ অনেক পোষক পরজীবি আদ্যপ্রাণীকে বহন করিবার ক্ষমতা অর্জন করে। পোষক দেহ এ্যান্টিবডি **(antibody)** তৈয়ারী করিয়া পরজীবির ক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ **(resistance)** গড়িয়া তোলে। ইহার ফলে, পরজীবিরা কম হিংস্র **(virulent)** হয়। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় পোষকের দেহে অভিযোজন ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। এই ক্ষেত্রে পরজীবিরা অতিমাত্রায় বংশবৃদ্ধি করে এবং পোষকের অনেক বেশী ক্ষতি করে। ইহাদের **সহ্যগুণসম্পন্ন** পোষক বলে।

(iii) সহ্যগুণবিহীন (Susceptible) ঃ অনেক সময় পরজীবির প্রভাব পোষক প্রাণী সহ্য করিতে পারে না। পরজীবি আদ্যপ্রাণী দ্রুত বংশবৃদ্ধি করিয়া পোষকের ক্ষতি করে এবং পোষকের জীবনীশক্তি হ্রাস পায়। এর ফলে পোষক রোগাক্রান্ত হয় এমন কি পোষকের মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে।

পরজীবির দ্বারা আক্রান্ত হইলে পোষক প্রাণীর যদি দ্রুত মৃত্যু ঘটে তবে পরজীবিরও মৃত্যু ঘটে বা সংক্রমন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু পরজীবির বিপরীতে যদি পোষক প্রতিরোধ **(resistance)** ক্ষমতা গড়িয়া তোলে, তবে পোষকের মৃত্যু ঘটে না বটে কিন্তু পরজীবির প্রাধান্য বাড়িয়া

যায় এবং নতুন পোষকে সংক্রমনের সম্ভাবনা থাকে।

প্যাথোজেনিক এবং নন্-প্যাথোজেনিক আদ্যপ্রাণী (Pathogenic and non-Pathogenic Protozha) ঃ

অনেক পরজীবি আদ্যপ্রাণী মানুষ বা অন্য প্রাণীর ক্ষতি করে না, কিন্তু অনেক আদ্যপ্রাণী বিশেষভাবে পোষকের ক্ষতি করে, তাহাদের প্যাথোজেনিক আদ্যপ্রাণী বলে। নীচে কয়েকটি ক্ষতিকারক আদ্যপ্রাণী, পোষক, রোগ ও সংক্রমনের উপায় আলোচনা করা হইল।

পরজীবির নাম	পোষকের নাম ও পরজীবির বাস করিবার স্থান	সৃষ্ট রোগ	সংক্রমণের উপায়
1. এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকা (**Entamoeba histolytica**)	মানুষ, কুকুর ও বিড়ালের অন্ত্রে বাস করে। ইহারা যকৃৎ, মস্তিষ্ক, ফুসফুস ও প্লীহাতেও প্রবেশ করে।	আমাশয়, যকৃৎ ও কোলনের ক্ষতি করে।	খাদ্য ও জলের সহিত সিস্টের মাধ্যমে প্রবেশ করে।
2. এণ্টামিবা কোলাই (**Entamoeba coli**)	মানুষের কোলন	অন্ত্রের ক্ষতি করে।	আটটি নিউক্লিয়াসযুক্ত সিস্টের মাধ্যমে প্রবেশ করে।
3. এণ্টামিবা জিনজিভ্যালিস (**Entamoeba gingivalis**)	মানুষের মুখ, দাঁত ও মাড়ি।	পায়োরিয়া ও মাড়ির ক্ষত	সরাসরি চুম্বনদ্বারা সংক্রামিত হয়।
4. জিয়াডিয়া ইনটেস্টিনালিস (**Giardia intestinalis**)	মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্র	আমাশয়	চারিটি নিউক্লিয়াসযুক্ত সিস্টের মাধ্যমে।
5. হিস্টোমোনাস মিলিগ্রিডিস (**Histomonas meleagridis**)	মুরগী, টার্কিস (Turkeys)-এর সিকাম ও যকৃৎ।	ব্লাক হেড (**Black head**) রোগ	সিকাল পোকোর [হেটেরেক্স (**Heterakes**)-র ডিম্বানুর মাধ্যমে।

6. লিসম্যানিয়া ডোনোভানি (**Leishmania donovani**)	মানুষ, বিড়াল, কুকুরের যকৃৎ, শ্বেতকণিকা, লসিকা গ্রন্থি, প্লীহা, অস্থিমজ্জার কোষ মধ্যে থাকে।	কালাজ্বর, রক্তাল্পতা	রক্তচোষক স্যাণ্ডফ্লাই ফ্লেবোটোমাস (**Phlebotomus**) মাছির দংশনের মাধ্যমে।
7. লিসম্যানিয়া ইনফ্যানটাম (**Leishmania infantum**)	অন্তঃকোষীয়, শিশুদের	কালাজ্বর, প্লীহার বৃদ্ধি	ঐ
8. লিসম্যানিয়া ট্রপিকা (**Leishmania tropica**)	অন্তঃকোষীয়, মানুষ, বিড়াল ও কুকুরের ত্বকে।	চামড়ার ক্ষত	ঐ
9. লিসম্যানিয়া ব্রাজিলিয়েনসিস (**Leishmania braziliensis**)	মুখ ও নাসিকার মিউকাস পর্দা।	এসপুন্তিয়া	ঐ
10. ট্রাইকোমোনাস হোমিনিস (**Trichomonas hominis**)	মানুষ ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর কোলনে	আমাশয়	পরজীবি আক্রান্ত রোগীর মল দ্বারা।
11. ট্রাইকোমোনাস ফিটাস (**Trichomona foetus**)	ভেড়া, ছাগল, ঘোড়ার রেচনযন্ত্রে।	গর্ভপাত, delayed conception inflammation of Preputial sac.	সংগমের মাধ্যমে।

পরজীবির নাম	পোষকের নাম ও পরজীবির বাস করিবার স্থান	সৃষ্ট রোগ	সংক্রমনের উপায়
12. ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনালিস (**Trichomonas vaginalis**)	স্ত্রী-লোকের রেচনজননতন্ত্রে	যোনিঘটিত ব্যাধি, চুলকানি এবং অস্বাভাবিক discharge	সংগমের মাধ্যমে।
13. ট্রাইকোমোনাস গ্যালিনি (**Trichomonas gallinae**)	পায়রা, মুরগীর গ্রাসনালী, পাকস্থলী ও যকৃতে	নেক্রটিক নোডিউলস্	সরাসরি ড্রপিং এর দ্বারা
14. ট্রাইকোমোনাস গ্যালিনারাম (**Trichomonas gallinarum**)	টার্কি ও মুরগীর ক্ষুদ্রান্ত্র ও যকৃৎ	ব্লাকহেড রোগ	ঐ
15. ট্রাইকোমোনাস টেনাক্স (**Trichomonas tenax**)	মানুষের মুখে এবং চোয়ালে	পায়োরিয়া	চুম্বন দ্বারা।
16. ট্রাইপানোসোমা গ্যাম্বিয়েন্স (**Trypanosoma gambiense**)	মানুষ ও অন্যান্য মেরুদণ্ডীর রক্তে	ঘুমরোগ, ম্যাথাব্যাথা জ্বর, যকৃৎ প্লীহার বৃদ্ধি	সেট্‌সি (**Tsetse**) মাছির দ্বারা
17. ট্রাইপানোসোমা রোডেসিয়েন্স (**Trypanosoma rhodesiense**)	ঐ	ঘুমরোগ	গ্লসিনা মার্সিটান্স (**Glossina marsitans**) মাছির দ্বারা।

18. ট্রাইপানোসোমা ক্রুজি (Trypanosoma cruzi)	শিশুদের জননঅংগ, হৃদযন্ত্র ও মস্তিস্কের কোষমধ্যে	আমাশয়, জ্বর, হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা, মাথাব্যথা	একধরনের রক্তচোষা ছারপোকা (bug) দ্বারা
19. ট্রাইপানোসোমা ইকুই-পারডাম (Trypanosoma epui-perdum)	ঘোড়া, গাধা, কুকুরের রক্ত বা জননঅংগে	ডাউরিন (Dourine)	সংগমের সময়।
20. ট্রাইপানোসোমা ইভান্সি (Trypanosoma evansi)	ঘোড়া, গবাদি পশুর রক্তে	সুর্‌র‍্যা (Surra) রোগ	ট্যাবানাস (Tabanus) মাছির দ্বারা
21. ট্রাইপানোসোমা ব্রুসি (Trypanosoma brucei)	গৃহপালিত পশুর লসিকাপর্বে	নাগানা (Nagana) রোগ	সেট্‌সি (Tsetse) মাছির দ্বারা।
22. প্লাসমোডিয়াম ডাইভ্যাক্স (Plasmodium vivax)	মানুষের যকৃৎকোষ ও লোহিত কনিকায় থাকে।	ম্যালেরিয়া	স্ত্রী এনোফিলিস মশা দ্বারা
23 প্লাসমোডিয়াম ফল্‌সিপেরাম (Plasmodium falciparum)	ঐ	ঐ	ঐ
24. প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি (Plasmodium malarie)	ঐ	ঐ	ঐ

পরজীবির নাম	পোষকের নাম ও পরজীবির বাস করিবার স্থান	সৃষ্ট রোগ	সংক্রমনের উপায়
25. প্লাসমোডিয়াম ওভে্ল (*Plasmodium ovale*)	ঐ	ঐ	ঐ
26. আইসোপোরা হোমিনিস (**Isopora hominis**)	মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে	আমাশয়	উসিস্ট (oocyst)-এর মাধ্যমে।
27. নোসেমা বমবাইসিস্ (**Nosema bomycis**)	সিল্কমথের সমস্ত দশার কলায়	পেব্রাইন রোগ	ডিম্বের মাধ্যমে বংশগত ঘটিত রোগ।
28. নোসেমা এপিস (**Nosema apis**)	মৌমাছির ম্যালপিজিয়ান নালী ও অন্ত্রে থাকে	মাংসপেশীর ক্ষতি	ঐ
29. ব্যাবেসিয়া বাইজেমিনা (**Babesia bigemina**)	গৃহপালিত পশুর লোহিত কণিকা	আমাশয়, টেক্সাস (**Texas**) জ্বর, রক্তশূন্যতা	স্ত্রী টিক্ (**Tick**)-এর মাধ্যমে।
30. ব্যাবেসিয়া ক্যানিস (**Babesia canis**)	কুকুরের লোহিত রক্তকণিকা	রক্তশূন্যতা, জন্ডিস্	ঐ

31. ব্যাবেসিয়া ইকুরি (**Babesia equri**)	ঘোড়ার লোহিত রক্তকণিকা	ঐ	ঐ
32. আইমেরিয়া স্টিডি (**Eimeria stidae**)	খরগোসের যকৃতে	আমাশয় এবং অন্যান্য অন্ত্রঘটিত রোগ	ডিম্বাণুর মাধ্যমে
33. ব্যালানটিডিয়াম কোলাই (**Balantidium coli**)	মানুষের কোলন	ব্যালানটিডিও সিস, কোলনের ক্ষত	খাদ্যের সংগে সিস্টের মাধ্যমে
34. ইকথিওপথিরিয়াস মালটি-ফিলিস (**Ichthyophthirius multifilis**)	মাছের ত্বক ওফুলকা	ত্বকের ক্ষত	সরাসরি অন্যত্র যাইবার ফলে।

আদ্যপ্রাণীর অর্থনৈতিকগুরুত্ব (Economic importance of Protozoa): আদ্যপ্রাণী এককোষী আণুবীক্ষনিক জীব জলে, আর্দ্র মাটিতে, বাতাসে ও অন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে পরজীবি হিসাবে বাস করে। বর্ত্তমান পৃথিবীর মানবসভ্যতার বিকাশে মনে হইতে পারে আদ্যপ্রাণীর কিছুই গুরুত্ব নাই। এই আদ্যপ্রাণী স্বাধীনজীবীও পরজীবি হইতে পারে, তুলনামূলকভাবে পরজীবি প্রাণী অপেক্ষা স্বাধীনজীবীর সংখ্যাই বেশী।

(A) পরজীবি আদ্যপ্রাণী (Parasitic Protozoa) ঃ এই সকল আদ্য-প্রাণী পরজীবি হিসাবে অন্য প্রাণী হইতে খাদ্য গ্রহণ করে বা ব্যাকটিরিয়াকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

(i) মৃত্তিকাস্থ আদ্যপ্রাণী ঃ অনেক আদ্যপ্রাণী পরজীবি হিসাবে মৃত্তিকায় বাস করে, এবং নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়াকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া মাটিতে নাইট্রোজেনের মাত্রা বৃদ্ধি করে, সেই ব্যাকটিরিয়াকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিবার ফলে মাটিতে নাইট্রোজেনের মাত্রা কমিয়া যায়।

(ii) জলে বসবাসকারী পরজীবি আদ্যপ্রাণী ঃ অনেক জলে বসবাস-কারী আদ্যপ্রাণী (যেমন, ইউরোগ্লিনপসিস) তৈল জাতীয় পদার্থ জলে নিষ্কাশিত করে। ফলে, ঐ জল মানুষের পানের অযোগ্য হইয়া পড়ে। অনেক সময় জলে তুঁতের দ্রবন মিশাইয়া ঐ সকল আদ্যপ্রাণীকে মারা হয়। আবার অনেক আলোকপ্রভ ফ্লাজেলাযুক্ত আদ্যপ্রাণী (যেমন, নক্টিলিউকা, জিম্নোডিনিয়াম) সামুদ্রিক জলে অতিমাত্রায় বংশবৃদ্ধি করে এবং আলোকের সৃষ্টি করে। ইহাদের সংখ্যাধিক্য হইলে সমুদ্র জলের বিশুদ্ধতা অনেকাংশে নষ্ট হইয়া যায়।

আদ্যপ্রাণী অনেক সময় মাছেরও ক্ষতি করে এবং খাদ্য উপযোগী শম্বুক (Mollusca) সামুদ্রিক প্রাণীকে (যেমন, ঝিনুক, অয়সৃটর) মানুষের খাদ্যের অনুপযোগী করিয়া তোলে।

(iii) পরজীবি আদ্যপ্রাণী ঃ যখন একটি জীব অপর জীবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার দেহ হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তখন তাহাকে পরজীবি প্রাণী বলে। যাহার উপর খাদ্য গ্রহণ করিয়া পরজীবি প্রাণী বাঁচিয়া থাকে তাহাকে পোষক প্রাণী বলে। আদ্য প্রাণীতে প্রচুর পরজীবি প্রাণী পাওয়া যায়, বিশেষ করিয়া স্পোরোজোয়া শ্রেণীর সকল আদ্যপ্রাণী হইল

পরজীবি।

(iv) ক্ষতিকারক আদ্যপ্রাণী ঃ ক্ষতিকারক রোগসৃষ্টিকারক আদ্যপ্রাণী সকল শ্রেণীতেই পাওয়া যায়। পাঁচশ রকমের অধিক পরজীবি আদ্যপ্রাণী মানুষের মারাত্মক রোগের কারন ঘটায় এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাইতে পারে। এই সকল রোগের জন্য নির্দিষ্ট আদ্যপ্রাণী মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশের ক্ষতি-সাধন করে। ইহাছাড়াও অতি প্রয়োজনীয় ও গৃহপালিত, অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রভূত ক্ষতি সাধন করে।

(B) উপকারী আদ্যপ্রাণী (Beneficial protozoa) ঃ প্রাণীদেহে বা পরিবেশে বসবাসকারী কিছু উপকারী আদ্যপ্রাণী থাকে।

(i) খাদ্য হিসাবে আদ্যপ্রাণীর ব্যবহার ঃ ফোরামিনিফেরা, রেডিও-লারিয়ার মৃত্যু ঘটিলে দেহজাত জীবপদার্থ সমুদ্র জলে মিশিয়া জলের পুষ্টি বৃদ্ধি করে। ফলে, জলজ প্রাণীর পুষ্টিতে সাহায্য করে। পতংগের শূককীট, ছোট ছোট ক্রাসটিসিয়া প্রাণী ও জলজ পোকামাকড় আদ্য প্রাণীকে নিজেদের খাদ্যহিসাবে গ্রহণ করে। আবার এই সকল প্রাণীকে মাছ বা শম্বুক জাতীয় প্রাণীরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, এই ভাবে আদ্যপ্রাণি জলাশয়ে বা সমুদ্রে খাদ্যশৃঙ্খল গঠনে সাহায্য করে।

বিশেষতঃ ডায়ানোফ্লাজেট আদ্যপ্রাণী জলের শতকরা ৭০ ভাগ জৈব পদার্থ গঠনে সাযায্য করে। মানুষ যে প্রোটিনজাত পদার্থ উদ্ভিদ হইতে পায়, তাহা অপেক্ষা অধিক গুন বেশী প্রোটিনজাত পদার্থ সামুদ্রিক আদ্যপ্রাণী তৈয়ারী করিতে পারে। এক একর জমিতে প্রায় চল্লিশটন আদ্যপ্রাণী জন্মায়। ইহার খাদ্য মূল্য আধটন সোয়াবিন ও দুইশত পঞ্চাশ পাউণ্ড মাংসের সমান। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত পৃথিবীর জনসংখ্যার চাপে এই সকল আদ্যপ্রাণী খাদ্যের চাহিদা পূরন করিবে। তাই আজ বৈজ্ঞানিকগণ এই কাজে ব্যাপৃত।

(ii) স্বাস্থ্যবিধানে সুবিধাজনক (Helpful in Sanitation) ঃ অনেক ব্যাকটিরিয়া জলে থাকিয়া জলের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। জলে বসবাস-কারী আদ্যপ্রাণী এই সকল ব্যাকটিরিয়াকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে।

(iii) মিথোজীবি আদ্যপ্রাণী ঃ অনেক সময় দুইটি সজীব-জীব পারস্পারিক সহযোগিতার দ্বারা বাঁচিয়া থাকে, এই ঘটনাকে মিথোজীবিতা

বলে। এই জীব দুইটিকে মিথোজীবি বলে। যেমন, ট্রাইকোনিমফা, টারমাইট (Termite)-এর অন্ত্রে মিথোজীবি হিসাবে থাকিয়া সেলুলোজ হজম করিতে সাহায্য করে।

(iv) কমেনশাল্ আদ্যপ্রাণী ঃ কমেনশালিজম (Commensalism) পদ্ধতিতে একটি জীব হইতে অপর জীব খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, ইহাকে কমেনশাল বলে। যে জীবের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহাকে পোষক জীব বলে। অনেক ফ্লাজেলাযুক্ত আদ্যপ্রাণী ব্যাঙ, মাছ, শম্বুক ও সন্ধিপদ প্রাণীর উপর বাস করে মাত্র, কোন ক্ষতি করে না। এই সকল আদ্যপ্রাণীদের বহিঃকমেনসাল জীব বলে।

(v) সামুদ্রিক উজি এবং জীবাশ্ম ঘটিত আদ্যপ্রাণী ঃ ফোরামিনিফেরা, রেডিওলেরিয়া মারা যাইবার পর তাহাদের বহিঃ কঙ্কাল সমুদ্রের নরম মৃত্তিকা বা সামুদ্রিক উজি (ooze) তৈয়ারী করে। এই সকল মৃত্তিকা লক্ষ লক্ষ বছর ধরিয়া সমুদ্রের তলায় জমিয়া বিরাট rock বা পর্বত গঠন করে। ইহা প্রধাণতঃ বালু ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্বারা তৈয়ারী। এই rock হইতে চক, বাড়ি তৈয়ারীর পাথর ইত্যাদি জিনিষ প্রস্তুত হয়। ইংলাণ্ডের ডোভারে, প্যারিস, কায়রো ও উত্তর আমেরিকায় এই সকল rock প্রধানতঃ মৃত ফোরামিনিফেরার বহিঃ কঙ্কাল দ্বারা গঠিত। প্যারিসের বেশীরভাগ বাড়ী তৈয়ারীর পাথর ফোরামিনিফেরিডা বর্গের অন্তর্গত **মিলিওলিনা (Miliolina)** অধঃবর্গের প্রাণীর বহিঃ কঙ্কালের প্রস্তরীভূত রূপ। রেডিওলেরিয়ার বহিঃকঙ্কালের চূর্ণ ধাতব পদার্থ পালিশ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। বেশীর ভাগ সময় এই মৃত বহিঃকঙ্কালের গাত্রে তৈলবিন্দু লাগিয়া থাকে। এই তৈলবিন্দু দেখিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌রা কোথাও খনিজতৈল থাকা সম্ভব কিনা তাহা অনুমান করিতে পারেন।

(vi) গবেষনা কাজে আদ্যপ্রাণীর ভূমিকা (Role of Protozoa in research) ঃ

আমরা জানি, আদ্যপ্রাণী এককোষী, আনুবীক্ষণিক জীব। কোষের জৈব পদার্থের গুনাগুন সম্পর্কে জানিবার জন্য এই এককোষী প্রাণীর উপর নির্ভর করা যায়। ইহাদের ক্ষুদ্রাকৃতি এবং জনন ক্ষমতা দ্রুত হওয়ার দরুন বংশগতি বিজ্ঞানের চর্চায় আদ্যপ্রাণীকে কাজে লাগান হয়।

—:o:—

অনুশীলনী

প্রথমঅধ্যায় ঃ

1. আদ্যপ্রাণী বলিতে কি বোঝ? ইহাদের আকৃতি, ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।
2. আদ্যপ্রাণীর শ্রেণীবিভাগ লিখ। প্রতিটি শ্রেণী ও বর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লিখ।
3. কিসের উপর ভিত্তি করিয়া আদ্যপ্রাণীর শ্রেণীবিভাগ করা হয়? রাইজোপোডা উপশ্রেণীর বিভিন্ন বর্গের বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণ সহকারে আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

1. অ্যামিবার পুষ্টি সম্পর্কে যাহা জান লিখ। অ্যামিবা কিভাবে খাদ্যগ্রহণ করে তা ছবি সহকারে বিস্তারিত আলোচনা কর।
2. অ্যামিবার গমনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর।
3. দ্বিবিভাজন পদ্ধতি কাহাকে বলে? অ্যামিবা কিভাবে জনন কার্য সমাধান করে তাহা ছবি সহকারে বর্ণনা কর।
4. এণ্টামিবা হিস্টোলিটিকার জীবনচক্র আলোচনা কর।
5. এণ্টামিবার সংক্রমণের উপায়, রোগ ও প্রতিকার সম্পর্কে লেখ।
6. অ্যামিবিয়েসিস কাহাকে বলে? এণ্টামিবা মাইনুটার সংক্রমণ পদ্ধতি লেখ।
7. পলিষ্টোমেলার জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা কর।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

1. ইউগ্লিনার চলন, গঠন ও জনন আলোচনা কর।
2. ট্রাইপেনোসোমা গামবিএনসের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা কর।
3. 'সারা' অসুখ কাকে বলে? এই রোগের পরজীবির জীবনচক্র লিখ।
4. ট্রাইপোনোসোমা গামবিএনসের বিকারতত্ব ও প্রতিকার আলোচনা কর।
5. জিয়ারডিয়ার গঠন ও জীবনবৃত্তান্ত লিখ।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

1. মানুষের দেহে প্লাসমোডিয়াম ভাইভাক্সের পর্যায় লিখ।

2. প্লাসমোডিয়াম ভাইভাক্সের যৌনজনন পর্যায় ছবি সহকারে লেখ।
3. মনোসিসটিসের জীবনচক্র লেখ।
4. ম্যালেরিয়া রোগের দমন ও প্রতিকার আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

1. প্যারামিসিয়ামের গঠন ও পুষ্টি আলোচনা কর।
2. প্যারামিসিয়ামের চলন ও জনন লিখ।
3. প্যারামিসিয়ামের কনজ্যুগেশন ও এণ্ডোমিক্সিস পদ্ধতি লিখ।
4. ভর্টিসেলার গঠন ও জনন লিখ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

1. অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম ও ভটিসেলার চলন পদ্ধতি লিখ।
2. অ্যামিবার সল-জেল পদ্ধতি আলোচনা কর।
3. আদ্যপ্রাণীর ক্ষণপদের সাহায্যে চলন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ যুক্তি সহকারে আলোচনা কর।
4. সিলিয়েটা ও ফ্লাজেলেটা প্রাণীর চলন লিখ।

সপ্তম অধ্যায় ঃ

1. আদ্যপ্রাণীতে কত ধরণের পুষ্টি দেখা যায়? হোলোজয়িক পুষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।
2. আদ্যপ্রাণীর বিভিন্নধরণের পুষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

অষ্টম অধ্যায় ঃ

1. আদ্যপ্রাণীর অযৌনজনন পদ্ধতি গুলি উদাহরণ সহকারে আলোচনা কর।
2. আদ্যপ্রাণীতে কতধরণের যৌনজনন দেখিতে পাওয়া যায়? ইহাদের যে কোন তিনটি প্রধান যৌনজনন লিখ।

নবম অধ্যায় ঃ

1. আদ্যপ্রাণীর বিভিন্ন জৈবনিক কার্য আলোচনা কর।

দশম অধ্যায় ঃ

1. আদ্যপ্রাণীর বহিরাবরণ ও কংকালতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা কর।
2. আদ্যপ্রাণী ঘটিত রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।
3. আদ্যপ্রাণীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

ভ্রম-সংশোধনী

পৃষ্ঠা	লাইন/চিত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৭	ফ্লাচজলাযুক্ত	ফ্লাজেলাযুক্ত
২	২৯	(1μm-50um)	(1μ-50mm)
৯	২	জু-ম্যাস্টিগোফোরিরা (zoomastigopohora)	জ্যু-ম্যাস্টিগোফোরিয়া (zoomastigophorea)
৫	চিত্র-1-চ	নসেমা টারমাইটিস	নসেমা টারমাইটিড
১১	চিত্র-2-ক	পেণ্টাট্রাইকোমোনাস হোমিনিস উদাহরনে উল্লেখিত নয়	বর্গ. 7. ট্রাইকোমোনাডিডার অন্তর্গত
১১	চিত্র-২-খ	ট্রাইকোমোনোডিডা	ট্রাইকোমোনাস
২৮	চিত্র-3	ট্রকোফ্রিয়া ও স্ফিরোফ্রিয়া উদাহরণে উল্লেখিত নয়	বর্গ-সার্কোরিডার অন্তর্গত
৪৫	৯	বহিস্করণ	বহিঃস্করণ
৪৮	১৬	(spprulation)	(sporulation)
৫১	১১ ও ১৬	কনজুগেশান	কনজ্যুগেশান
৫৪	১১	এণ্টমিবা	এণ্টামিবা
৬৩	১৫	(Bradshaw)	'Bradshaw'
৭০	চিত্র-23-ক	ডিফিউজিয়া	ডিফ্লুজিয়া
৭০	১৮	ডিফিউজিয়া (Diffugia)	ডিফ্লুজিয়া (Difflugia)
৭৩	১	শ্রেণী : ফাইটোম্যাস্টিগোফোরা	শ্রেণী : ফাইটো-ম্যাসটিগোফোরিয়া
৭৩	৯	ম্যাসটিগোফোরা শ্রেণীর	ফাইটোম্যাসটিগোফোরিয়া শ্রেণীর
৭৪	৫	ফাইটোম্যাসটিগোফোরা	ফাইটোম্যাসটিগোফোরিয়া
৭৫	১০	গালেট	গ্যালেট
৮৩	১৩	শ্রেণী : জু-ম্যাসটিগোফোরা	জ্যু-ম্যাসটিগোফোরিয়া
৮৮	১৯	” ”	”
৯১	৫	পর্ব : ফাইটোম্যাসটিগোফোরা	পর্ব : সার্কোম্যাস-টিগোফোরা

৯১	৬	শ্রেণী : জু-ম্যাসটিসোফোরা	শ্রেণী : জ্যু-ম্যাসটিগো-ফোরিয়া
১১৩	২৭	কোয়ার্টান (Quratan)	কোয়ার্টান (Quratan)
১১৪	১	P. (Ovale)	(P. ovale)
১২২	২	স্পিউডোনেভিসেলা (Pseuponavecella)	সিউডোনেভিসেলা (Pseudonavecella)
১২৩	৭	Pariasitism	Parasitism
১২৮	১৮	(Contractile vaeuote)	(Contractile vacuole)
১২৮	চিত্র-48	প্যারামিশিয়াম	প্যারামিসিয়াম
১২৯	১৪	সাইটোফেরেক্স	সাইটোফ্যারেঙ্কস
১৩৩	৭	বহিঃকরন	বহিঃস্করন
১৩৩	১১	শ্বসণ	শ্বসন
১৩৪	যে সব লাইনে	কনজুগেশন	কনজ্যুগেশান
১৪৯		কনজুগেন্ট	কনজ্যুগ্যান্ট
১৪৬	২ ও ৩	ম্যাক্রোকনজুগ্যান্ট ম্যাইক্রোকনজুগ্যান্ট	ম্যাক্রোকনজ্যুগ্যান্ট মাইক্রোকনজ্যুগ্যান্ট
১৩৪	৮	(Transverse binnary fission)	(Transverse binary fission)
১৪০	চিত্র-55	প্যারামিশিয়াম	প্যারামিসিয়াম
১৪৪	২৪	(Contractile)	(Contractile vacuole)
১৫৯	চিত্র-66	ভুলচিত্র নম্বর আছে	চিত্র-66-A
১৬৪	২১	ট্রাইপানোসোমা রোডেন্সিনেনসিতে	ট্রাইপেনোসোমা রোডেসিএনসিতে
১৭০	চিত্র নং-77	সাইওনিমতন্তু	মাইওনিমতন্তু

গ্রন্থপঞ্জী

মাতৃভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন 'প্রাণিবিদ্যা' ব্যতীত বিশেষভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা গুলি লিপিবদ্ধ করা হইল।

Baker, J.R	Parasitic Protozoa. Hutchinson, London, 1969.
Barnes, R.D	Invertebrate zoology, 3rd ed. Saunders, philadelphia 1974.
Barth, H.R and Broshears, E.R	The Invertebrate world, Holt-saunders, Japan, 1982.
Barrington, E.J.W	Invertebrate Structure and Function, Nelson, London, 1967.
Borradaile, L.A., Potts, F.A. Eastham, L.E.S, Saunhers, J.T and kerkut. G.A	The Invertebrata. Cambridge, univ. Press, cambridge 1961.
Chandler, C.A and Read P.C	Introduction to parasitology, 10thed. wiley Eastern Pvt. Ltd. New Delhi, 1961.
Chatterjee, K.D	Prasitology, 9th ed. Self, Calcutta, 1973.
Garnham, P.C.C	Malaria Parasites and other Haemosporidia. Blackwell, oxford, 1966.
Grell, K G.	Protozoology. springer, Berlin, 1973.
Hoare, C.A	The Trypanosomes of Mamamals : A zoological Monograph, Blackwell,

oxford, 1972.

Hyman, L.H — The Invertebrates, vol. 1 (Protozoa through Ctenophora). Mc Graw-Hill, New york, 1940.

Kudo, R.R. — Protozoology. 5th. ed. spring field, III. 1966.

Levine, N.D, Corliss, J.D. et al. — A newly revised classification of the protozoa. J. protozool. 27: 37—58, 1980.

Noble, E.R and Noble, G.A — Parasitology, 3rd ed. Lea and Febiger, philadelphia, 1972.

Parker, J and W.A. Haswell — Text Book of zoology, invertebrates. Edited Marshall A, J and williams, W. D. Macmillan Press Ltd, London, 1972.

Read, C. P — Parasitism and Symbiosis. Ronald Press, New York, 1970.

Sandon, H. — Essays on Protozoology. Hutchinson, London, 1963.

Sleigh, M. A — Cilia and Flagella. Academic Press, London, 1973.

Storer, T. I and R. L. usinger — General zoology. Mc. Graw Hill Compamy, New york, 1965.

বর্ণানুক্রমিক স্মৃচী

আদ্যপ্রাণী আণুবীক্ষনিক আদিম এককোষী প্রাণী। এই এককোষ সম্বলিত প্রাণীর বিভিন্ন জৈবনিক কার্য এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। প্রাণিজগতের সরলতমজীব, যাহাতে একটি আদর্শ কোষের সকল গুণাগুণ বিদ্যমান। কিন্তু এই কোষের মধ্যেই আধুনিক জটিল বহুকোষী জীবের প্রতিচ্ছাব লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে আদ্যপ্রাণীকে পর্ব হিসাবে বিবেচনা করিয়া তাহাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। আধুনিক আদ্যপ্রাণী বিজ্ঞানীদের মতে পর্ব আদ্যপ্রাণী একটি স্বতন্ত্র অধঃরাজ্যে পৃথক করা হয়। বিভিন্ন ধর্মী প্রায় ৬৫,০০০ আদ্যপ্রাণীর প্রজাতির চিহ্নিত করা হইয়াছে। তাঁহারা এই এককোষী প্রাণীদের সাতটি পৃথক পর্বে ভাগ করিয়াছেন। এই পুস্তকে এই নূতন শ্রেণীবিন্যাসের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কারণ শ্রেণীবিন্যাসের নিখুঁত জ্ঞান প্রাণীকে জানিবার একটি উত্তম পন্থা। প্রতিটি পৃথক অধ্যায়ে এককোষীয় গঠন, প্রাণীদের বিশেষ পরিচিতি এবং সামগ্রিকভাবে পুষ্টি, চলন, রেচন, জনন ইত্যাদি জৈবনিক কার্যগুলির বৈশিষ্ট্যতা এবং তুলনামূলক আলোচনা স্থান পাইয়াছে। এককোষী প্রাণীর খোলক সম্পর্কিত আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে রাখা হইয়াছে। কতিপয় ক্ষতিকারক এককোষী পরজীবী প্রাণীর জীবনচক্র এই পুস্তকে আলোচিত। এবং শেষ অধ্যায়ে বিভিন্ন পরজীবী ও তাহাদের দ্বারা সৃষ্ট রোগের নাম উল্লেখিত করা হইয়াছে।

আঠার টাকা